NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

STUDY MATERIAL

SUBSIDIARY ZOOLOGY

SZO - 01

BLOCKS : 1 & 2

Nonchordate, Parasitology and Immunology

●

Chordata and Comparative Anatomy

প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোনও বিষয়ে সাম্মানিক (honours) স্তরে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এ-ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণ ক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে সাম্মানিক মানের পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে—যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এইসব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ-কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন ; যখনই কোনও শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনো শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এর পর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হ'তে পারবে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক—অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপিকা (ড.) মণিমালা দাস
উপাচার্য

দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ : এপ্রিল, 2011

ভারত সরকারের দূরশিক্ষা পর্ষদের বিধি অনুযায়ী এবং অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations and financial assistance of the Distance Education Council, Government of India.

পরিচিতি

বিষয় : সহায়ক প্রাণীবিদ্যা **সাম্মানিক স্তর**

পাঠ্যক্রম : SZO - 1

পর্যায় : 1

		রচনা	সম্পাদনা
একক 1	❒	ড. অজয় কুমার মণ্ডল	ড. বুদ্ধদেব মান্না
একক 2	❒	ড. অজয় কুমার মণ্ডল	ড. বুদ্ধদেব মান্না
একক 3	❒	ড. বিরেশ্বর বেরা	ড. বুদ্ধদেব মান্না
একক 4	❒	ড. সংযুক্তা চক্রবর্ত্তী (মান্না)	ড. বুদ্ধদেব মান্না

পর্যায় : 2

		রচনা	সম্পাদনা
একক 1	❒	শ্রীমতী পাপিয়া দাস	ড. বুদ্ধদেব মান্না
একক 2	❒	শ্রীমতী পাপিয়া দাস	ড. বুদ্ধদেব মান্না
একক 3	❒	ড. বিরেশ্বর বেরা	ড. বুদ্ধদেব মান্না
একক 4	❒	শ্রীমতী পাপিয়া দাস	ড. বুদ্ধদেব মান্না

ঘোষণা

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনো অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনোভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

সৌম্যেন্দ্র সেন
নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

SZO-1

অ-কর্ডাটা, পরজীববিদ্যা ও অনাক্রম্যতা

পর্যায় 1

একক 1 ❐ শ্রেণিবিন্যাসকরণ : প্রোটোজোয়া, পরিফেরা, অ্যানিলিডা, আর্থোপোডা, মোলাস্কা ও একাইনোডার্মাটা 9-50

একক 2 ❐ প্যারামেসিয়াম, স্কাইফা, কেঁচো ও আরশোলার অঙ্গসংস্থান ও বিবরণ 51-106

একক 3 ❐ পাইলা, তারামাছ, বেলানোগ্লোসাসের অঙ্গসংস্থান ও বিবরণ 107-128

একক 4 ❐ পরজীবিতা ও অনাক্রম্যতা 129-208

পর্যায় 2

একক 1 ❐ শ্রেণিবিন্যাস 211-248

একক 2 ❐ অ্যাম্ফিঅক্সাস এবং মৎস্য সম্প্রদায় 249-273

একক 3 ❐ ব্যাঙ, গিরগিটি ও পায়রা 274-321

একক 4 ❐ মেরুদণ্ডী প্রাণীদের হৃৎপিণ্ড ও মস্তিষ্ক এবং স্তন্যপায়ী প্রাণীদের পাকস্থলী ও দাঁতের তুলনামূলক অঙ্গসংস্থান 322-362

একক 1 শ্রেণীবিন্যাসকরণ (Classification) ঃ প্রোটোজোয়া, পরিফেরা, অ্যানিলিডা, আর্থোপোডা, মোলাস্কা ও একাইনোডার্মাটা

গঠন

1.1 উপরাজ্য : প্রোটোজোয়ার শ্রেণীবিন্যাস
- **1.1.1** শ্রেণীবিন্যাসের ছক
- **1.1.2** প্রোটোজোয়ার শ্রেণীবিন্যাসকরণ বৈশিষ্ট্য
- **1.1.3** প্রোটোজোয়ার বিবর্তন ধারা

1.2 পর্ব : পরিফেরার শ্রেণীবিন্যাস
- **1.2.1** শ্রেণীবিন্যাসের ছক
- **1.2.2** পরিফেরার শ্রেণীবিন্যাসকরণ বৈশিষ্ট্য
- **1.2.3** পরিফেরার বিবর্তন ধারা

1.3 পর্ব : অ্যানিলিডার শ্রেণীবিন্যাস
- **1.3.1** শ্রেণীবিন্যাসের ছক
- **1.3.2** অ্যানিলিডার শ্রেণীবিন্যাসকরণ বৈশিষ্ট্য
- **1.3.3** অ্যানিলিডার বিবর্তন ধারা

1.4 পর্ব : আর্থ্রোপোডার শ্রেণীবিন্যাস
- **1.4.1** শ্রেণীবিন্যাসের ছক
- **1.4.2** আর্থ্রোপোডার শ্রেণীবিন্যাসকরণ বৈশিষ্ট্য
- **1.4.3** আর্থ্রোপোডার বিবর্তন ধারা

1.5 পর্ব : মোলাস্কার শ্রেণীবিন্যাস
- **1.5.1** শ্রেণীবিন্যাসের ছক
- **1.5.2** মোলাস্কার শ্রেণীবিন্যাসকরণ বৈশিষ্ট্য

1.6 পর্ব : একাইনোডার্মাটার শ্রেণীবিন্যাস
- **1.6.1** শ্রেণীবিন্যাসের ছক
- **1.6.2** একাইনোডার্মাটার শ্রেণীবিন্যাসকরণ বৈশিষ্ট্য
- **1.6.3** একাইনোডার্মাটার বিবর্তন ধারা

1.7 অনুশীলনী

1.8 উত্তরমালা

1.1 উপরাজ্য : প্রোটোজোয়ার শ্রেণীবিন্যাস (Protozoa : Gk. *protos*, first; zoon, animal)

1.1.1 শ্রেণীবিন্যাসের ছক

আনুমানিক 65,000 এর বেশি প্রাণী প্রজাতি প্রোটোজোয়ার অন্তর্ভুক্ত। প্রোটোজোয়ার প্রাণীদের শ্রেণীবিন্যাস বিভিন্ন বিজ্ঞানী বিভিন্ন ভাবে ব্যক্ত করেছেন। পুরানো পদ্ধতিতে প্রোটোজোয়াকে একটি

পর্ব হিসাবে গণ্য করা হতো। বিজ্ঞানী (লেভিন) Levine (1980) এবং তাঁর সহকর্মীরা জার্নাল অফ প্রোটোজুলজিতে প্রোটোজোয়ার প্রাণীদের এক নূতন শ্রেণীবিভাগ প্রস্তাব করেন এবং এই মত আধুনিক বিজ্ঞানীরাও সোসাইটি অব প্রোটোজুলোজিস্টস সমর্থন করেছেন। লেভিনের (1980) শ্রেণীবিন্যাসের অনুসরণে নিচে প্রোটোজোয়ার শ্রেণী-বিন্যাসের ছক দেওয়া হল—

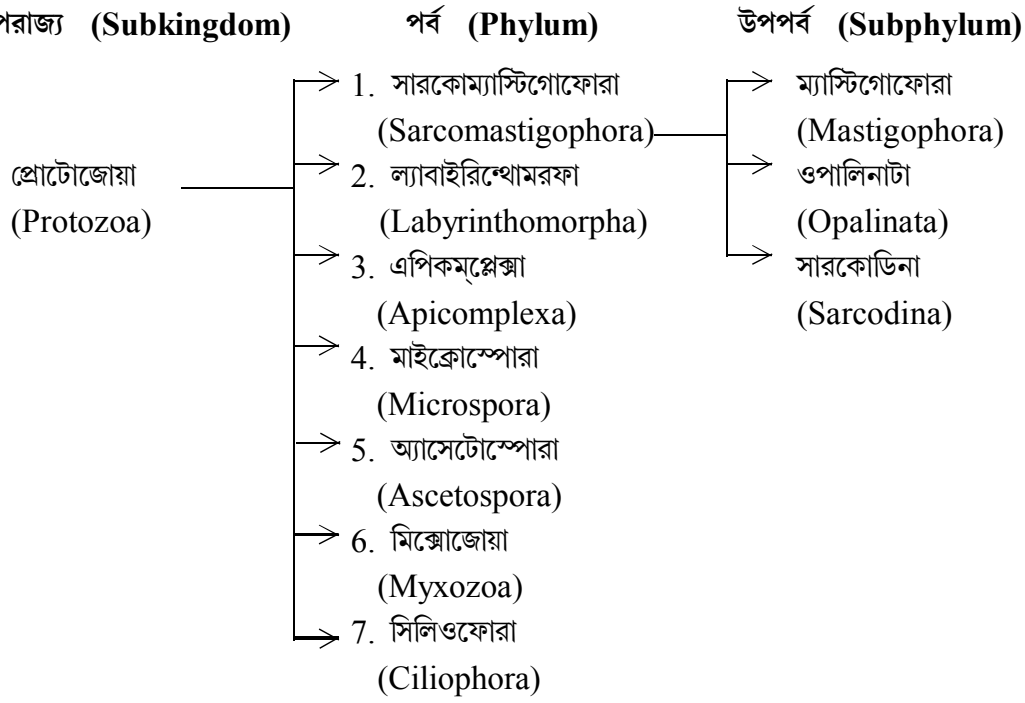

1.1.2 প্রোটোজোয়ার শ্রেণীবিন্যাসকরণ বৈশিষ্ট্য (Subkingdom : Protozoa)

1. আনুবীক্ষণিক এককোষী প্রাণী।
2. সাধারণতঃ গোলাকার, লম্বাটে ও ডিম্বাকৃতি কোষযুক্ত, কোনও কোনও ক্ষেত্রে কোষের আকার পরিবর্তনশীল।
3. দেহ পেলিক্‌ল নামক আবরণ আবৃত থাকে অথবা নগ্ন অবস্থায় থাকে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অন্তঃকঙ্কালও দেখা যায়।
4. একটি মাত্র কোষই জীবের সমস্ত জৈবনিক কাজ সম্পন্ন করে।
5. ক্ষণপদ, ফ্লাজেলা বা সিলিয়ার সাহায্যে চলন হয়।
6. কোষের মধ্যে নিউক্লিয়াসের সংখ্যা এক বা একাধিক হতে পারে।
7. ব্যাপন প্রক্রিয়ায় শ্বাসকার্য সম্পন্ন হয়।
8. রেচন প্রক্রিয়া সমগ্র দেহাবরণ বা সঙ্কোচনী গহ্বরের (contractile vacuole) মাধ্যমে অথবা

নির্দিষ্ট দেহছিদ্র সাইটোপাইগের (cytopyge) মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। সঙ্কোচী গহ্বর দেহে জলের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করে।

9. যৌন বা অযৌন উভয় প্রকার জনন কার্যই দেখা যায়।
10. জীবনচক্রে জনুঃক্রম দেখা যায়।
11. এককভাবে বা দলবদ্ধভাবে বাস করে।
12. স্বাধীনজীবী, পরজীবী অথবা মিথোজীবী জীবনযাপন করে।

পর্ব-1: সার্কোম্যাস্টিগোফোরা (Phylum : Sarcomastisophora)

1. গমনাঙ্গ ক্ষণপদ, ফ্লাজেলা অথবা উভয়ই থাকে।
2. নিউক্লিয়াস একই ধরনের।
3. প্রধানত সিনগ্যামি প্রক্রিয়ায় জনন হয়। অযৌন জননও ঘটে।
4. কোন প্রকার স্পোর থাকে না।

উপপর্ব : ম্যাস্টিগোফোরা (Subphylam : Mastigophora)

1. এক বা একাধিক ফ্লাজেলা বা গমনাঙ্গ দেখা যায়।
2. দেহ পেলিক্‌ল্‌ দ্বারা আবৃত।
3. স্বাধীনজীবী বা পরজীবী প্রাণী।
4. প্রধানতঃ দ্বিভাজন প্রক্রিয়ায় অযৌন জনন সম্পন্ন হয়।
5. স্বাধীনজীবী প্রাণীদের ক্রোমাটোফোর থাকে।

উদাহরণ—জিয়াডিয়া *(Giardia),* ট্রাইপ্যানোসোমা *(Trypanasoma),* ইউগ্লিনা প্রভৃতি।

উপপর্ব : ওপালিনাটা (Subphylum : Opalinata)

1. দেহকোষে তির্যক সারিতে অসংখ্য সিলিয়া থাকে।
2. সকলেই পরজীবী।
3. দেহে সাইটোস্টোম থাকে না।
4. দেহে দুই বা তার বেশী প্রকারের নিউক্লিয়াস থাকে।
5. সাধারণত সিনগ্যামি প্রক্রিয়ায় জনন সম্পন্ন হয়।
6. বিষম আকৃতির ফ্লাজেলাযুক্ত গ্যামেট থাকে।

উদাহরণ—ওপালিনা *(Opalina),* জেলেরিল্লা *(Zelleriella),* সেপেডিয়া *(Cepedea)* প্রভৃতি।

উপপর্ব : সারকোডিনা (Subphylum : Sarcodina)

1. গমনাঙ্গ ক্ষণপদ-লোবোপড, অ্যাক্সোপড, রেটিকিউলোপড প্রভৃতি ধরনের হয়।

2. বহিঃ অথবা অন্তঃকঙ্কাল থাকে।
3. অধিকাংশ প্রাণীই স্বাধীনজীবী এবং কিছু সংখ্যক পরজীবী।
4. সাধারণত বিভাজন প্রক্রিয়ায় অযৌন জনন এবং ফ্লাজেলাযুক্ত শুক্রানু দ্বারা যৌন জনন সম্পন্ন হয়।
উদাহরণ— অ্যামিবা *(Amoeba),* এন্টামিবা *(Entamoeba)* পলিস্টোমেলা *(Polystomella)*

পর্ব - 2 : ল্যাবাইরিন্থোমর্ফা (Phylum : Labyrinthomorpha)

1. গোলাকৃতি অথবা মাকুর মতো আকৃতিযুক্ত এবং জালকাকার এক্টোপ্লাজম যুক্ত।
2. বহু প্রজাতি জুস্পোর উৎপাদন করে।
3. শৈবালের পরজীবী বা মৃতজীবীরূপে বাস করে।
4. বেশীরভাগই সামুদ্রিক অথবা মোহানাবাসী।
উদাহরণ—ল্যাবাইরিন্থোমিক্সা *(Labyrinthomyxa)*

পর্ব - 3 : এপিকম্লেক্সা (Phylum : Apicomplexa)

1. এক বা একাধিক পোলার রিং আছে।
2. জননকার্য সিনগ্যামি পদ্ধতিতে হয়।
3. সিলিয়া থাকে না।
4. ইলেকট্রন অনুবীক্ষণ যন্ত্রে এপিকাল কমপ্লেক্স দেখা যায়।
5. সব প্রজতিই পরজীবী।
6. সাবপেলিকুলার মাইক্রোটিউবল আছে।
উদাহরণ— মনোসিস্টিস *(Monocystis),* প্লাসমোডিয়াম *(Plasmodiam),* গ্রেগারিনা *(Gregarina)* ইত্যাদি।

পর্ব - 4 : মাইক্রোস্পোরা (Phylum : Microspora)

1. স্পোর এককোষীয় এবং ইহার প্রাকার ছিদ্রহীন।
2. স্পোরোপ্লাজম এক অথবা দুই নিউক্লিয়াসযুক্ত।
3. মাইটোকনড্রিয়া থাকে না।
4. স্পোরোপ্লাজম বাইরে নিক্ষেপের জন্য সরল অথবা জটিল অঙ্গানু থাকে।
5. স্পোরুলেশনের অনুক্রম দ্বিরূপী।
6. বাধ্যতামূলক অন্তঃকোষীয় পরজীবী।
উদাহরণ—মাইক্রোফাইলাম *(Microfilum)* গ্লুগিয়া *(Glugea)* নোসেমা *(Nosema)* প্রভৃতি।

পর্ব-5. অ্যাসেটোস্পোরা (Phylum : Ascetospora)

1. স্পোর সাধারণত বহুকোষী, এককোষী-ও হতে পারে।

2. সব প্রজাতিই পরজীবী।
3. এক বা একাধিক সেপারোপ্লাজম থাকে।
4. পোলার ক্যাপসুল বা ফিলামেন্ট থাকে না।
5. সেপার দ্বিকোষী, প্যারাইটাল কোষ ও সেপারোপ্লাজমযুক্ত।
6. সেপার প্রকার ছিদ্র বিহীন বা ছিদ্র যুক্ত। ছিদ্রযুক্ত হলে ঢাকনী দ্বারা আবৃত।
   উদাহরণ-মার্টেলিয়া (*Martellia*), প্যারামিক্সা (*Paramyxa*) ইত্যাদি।

পর্ব-6. মিক্সোজোয়া (Phylum : Myxozoa)

1. সেপার বহুকোষ জাত।
2. এক বা একাধিক পোলার ক্যাপসুল থাকে।
3. সেপারোপ্লাজম সংখ্যায় একটি বা দুইটি।
4. সকলেই পরজীবী।
5. সেপার এক, দুই বা কখন কখন দুই-এর বেশী কপাটিকা যুক্ত।
6. পোলার ক্যাপসুলে প্যাঁচানো পোলার ফিলামেন্ট থাকে।
7. ট্রোফোজয়েট দশা বেশ উন্নত।
   উদাহরণ-মিক্সোবোলাস (*Myxobolus*) ট্রাইলোসেপারা *(Trilospora)* ইত্যাদি।

পর্ব-7. সিলিওফোরা (Phylum : Ciliophora)

1. গমনাঙ্গ সরল সিলিয়া বা সিলিয়াযুক্ত যৌগ অঙ্গানু।
2. দেহে দুই প্রকার নিউক্লিয়াস থাকে-মাইক্রো-এবং ম্যাক্রোনিউক্লিয়াস।
3. মাক্রোনিউক্লিয়াস কেবল জনন কার্য করে এবং ম্যাক্রোনিউক্লিয়াস অন্যান্য জৈবনিক কার্য নিয়ন্ত্রণ করে।
4. অযৌন জনন দ্বিভাজন পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়, তবে কোরকদগম এবং বহুভাজনও দেখা যায়। যৌন জনন সংযুক্তি, অটোগ্যামি ও সাইটোগ্যামি ইত্যাদিতে সম্পন্ন হয়।
5. দেহে সাইটোস্টোম ও সাইটোপাইগ বা কোষ পায়ু থাকে পারে।
6. মিশ্র বা পরভোজী পুষ্টি ঘটে।
7. সংকোচী গহ্বর থাকে।
8. যৌন জননে কখনও মুক্ত গ্যামেট তৈরী হয় না।
9. অধিকাংশই মুক্তজীবী অথবা কমেন্সাল বা পরজীবী হতে পারে।
   উদাহরণ- প্যারামেসিয়াম (*Paramoecium*) নিকটোথেরাস (*Nyctotherus*) ভর্টিসেলা (*Vorticella*) প্রভৃতি।

1.1.3 প্রোটোজোয়ার বিবর্তন ধারা (Phylogeny of Protozoa)

অধিকাংশ বিজ্ঞানীদের মতে প্রোটোজোয়ার মুখ্য শ্রেণীগুলি এক প্রকার আদি, স্বভোজী ফ্লাজেলাযুক্ত গোষ্ঠী থেকে উদ্ভুত হয়েছিল। অধিকাংশ উদ্ভিদের উৎপত্তিও এই প্রকার জীব থেকেই হয়েছিল বলে অনেকে ধারনা করেন। পরবর্তীকালে সংঘবদ্ধ ফ্লাজেলাযুক্ত প্রোটোজোয়া গোষ্ঠী থেকে বর্তমানের বহুকোষী প্রাণীদের উদ্ভব হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়।

প্রোটোজোয়ার দেহ একটি মাত্র কোষ দ্বারা গঠিত হলেও ঐ একটি কোষই দেহের যাবতীয় শারীরবৃত্তিয় কাজ করতে সক্ষম। অতএব ঐ একটি কোষকে দেহরূপে ধারনা করলে, দেহটি আর আলাদা কোন কোষ দ্বারা গঠিত নয় এইরূপ চিন্তার ভিত্তিতে অনেকে প্রোটোজোয়াকে অ-কোষী (Acellular) হিসাবে গণ্য করেন।

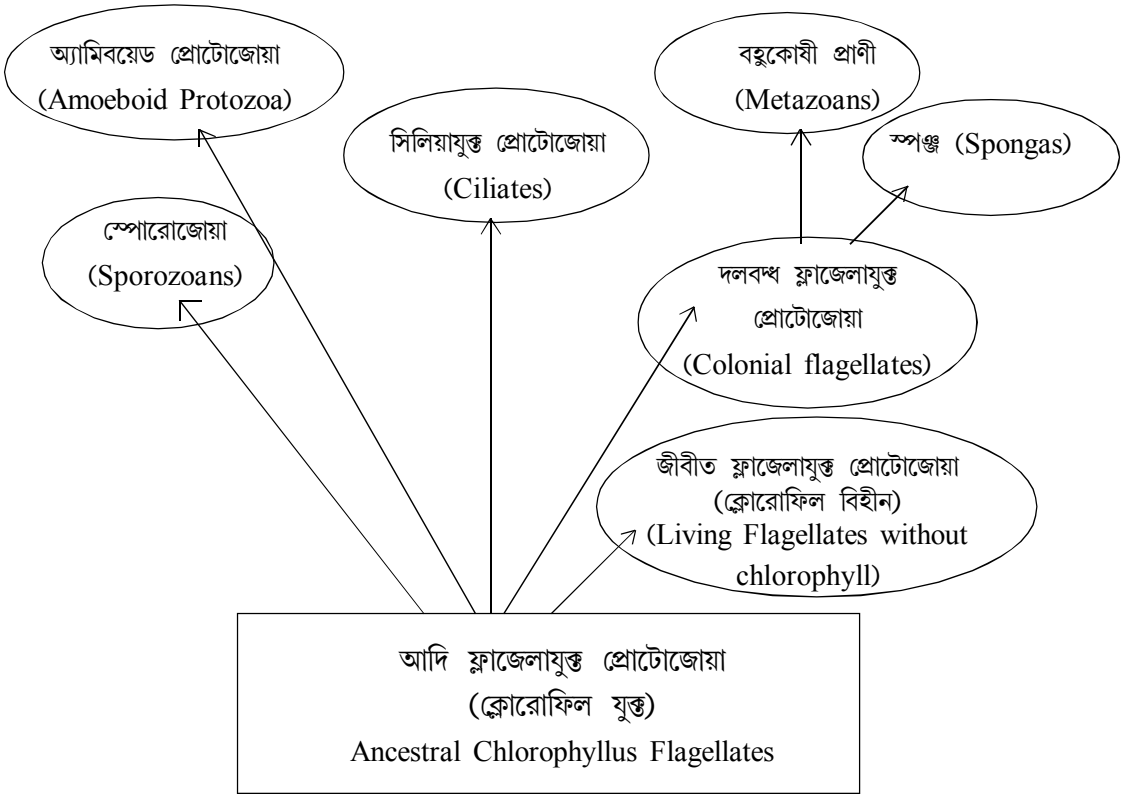

প্রোটোজোয়ার বিবর্তন ধারা

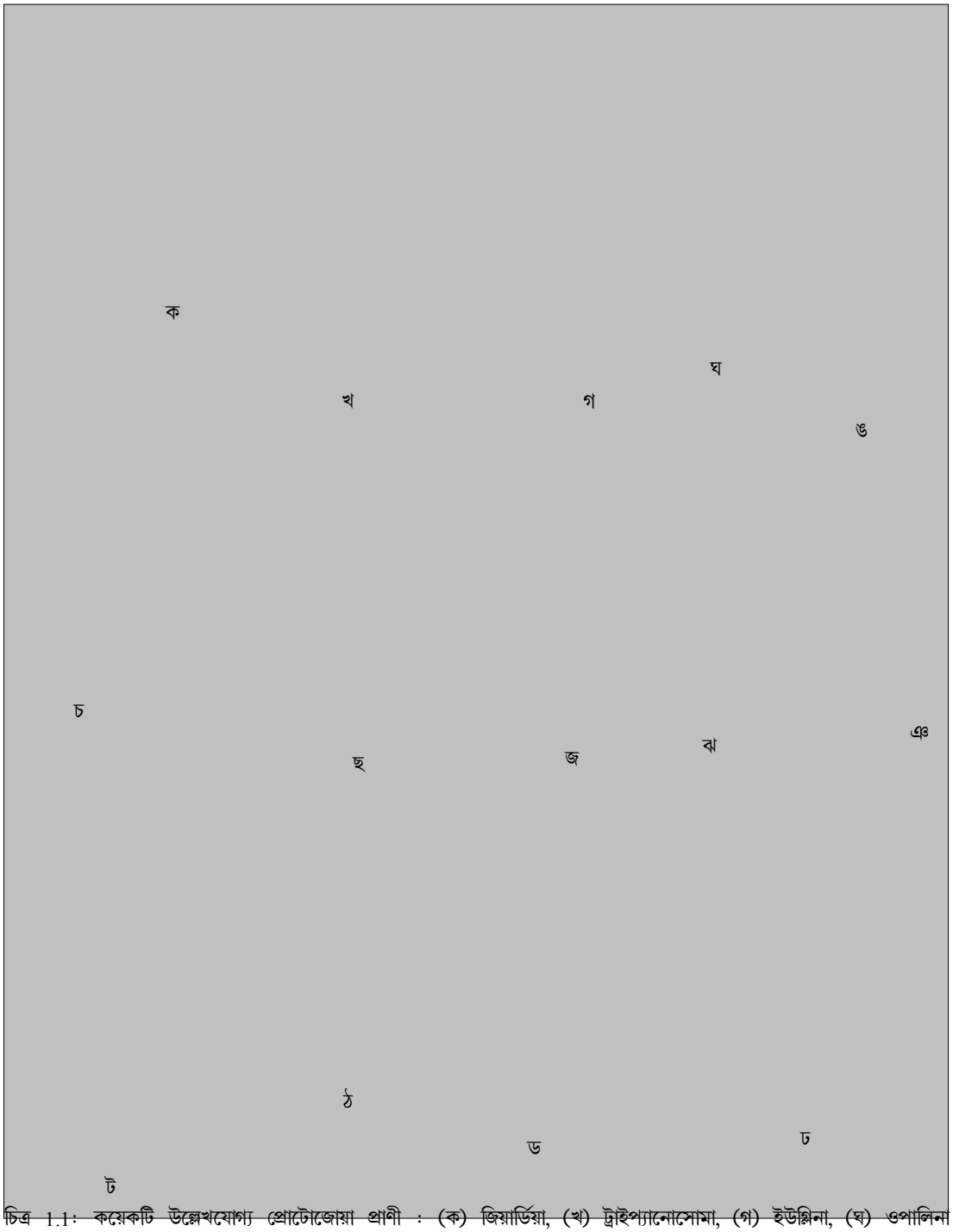

চিত্র 1.1: কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রোটোজোয়া প্রাণী : (ক) জিয়ার্ডিয়া, (খ) ট্রাইপ্যানোসোমা, (গ) ইউগ্লিনা, (ঘ) ওপালিনা (ঙ) প্রোটোওপালিনা, (চ) অ্যামিবা, (ছ) এলফিডিয়াম, (জ) মনোসিস্টিস, (ঝ) গ্রেগারিনা, (ঞ) ট্রাইকোমোনাস, (ট) প্যারামেসিয়াম, (ঠ) নিক্টোথেরস, (ড) ভর্টিসেলা, (ঢ) ব্যালানটিডিয়াম

1.2 পর্ব : পরিফেরার শ্রেণীবিন্যাস

(Porifera : GK. poros, Pore L. *ferre,* to bear)

1.2.1 শ্রেণীবিন্যাসের ছক

বহুকোষী প্রাণীদের মধ্যে পরিফেরা পর্বের প্রাণীরা সবচেয়ে প্রচীন, অনুন্নত এবং নিম্নমানের প্রাণী হিসাবে বিবেচিত হয়। এরা স্পঞ্জ জাতীয়, দেহ কোন সুনির্দিষ্ট কলাতন্ত্র দ্বারা গঠিত নয়। চলন-গমনে অক্ষম, জলে বসবাসকারী প্রাণী। প্রায় 5000 প্রজাতির প্রাণি এই পর্বভুক্ত। এদের বেশীর ভাগই সামুদ্রিক, মাত্র 150 টি প্রজাতি স্বাদু জলে বাস করে। এখানে Parker ও Haswell প্রণীত এবং Marshall ও Williams সম্পাদিত (1972) শ্রেণী বিন্যাস অনুসৃত হল।

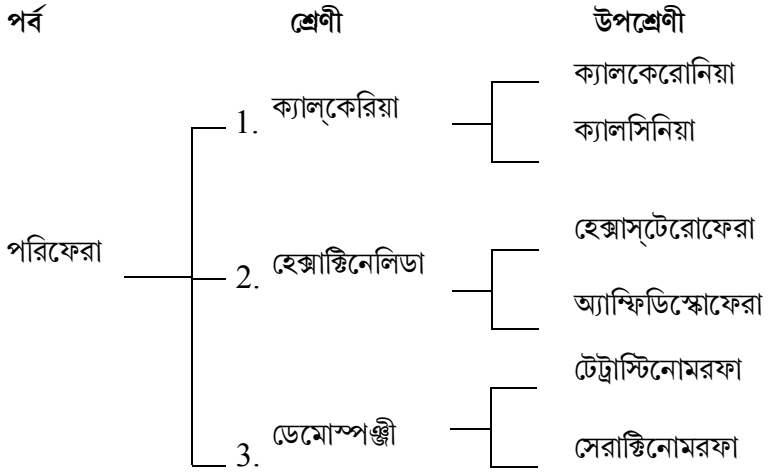

1.2.1 : পরিফেরার শ্রেণীবিন্যাসকরণ বৈশিষ্ট্য :

পর্ব : পরিফেরা

1. স্বাদু অথবা সমুদ্র জলে বাস করে।
2. চলাফেরায় অক্ষম ও জলে নিমজ্জিত বস্তুর সঙ্গে নিজেদের আবদ্ধ রাখে।
3. দেহ অরীয় ভাবে প্রতিসম বা অপ্রতিসম, শাখা-প্রশাখাযুক্ত।
4. এককভাবে বা কলোনী (উপনিবেশ) তে বাস করে।
5. দেহে অসংখ্য অষ্টিয়া (Ostia) বা ছোটছোট ছিদ্র থাকে, দেহের উপর দিকে অগ্রভাগে একটি বড় ছিদ্র থাকে, একে অসকিউলাম বলে।
6. দেহে বিশেষ নালিকাতন্ত্র থাকে।

7. বহুকোষ যুক্ত ও দ্বিস্তর বিশিষ্ট দেহ। কোন কলাতন্ত্র নেই।
8. মুখ ও পায়ুছিদ্র নেই।
9. দেহ কঙ্কালতন্ত্র স্পিকিউল নামক আনুবীক্ষনিক কাঁটা বা স্পঞ্জিন তন্তু নামক প্রোটিন দ্বারা গঠিত।
10. একলিঙ্গা বা উভলিঙ্গা। যৌন ও অযৌন জনন সম্পন্ন করে। Regeneration বা পুনোরুৎপাদন ঘটে।
11. দেহে কোয়ানোসাইট, অ্যামিবোসাইট, স্পোরোব্লাস্ট, পোরোসাইট এবং পিনাকোসাইট ইত্যাদি বিভিন্ন আকৃতির ও ভিন্ন কার্যকারী কোষ থাকে।

শ্রেণী - 1 : ক্যালকেরিয়া (Calcarea)

1. সামুদ্রিক প্রাণী
2. কোয়ানোসাইট কোষ অপেক্ষাকৃত বড়।
3. ক্ষুদ্র আকৃতি অস্কুলাম দেখা যায়।
4. অন্তঃকঙ্কাল ক্যালসিয়াম কার্বনেট যুক্ত স্পিকিউল নির্মিত।

উপশ্রেণী : ক্যাল্‌কেরোনিয়া (Calcaronea)

1. কোয়ানেসাইট কোষের নিউক্লিয়াসটি কোষের উপরের দিকে থাকে।
2. কোয়ানোসাইট কোষের ফ্লাজেলাম নিউক্লিয়াসের নিকটবর্তী স্থান থেকে উৎপন্ন হয়।
3. ত্রিরশ্মিযুক্ত স্পিকিউল দেখা যায়।
4. স্পিকিউল-এর একটি রশ্মি অন্য দুটি রশ্মির থেকে বড় হয়।
   উদাহরণ-সাইকন *(Sycon),* লিউকোসোলেনিয়া *(Leucosolenia)* প্রভৃতি।

উপশ্রেণী : ক্যালসিনিয়া (Calcinea)

1. কোয়ানোসাইট কোষ এর নিউক্লিয়াসটি কোষের নিচের দিকে থাকে।
2. ফ্লাজেলা নিউক্লিয়াস সংলগ্ন অঞ্চল থেকে উৎপন্ন হয় না।
3. স্পিকিউল ত্রিরশ্মিযুক্ত ও সমান দৈর্ঘ্যের।
   উদাহরণ - *Petrobiona* (পেট্রোবায়োনা), *Clathrina* (ক্ল্যাথ্রিনা) প্রভৃতি।

শ্রেণী - 2 : হেক্সাক্টিনেলিডা (Hexactinellida) :

1. দেহ আকৃতি ফুলদানির ন্যায়।
2. স্পিকিউল সিলিকা দ্বারা গঠিত।
3. কোয়ানোসাইট কোষ অ্যাডুলের মত গহ্বরে সীমাবদ্ধ।
4. এই ধরনের প্রাণীরা গভীর সমুদ্রে বসবাস করে।

উপশ্রেণী : হেক্সাস্টেরোফা (Hexasteropha)

1. ছয়টি রশ্মিযুক্ত ত্রিঅক্ষযুক্ত স্পিকিউল থাকে।
   উদাহরণ - *Eduplectella* sp. (ইউপ্লেক্টেলা)।

উপশ্রেণী : অ্যাম্ফিডিস্কোফোরা (Amphidiscophora)

1. স্পিকিউল- এর দুই প্রান্ত চাকতির মত।
   উদাহরণ - *Hyalonema* (হায়ালোনেমা)।

শ্রেণী 3 : ডেমোস্পঞ্জী (Demospongiae)

1. অধিকাংশই প্রাণীই সামুদ্রিক, কয়েকটি মাত্র স্বাদু জলে বাস করে।
2. দেহ জটিল নালিকাতন্ত্র যুক্ত।
3. দেহে সিলিকা নির্মিত স্পিকিউল বা স্পঞ্জিন তন্তু অথবা উভয়ই থাকে।
4. অ্যামিবোসাইট কোষে রঞ্জক কণা দেখা যায়।

উপশ্রেণী : টেট্রাক্টিনোমরফা (Tetractinomorpha)

1. দেহে উপস্থিত স্পিকিউলগুলি এক অথবা চার অক্ষযুক্ত।
2. স্পঞ্জিন তন্তু থাকে না।
   উদাহরণ - *Poterion* বা নেপচুনস কাপ, *Clione* প্রভৃতি।

উপশ্রেণী : সেরাক্টিনোমরফা (Ceractinomorpha)

1. দেহে একঅক্ষ যুক্ত স্পিকিউল থাকে।
2. স্পঞ্জিন তন্তু দেখা যায়।
   উদাহরণ - *Spongilla, Myxilla* (স্বাদু জলের প্রজাতি), প্রভৃতি।

1.2.3 পরিফেরা পর্বের প্রাণীদের বিবর্তন ধারা (Phylogeny of Porifera)

জীবাশ্মের অপ্রতুলতার কারণে পরিফেরা পর্বের প্রাণীদের বিবর্তন ধারা সম্পর্কে সঠিক জানা সম্ভব হয়নি। বেশির ভাগ বিজ্ঞানীর মতে সঙ্ঘবদ্ধ প্রোটোজোয়া গোষ্ঠী থেকে স্পঞ্জ জাতীয় প্রাণীরা উৎপন্ন হয়েছিল। এই প্রাচীন প্রাণীরা বিবর্তনের এত দীর্ঘ সময়েও এদের দেহে কোন কলাতন্ত্র গঠন করতে সক্ষম হয় নি। সেই কারণে অনুমান করা হয় যে এই প্রকার প্রাণীগোষ্ঠী থেকে পরবর্তী বহুকোষী প্রাণীদের উদ্ভব সম্ভব নয়।

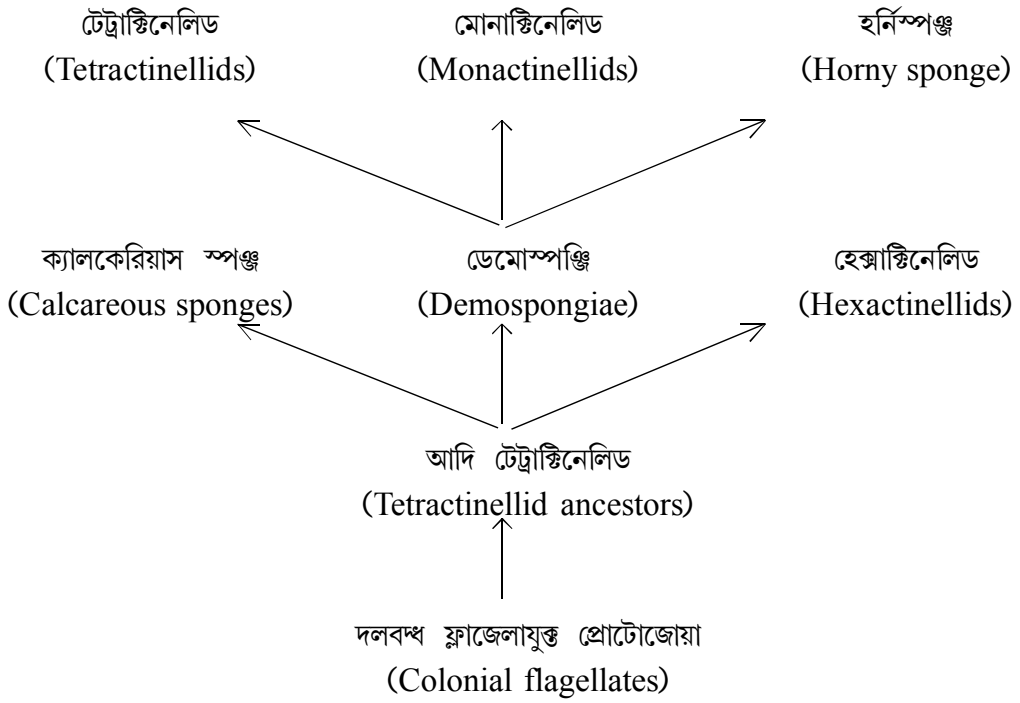

পরিফেরার প্রধান প্রধান বিভাগগুলির বিবর্তন পথ
(J.M.Weller, 1969 অনুসৃত)

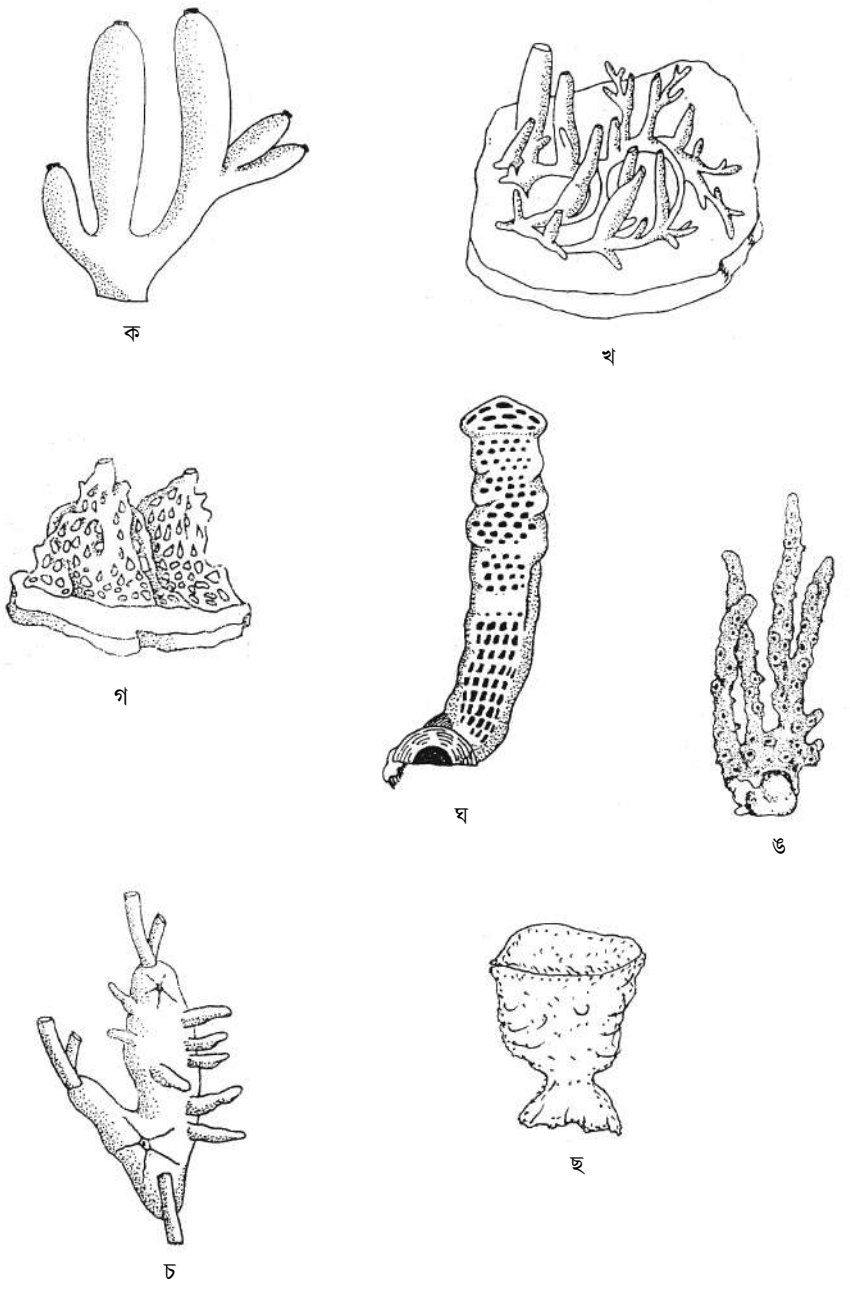

চিত্র 1.2 : পরিফেরা পর্বের কয়েকটি প্রাণী

(ক) সাইকন (খ) লিউকোসোলেনিয়া (গ) ক্লাথ্রিনা (ঘ) ইউপ্লেকটেলা (ঙ) স্পঞ্জিলা
(চ) পোটেরিয়ন (ছ) হ্যালিক্লোনা

1.3 পর্ব : অ্যানিলিডার শ্রেণীবিন্যাস (Annelida : L. *annelus,* a little ring)

1.3.1 শ্রেণীবিন্যাস ছক

অ্যানেলিডা পর্বের প্রাণীগুলি সমুদ্রের জলে, স্বাদু জলে অথবা ভিজা স্যাঁতসেতে মাটিতে বসবাস করে। এদের দেহ কতকগুলি খণ্ডকে গঠিত। দেহ খণ্ডকগুলি আংটির মত পর পর সজ্জিত থাকে। দেহ খণ্ডগুলিকে মেটামেরিক খণ্ড বলে। এই পর্বে প্রায় 8700 প্রজাতি বর্তমান।

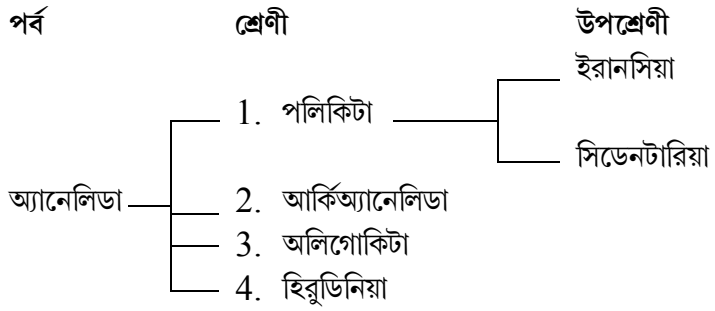

1.3.2 অ্যানিলিডার শ্রেণীবিন্যাসকরণ বৈশিষ্ট্য

পর্ব-অ্যানেলিডা (Annelida)

1. দেহ দ্বিপার্শ্বীয়ভাবে প্রতিসম এবং ত্রিস্তরযুক্ত।
2. দেহ মেটামেরিক (metameric) খণ্ডকে বিভক্ত।
3. সিলোমযুক্ত দেহগহ্বর এবং সিলোমিক তরলপূর্ণ।
4. কিউটিক্‌ল্‌ দ্বারা দেহ ঢাকা থাকে।
5. সিটা বা প্যারাপোডিয়া চলনে সাহায্য করে।
6. বন্ধ ও উন্নত রক্ত সংবহন বর্তমান।
7. রেচন অঙ্গের নাম নেফ্রিডিয়া।
8. উভলিঙ্গ অথবা একলিঙ্গ যুক্ত প্রাণী
9. যৌন বা অযৌন পদ্ধতিতে জনন সম্পন্ন করে।
10. ত্বক-এর সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়। কোন কোন ক্ষেত্রে ফুলকার সাহায্যে শ্বাসকার্য সম্পন্ন করে।
11. জীবনচক্রে কোন কোন প্রাণীর ট্রোকোফোর লার্ভা দশা দেখা যায়।

শ্রেণী-1 : পলিকিটা (Polychaeta)

1. দেহ অসংখ্য সুস্পষ্ট খণ্ডকে বিভক্ত।
2. চলন অঙ্গের নাম প্যারাপোডিয়াম (Parapadium; Plural Parapodia)।
3. ক্লাইটেলাম থাকে না।
4. চোষক থাকে না।
5. একলিঙ্গা প্রাণী
6. বহিঃনিষেক সম্পন্ন হয়।
7. জীবনচক্রে ট্রোকোফোর লার্ভা দশা থাকে।
8. মস্তক সুস্পষ্ট এবং উপাঙ্গ যুক্ত।
9. সামুদ্রিক অথবা মোহনা বাসী।

উপশ্রেণী : ইরানসিয়া (Errantia)

1. সমস্ত দেহখণ্ডকগুলি একই প্রকারের।
2. দেহ অসিকুলা নামক অন্তঃকঙ্কাল যুক্ত।
3. প্যারাপোডিয়া উন্নত প্রকৃতির।
4. গলবিলে কাইটিন নির্মিত চোয়াল থাকে এবং গলবিল দেহের বাইরে প্রসারণক্ষম।
5. সাধারণতঃ স্বাধীনজীবী প্রাণী।
6. শ্বসন অঙ্গ ব্রাঙ্কি সমগ্র দেহ জুড়ে অবস্থান করে।
   উদাহরণ-নেরিস (*Nereis* or Neanthes), *Aphrodite* অ্যাফ্রোডাইট প্রভৃতি।

উপশ্রেণী : সিডেনটারিয়া (Sedentaria)

1. দেহখণ্ডকগুলি বিভিন্ন ধরনের হয়, ফলে দেহটি দুই তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত।
2. অসিকুলা বিহীন, অনুন্নত প্যারাপোডিয়া বর্তমান।
3. চোয়াল বিহীন গলবিল প্রসারণে অক্ষম।
4. গর্তে অথবা বালি নির্মিত নালীতে বসবাস করে।
5. শ্বসন অঙ্গ ব্র্যাঙ্কি কেবলমাত্র দেহের অগ্রভাগে থাকে।
   উদাহরণ - স্যাবেলা (*Sabella*), কিটপ্টেরাস (*Chaetopterus*) প্রভৃতি।

শ্রেণী -2 : আর্কিঅ্যানিলিডা (Archiannelida)

1. সাধারণতঃ সমুদ্র, মোহনা অথবা স্বাদু জলে বসবাস করে।
2. বাইরের দিকে দেহখণ্ডকগুলি অস্পষ্ট।
3. গমন অঙ্গ সিটা বা প্যারাপোডিয়া, ছোট আকৃতির অথবা না থাকতেও পারে।
4. মস্তক কর্ষিকাযুক্ত।
5. চোষক থাকে না।
6. ক্লাইটেলাম নেই।

7. একলিঙ্গা প্রাণী।
8. জীবন চক্রে ট্রোকোফোর লার্ভা দশা দেখা যায়।
   উদাহরণ - প্রোটোড্রিলাস (*Protodrillus*), পলিগর্ডিয়াস (*Polygordius*) প্রভৃতি।

শ্রেণী - 3 : অলিগোকিটা (Oligochaeta)

1. সাধারণতঃ স্বাদু জলে অথবা স্থলে বাস করে।
2. দেহ অসংখ্য দেহখণ্ডকযুক্ত এবং খণ্ডকগুলি সুস্পষ্ট।
3. মস্তিষ্ক সুস্পষ্ট নয় এবং উপাঙ্গা বিহীন।
4. ক্লাইটেলাম থাকে।
5. সাধারণতঃ উভলিঙ্গা প্রাণী কিন্তু পরনিষেক ঘটে।
6. পরনিষেক সম্পন্ন হয়।
7. চলন অঙ্গের নাম সিটা।
8. দেহে চোষক থাকে না।
9. জীবনচক্রে লার্ভা দশা থাকে না।
   উদাহরণ - কেঁচো (*Pheretima*), টিউবিফেক্স (Tubifex) প্রভৃতি।

শ্রেণী-4 : হিরুডিনিয়া (Hirudinea)

1. এই শ্রেণীর প্রাণীগুলি সমুদ্রের জলে, স্বাদু জলে বা স্থলে বাস করে।
2. এদের দেহ নির্দিষ্ট কয়েকটি খণ্ডকে বিভক্ত এবং প্রতিটি খণ্ড বাইরে থেকে কয়েকটি খণ্ডাংশে বিভক্ত।
3. উপাঙ্গা বিহীন মস্তকটি অস্পষ্ট।
4. দেহ পেশীর সাহায্যে গমন কার্য সম্পন্ন করে। সিটা বা প্যারাপোডিয়া জাতীয় গমন অঙ্গা থাকে না।
5. চোষক থাকে
6. প্রজনন ঋতুতে ক্লাইটেলামের আবির্ভাব ঘটে।
7. উভলিঙ্গা প্রাণী কিন্তু পরনিষেক ঘটে।
8. জীবনচক্রে লার্ভা দশা দেখা যায় না।

উদাহরণ— জোঁক *(Hirundinaria),* পনটরডেলা *(Pontordella)* প্রভৃতি।

1.3.3 অ্যানিলিডার বিবর্তন ধারা (Phylogeny of Annelida)

জীবাশ্মের অপ্রতুলতার জন্য অ্যানিলিডা পর্বের প্রাণীদের বিবর্তন ধারা সুস্পষ্ট নয়। তথাপি বিজ্ঞানী Nichols (1971) ভ্রুণের বিকাশ পদ্ধতির পর্যবেক্ষণ করে অনুমান করেন যে চ্যাপ্টা কৃমি জাতীয় প্রাণীরাই অ্যানিলিডা পর্বের প্রাণীদের পূর্বপুরুষ। বিজ্ঞানী Clark (1969) - এর মত অনুযায়ী অ্যানিলিডা পর্বের প্রাণীদের মধ্যে অলিগোকিটা অথবা পলিকিটা শ্রেণীর প্রাণীরাই প্রথম উদ্ভুত হয়েছিল। তবে সাধারণতঃ পলিকিটা প্রাণীদেরই অ্যানিলিডা পর্বের প্রাথমিক প্রাণীরূপে গণ্য করা হয়। আর্কিঅ্যানিলিডা প্রাণীদের পলিকিটা থেকে উদ্ভুত এক প্রকার সরল প্রাণী বলে মনে করা হয়। বিজ্ঞানী Nichols -এর মতানুসারে অলিগোকিটা থেকে হিরুডিনিয়ার উৎপত্তি হয়েছে।

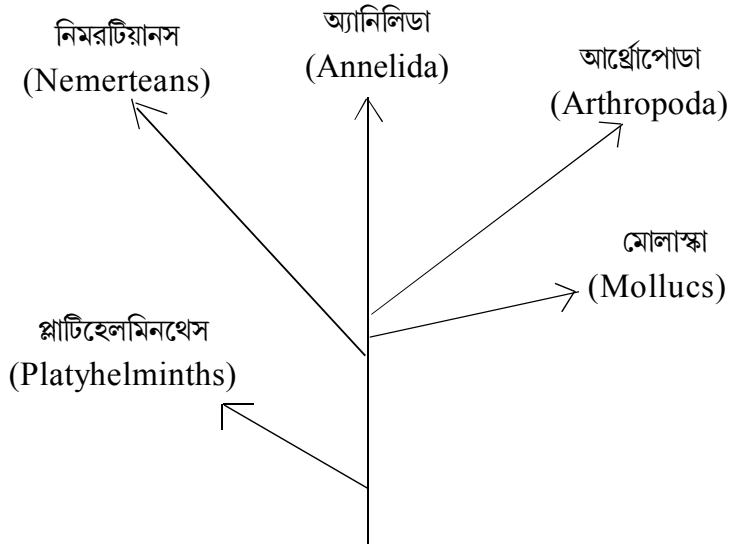

অ্যানিলিডার সম্ভাব্য বিবর্তন ধারা (Willmer, 1990-এর Invertebrate Relationship নামক পুস্তক থেকে গৃহীত ও আংশিক পরিবর্তিত)

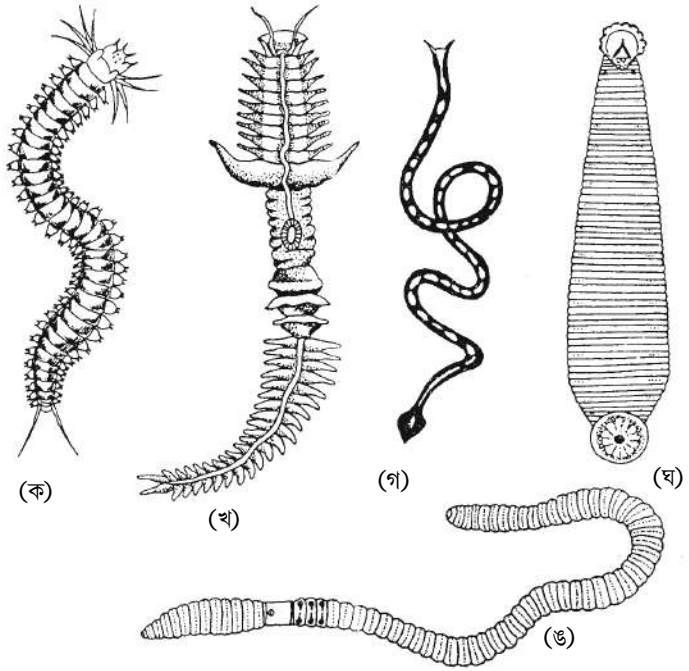

চিত্র 1.3 : অ্যানেলিডা পর্বের কয়েকটি প্রাণী (ক) নেরিস (খ) কিটপ্টেরাস (গ) পলিগর্ডিয়াস (ঘ) জোঁক (ঙ) কেঁচো

1.4 পর্ব : আর্থ্রোপোডার শ্রেণীবিন্যাস (Arthropoda : G.K. *arthro*=joint; poda=foot)

1.4.1 পর্ব আর্থ্রোপোডার শ্রেণীবিন্যাসের ছক

প্রাণিজগতে প্রাণী সংখ্যার দিক দিয়ে সবচেয়ে বড় পর্ব হলো—আর্থ্রোপোডা। প্রায় 12-13 লক্ষ প্রজাতির প্রাণী সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা অবহিত আছেন এবং এই প্রাণীদের পাঁচ ভাগের চার ভাগই হলো আর্থ্রোপোডা পর্বভুক্ত। সম্ভবতঃ আরও অনেক আর্থ্রোপোডা প্রজাতি সম্পর্কে এখনও জানা যায় নি।

এত অসংখ্য প্রজাতিযুক্ত পর্বের শ্রেণীবিভাগ করা অত্যন্ত জটিল এবং দুরূহ ব্যাপার। সেই কারণে কোন বিজ্ঞানীকৃত শ্রেণীবিভাগই সমালোচনার উর্দ্ধে নয়। এখানে আর্থ্রোপোডা পর্বের শ্রেণীবিন্যাস parker ও Haswell প্রণীত এবং Marshall ও William কর্তৃক সম্পাদিত (1972) শ্রেণীবিন্যাস অনুসৃত হ'ল—

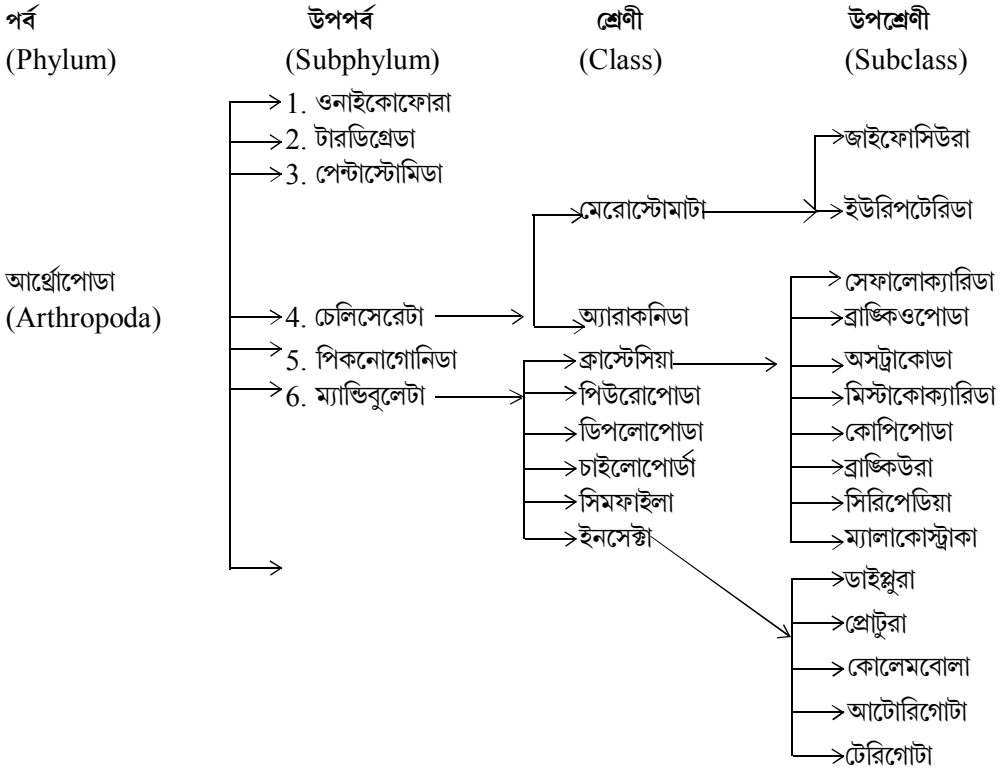

1.4.2 আর্থ্রোপোডার শ্রেণীবিন্যাসকরণ বৈশিষ্ট্য

পর্ব — আর্থ্রোপোডা

1. দেহ দ্বিপার্শ্বীয়ভাবে প্রতিসম, ত্রিস্তরযুক্ত এবং খণ্ডকযুক্ত।
2. বহিঃকঙ্কাল কাইটিন অথবা ক্যালসিয়াম যৌগ নির্মিত।
3. মস্তক, বক্ষ ও উদর এই তিনটি অংশ দ্বারা দেহ গঠিত। কোন কোন ক্ষেত্রে এক বা একাধিক অংশ একত্রিত অবস্থায় থাকতে পারে।
4. প্রতি দেহখণ্ডে বা কিছু দেহখণ্ডে একজোড়া সন্ধিল উপাঙ্গ থাকে।
5. পৌষ্টিক নালি সম্পূর্ণ। মুখ ও পায়ুছিদ্র দেহের দুইপ্রান্তে অবস্থিত।
6. মুক্ত রক্ত সংবহন তন্ত্র আছে। হিমোসিল প্রধান দেহগহবর।
7. প্রধান শ্বসন অঙ্গগুলি হ'ল—ফুলকা, বুকলাঙ, বুক গিল, শ্বাসনালী ইত্যাদি।
8. রেচন অঙ্গ—ম্যালপিজিয়ান নালিকা, গ্রীন গ্রন্থি (সবুজগ্রন্থি) কক্রাল গ্রন্থি ইত্যাদি।
9. পুঞ্জাক্ষি বা সরলাক্ষি থাকে।
10. সাধারণতঃ একলিঙ্গ প্রাণী। যৌন দ্বিরুপতা দেখা যায়।
11. জীবনচক্রে লার্ভা দশা থাকে।
12. স্নায়ুতন্ত্র সাধারণত দুটি পৃষ্ঠীয় সেরিব্রাল গ্যাংলিয়া, সারকাম ইসোফেজিয়াল অঙ্গুরী (Ring) ও স্নায়ুরজ্জু নিয়ে গঠিত।

উপপর্ব - 1 : ওনাইকোফোরা (Onychophora)

1. দেহ লম্বাটে নলাকার, বহিঃকঙ্কাল বিহীন এবং কাইটিনযুক্ত কিউটিক্‌ল্‌ দ্বারা আবৃত।
2. মস্তক তিনটি খণ্ডকে গঠিত এবং দেহ থেকে স্পষ্টভাবে পৃথক নয়।
3. প্রথম দেহখণ্ডকে একজোড়া উপাঙ্গ থাকে।
4. মুখছিদ্রের পরবর্তী দেহখণ্ডকে একজোড়া চোয়াল ও একজোড়া ওরাল প্যাপিলা থাকে।
5. অসংখ্য যুগ্ম নখরযুক্ত অসন্ধিল পদ আছে।
6. মস্তকে একজোড়া চোখ, একজোড়া শুঙ্গ, একজোড়া চোয়াল থাকে।
7. শ্বাসনালীর (Trachea) দ্বারা শ্বাসকার্য করে।
8. প্রত্যেক দেহখণ্ডকে একজোড়া রেচননালী থাকে।
9. স্নায়ুতন্ত্র মই (ladder)- এর মত।
10. প্রকৃত সিলোম অনুপস্থিত এবং হিমোসিল আছে।
11. জীবনচক্রে লার্ভা দশা থাকে না, প্রত্যক্ষ পরিস্ফুরণ ঘটে।

উদাহরণ— পেরিপেটাস *(Peripatus)*।

উপপর্ব - 1 : টারডিগ্রেডা (Tardigrada)

1. নরম ত্বকযুক্ত ক্ষুদ্রাকার প্রাণী। দেহ এক মিলিমিটারের বেশী লম্বা হয় না।
2. ভিজা মসের সঙ্গে বা স্বাদু জলে বা সমুদ্রে বাস করে।
3. দেহ নলাকৃতি, অ্যালবুমিন সমৃদ্ধ কিউটিকলে ঢাকা থাকে।
4. দেহ বিভাজন অস্পষ্ট।
5. অঙ্গীয় তলে অবস্থিত পায়ের সংখ্যা আটটি এবং চার থেকে আটটি নখর যুক্ত।
6. মুখছিদ্র ঘিরে প্যাপিলা থাকে।
7. মুখগহবরে একজোড়া দাঁত থাকে।

উদাহরণ— ম্যাক্রোবায়োটাস *(Macrobiotus)*।

উপপর্ব - 3 : পেন্টাস্টোমিডা (Pentastomida)

1. কৃমি আকৃতির প্রাণী, জিহবা কীট (Tongue worm) নামে পরিচিত।
2. পরজীবী, মেরুদণ্ডী প্রাণীদের নাসাপথে বা ফুসফুসে বাস করে।
3. দৈর্ঘ্যে কয়েক মিলিমিটার থেকে 14 সেন্টিমিটার পর্যন্ত লম্বা হয়।
4. দেহের অগ্রপ্রান্তে পাঁচটি ক্ষুদ্র স্ফীত অংশ থাকে যার প্রথম দুটি এবং শেষ দুইটি পা-এর মত এবং নখরযুক্ত। মাঝের অংশটিতে মুখছিদ্র থাকে।
5. নখযুক্ত স্ফীত অংশের দ্বারা পোষকের কলায় সংলগ্ন থাকে।
6. পৌষ্টিক নালী লম্বা এবং সরল, অগ্রভাবে রক্ত শোষণে সাহায্য করে।
7. দেহ পুরু কিউটিকলে আবৃত।
8. একলিঙ্গ প্রাণী।

উদাহরণ—পোরোসেফালাস *(Porocephalus),* লিংগুয়াটুলা *(Linguatula)* প্রভৃতি।

উপপর্ব - 4 : চেলিসেরাটা (Chelicerata)

1. দুইটি অংশে দেহ বিভক্ত। সম্মুখ ভাগকে প্রোসোমা ও পশ্চাদভাগকে অপিসথোসোমা বলে।
2. প্রোসোমাতে ছয় জোড়া উপাঙ্গ থাকে।
3. সামনের প্রথম জোড়া উপাঙ্গকে চেলিসেরা বলে।
4. শুঙ্গ অনুপস্থিত কিন্তু পেডিপাল্প থাকে।
5. শ্বসন অঙ্গ বুকলাঙ্, বুক গিল ইত্যাদি।

শ্রেণী: মেরোস্টোমাটা (Merostomata)

1. সামুদ্রিক প্রাণী।

2. উদর অংশে পাঁচ বা ছয় জোড়া উপাঙ্গ থাকে, যেগুলি পুস্তক ফুলকায় (book gill) রূপান্তরিত হয়।
3. দেহের পশ্চাদ ভাগে টেল্‌সন (telson) থাকে।

উপশ্রেণী: জাইফোসিউরা (Xiphosura)

1. সমুদ্র তীরবর্তী অংশে বসবাস করে, হর্স সু ক্রাব (horse-shoe crab) নাম পরিচিত।
2. প্রোসোমা ক্যারাপেস (carapace) নামক শক্ত আবরণে ঢাকা থাকে।
3. ক্যারাপেসের দুই পাশে পুঞ্জাক্ষি এবং মাঝখানে সরলাক্ষি দেখা যায়।
4. খণ্ডকবিহীন অপিসথোসোমা অনুপ্রস্থ কব্জা (hiuge) দ্বারা প্রোসোমার সঙ্গে যুক্ত।
5. কডাল স্পাইন ত্রিকোণাকৃতি।
6. রেচন অঙ্গ কক্সাল গ্রন্থি (coxal gland)

উদাহরণ— কারসিনোস্করপিয়াস *(Carcinoscorpius),* লিমুলাস *(Limulus)* প্রভৃতি।

শ্রেণী: অ্যারাকনিডা (Arachnida)

1. দেহ প্রোসোমা বা সেফালোথোরাক্স (caphalothorax) এবং উদরে বিভক্ত।
2. সেফালোথোরাক্সে ছয় জোড়া উপাঙ্গ থাকে, যার প্রথম জোড়া চেলিসেরা বা চিমটাপদ, দ্বিতীয় জোড়া পেডি পাল্প এবং পরের চার জোড়া পা হিসাবে বিবেচিত।
3. অপিসথোসামা বা উদরের অগ্রাংশে জনন ছিদ্র থাকে।
4. অপিসথোসোমার একমাত্র উপাঙ্গ কাঁকড়া বিছার পেকটিন (pectine) এবং মাকড়সার বয়ন যন্ত্র (spinneret)।
5. শ্বসন অঙ্গ বুকগিল, শ্বাসনালী এবং কখনও কখনও ত্বক।
6. সরলাক্ষি থাকে।
7. পোষ্টিক নালীতে প্রচুর পাচন থলি ও রেচন নালী যুক্ত থাকে।
8. জীবনচক্রে রূপান্তর থাকে না।

উদাহরণ— কাঁকড়া বিছা, মাকড়সা, টিক বা এঁটুলি ও মাইট প্রভৃতি।

উপপর্ব - 5 : পিক্‌নোগোনিডা (Pycnogonida)

1. সামুদ্রিক মাকড়সা জাতীয় প্রাণী।
2. দেহ সেফালোথোরাক্স, তিনটি বক্ষ খণ্ডক ও একটি লুপ্তপ্রায় উদর যুক্ত।
3. সেফালোথোরাক্সের সামনে প্রোবোসিস, তিনটি মস্তক খণ্ডক ও একটি বক্ষ খণ্ডক থাকে।
4. স্বাভাবিক উপাঙ্গ ব্যতীত ডিম্বক ধারনের জন্য অভিযোজিত পর্দা থাকে।

5. শ্বসন- ও রেচন অঙ্গ নেই।
6. একলিঙ্গা প্রাণী।
7. জীবনচক্রে প্রোটোনিম্ফন্ (Protonymphon) নামক লার্ভা দশা থাকে।

উদাহরণ—পালেনি *(Pallene),* নিম্ফন *(Nymphon)* প্রভৃতি।

উপপর্ব - 6 : ম্যান্ডিবুলাটা (Mandibulata)

1. মস্তক, বক্ষ ও উদর এই তিনটি অংশে দেহ বিভক্ত।
2. মস্তকে যুগ্ম শুঙ্গা, সরলাক্ষি, পুঞ্জাক্ষি, চোয়াল ও ম্যাক্সিলা থাকে।
3. বক্ষাংশ তিন বা ততোধিক খণ্ডক দ্বারা গঠিত।
4. শ্বাসকার্য ত্বক, শ্বাসনালী অথবা পাতলা প্রাকার দ্বারা নির্মিত উপবৃদ্ধি দ্বারা সম্পন্ন হয়।
5. এই উপপর্বের প্রাণীরা স্বাদু জলে, মোহনার জল, সমুদ্রে অথবা স্থলে বাস করে। পতঙ্গ শ্রেণীর প্রাণীরা সাধারণত বাতাসে ওড়ে।

শ্রেণী—ক্রাস্টেসিয়া (Crustacea):

1. দেহ মস্তক, বক্ষ ও উদরে বিভক্ত। অগ্রভাগের ছয়টি দেহখণ্ডক যুক্ত হয়ে মস্তক গঠন করে। কোন কোন ক্ষেত্রে মস্তক ও বক্ষ যুক্ত হয়ে শিরোবক্ষ (cephalothorax) গঠন করে।
2. মস্তিষ্কের তৃতীয় খণ্ডকে একজোড়া শুঙ্গা অবস্থিত।
3. শ্বসন অঙ্গ — ফুলকা।
4. উদরের শেষ অংশে টেলসন থাকে।
5. পৌষ্টিক নালী সরল এবং অগ্র, মধ্য ও পশ্চাৎ অংশে বিভক্ত।
6. সাধারণত একলিঙ্গা প্রাণী। যৌন দ্বিরূপতা দেখা যায়। কোন কোন প্রাণী উভলিঙ্গা।
7. যৌন জনন সম্পন্ন হয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অপুংজনি দেখা যায়।
8. জীবন চক্রে নপ্লিয়াস, সাইপ্রিস, মেগালোপা ও জোইয়া প্রভৃতি লার্ভা দশা দেখা যায়।

উপশ্রেণী—সেফালোক্যারিডা (Cephalocarida)

1. দেহ ক্ষুদ্রাকৃতি।
2. মস্তক অশ্বক্ষুরাকৃতি, কোন চোখ থাকে না।
3. দেহে 19 টি খণ্ডক বিদ্যমান।
4. এরা উভলিঙ্গা প্রাণী।

উদাহরণ—লাইটিয়েল্লা *(Lightiella),* হাচিন্সনিল্লা *(Hutchinsonilla)* প্রভৃতি।

উপশ্রেণী — ব্রাঙ্কিওপোডা (Branchiopoda)

1. ক্যারাপেস থাকলে আকৃতিতে বিভন্ন রকমের হয়।
2. একজোড়া পুঞ্জাক্ষি থাকে।

3. উপাঙ্গাগুলির গঠন একই প্রকার ও পাতার মতো।
4. অ্যানটেনিউল খুব ছোট অথবা থাকে না।
5. দেহ স্পষ্ট খণ্ডকে গঠিত।
6. বক্ষ উপাঙ্গাগুলি একই রকম এবং পাতার মতো।
7. উদর অংশ উপাঙ্গা বিহীন।
8. টেলসন শাখা যুক্ত (rami)।
9. জনন ছিদ্রের অবস্থান বিভিন্ন স্থানে হয়।
10. প্রধানত স্বাদু জল বাস করে।

উদাহরণ — ডাফ্নিয়া *(Daphnia),* ব্রাঙ্কিপাস *(Branchipus)*

উপশ্রেণী—অষ্ট্রাকোডা (Ostracoda)

1. দেহ দ্বিখোলকযুক্ত ক্যারাপেসে সম্পূর্ণ আবৃত।
2. দেহ খণ্ডক অস্পষ্ট বা থাকে না।
3. অ্যানিটেনিউল ও অ্যানটেনি খুব উন্নত ও সাঁতারে সাহায্য করে।
4. একটি ম্যান্ডিবুলার পাল্প্ থাকে।
5. সাধারণত দুই জোড়া বক্ষ উপাঙ্গা থাকে কিন্তু কখনও চার জোড়ার বেশী থাকে না।
6. উদর উপাঙ্গা বিহীন।
7. শাখাযুক্ত টেলসন থাকে।
8. জননছিদ্র শেষ উপাঙ্গা জোড়ার পিছনে অবস্থিত। উদাহরণ—সাইপ্রিস *(Cypris),* সাইপ্রিডিনা *(Cypridina)* প্রভৃতি।

উপশ্রেণী—মিস্টাকোক্যারিডা (Mystococarida)

1. দেহ লম্বাটে, মস্তক, বক্ষ ও উদরে বিভক্ত।
2. মস্তক পাঁচটি এবং উদর ছয়টি খণ্ডক নিয়ে গঠিত।
3. ক্যারাপেস থাকে।
4. মস্তক উপাঙ্গা উন্নত ধরনের।
5. একটি মাত্র চোখ থাকে।
6. ম্যাণ্ডিবল বাইরেমাস এবং বাহুর মত কাজ করে।
7. শেষ চারটি বক্ষ খণ্ডক ও সমস্ত উদর খণ্ডক মুক্ত।
8. বক্ষ উপাঙ্গাগুলি ক্ষুদ্র এবং শেষ উদর খণ্ডে কডাল স্টাইল ছাড়া আর কোন উপাঙ্গা থাকে না।
9. র‍্যামাস যুক্ত টেলসন থাকে।
10. জনন ছিদ্র প্রথম বক্ষ খণ্ডকে অবস্থিত।

উদাহরণ— ডেরোচাইলোক্যারিস *(Derocheilocaris)*

উপশ্রেণী-কোপিপোডা (Copepoda)

1. স্বাধীন অথবা পরজীবী।
2. দেহ লম্বাটে এবং খণ্ডকযুক্ত।
3. দেহ মস্তক, বক্ষ ও উদরে বিভক্ত।
4. বক্ষ ছয়টি খণ্ডকে গঠিত, কিন্তু প্রথম খণ্ডক এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে দ্বিতীয় খণ্ডক মস্তকের সঙ্গে যুক্ত হয়ে শিরোবক্ষ গঠন করে।
5. ছয় জোড়া বক্ষ উপাঙ্গ থাকে।
6. প্রথম ও কখনও বা শেষ বক্ষ উপাঙ্গ এক শাখ (uniramous) হয়।
7. উদর উপাঙ্গ বিহীন।
8. দেহ নয়টি মুক্ত খণ্ডক যুক্ত।
9. শাখাযুক্ত টেলসন থাকে।
10. সপ্তম বক্ষ খণ্ডকে জনন ছিদ্র থাকে।

উদাহরণ-সাইক্লপস্ *(Cyclops),* লারনিয়া প্রভৃতি।

উপশ্রেণী-ব্রাঙ্কিউরা (Branchiura)

1. অস্থায়ীভাবে মাছ অথবা উভচর প্রাণীতে বহিঃপরজীবী রূপে অবস্থান করে।
2. দেহ মস্তক, বক্ষ ও উদর অঞ্চলে বিভক্ত।
3. মস্তক থেকে একটি দ্বিখণ্ডকযুক্ত সেফালিক ভাঁজ উৎপন্ন হয়, এটি শিরোপাবক্ষকে ঢেকে রাখে।
4. একজোড়া পুঞ্জাক্ষি থাকে।
5. ক্ষুদ্রাকৃতি অ্যানটেনিউল ও অ্যাননিি থাকে।
6. প্রথম ম্যাক্সিলা এক জোড়া চোষক তৈরী করে।
7. দ্বিতীয় জোড়া ম্যাক্সিলা ইউনিরেমাস ও নখরযুক্ত।
8. চারজোড়া দ্বিশাখ (biramous) বক্ষোপাঙ্গ থাকে।

উদাহরণ— আরগুলাস *(Argulas),* ডোলোপস্ *(Dolops)* প্রভৃতি।

উপশ্রেণী-সিরিপেডিয়া (Cerripedia)

1. প্রায় সকলেই সামুদ্রিক, স্বাধীনজীবী অথবা পরজীবী।
2. দেহ অস্পষ্টভাবে খণ্ডিত।
3. ক্যারাপেস সম্পূর্ণভাবে দেহ ও উপাঙ্গ ঢেকে রাখে। ক্যালকেরিয়াস প্লেট থাকে।
4. জীবনচক্রে নপ্লিয়াস ও সাইপ্রিস লার্ভা দশা দেখা যায়।
5. পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে যুগ্ম পুঞ্জাক্ষি ও শুড় থাকে না।
6. একই ধরনের ছয়জোড়া দ্বিশাখ বক্ষ উপাঙ্গ থাকে।

7. উদর উপাঙ্গবিহীন।
8. উভলিঙ্গ প্রাণী।
9. স্ত্রী জনন ছিদ্র প্রথম বক্ষ খণ্ডকে এবং পুরুষ জনন ছিদ্র শেষ উপাঙ্গ জোড়ার পশ্চাতে অবস্থিত।
উদাহরণ— লেপাস *(Lepas),* ব্যালানাস *(Balanus)* প্রভৃতি।

উপশ্রেণী-ম্যালাকোস্ট্রাকা (Malacastraca)

1. দেহ সুস্পষ্ট খণ্ডকযুক্ত ; মস্তক, বক্ষ ও উদরে বিভক্ত এবং টেলসন থাকে।
2. পুঞ্জাক্ষি থাকে।
3. অ্যানটেনিউল ও অ্যান্টেনি উন্নত।
4. আট জোড়া বক্ষ ও ছয় জোড়া উদর উপাঙ্গ থাকে।
5. মস্তকের পশ্চাদভাগ একাধিক বক্ষ খণ্ডকের সঙ্গে মিলে শিরোবক্ষ গঠন করে।
6. স্ত্রী জনন ছিদ্র ষষ্ঠ ও পুরুষ জনন ছিদ্র অষ্টম বক্ষ খণ্ডকে অবস্থিত।

উদাহরণ— স্কুইলা *(Squilla),* কাঁকড়া *(Scylla),* চিংড়ি প্রভৃতি।

শ্রেণী—পিউরোপোডা (Pauropoda)

1. ক্ষুদ্রাকৃতির দেহতে এগারোটি দেহ খণ্ডক এবং একটি অ্যানল পাইজিডিয়াম থাকে।
2. শ্বাসনালী ও হৃদ্‌যন্ত্র থাকে।
3. নয় জোড়া উপাঙ্গ থাকে।
4. একজোড়া ম্যাক্সিলা থাকে।
5. চক্ষু নেই।
6. সরল অসন্ধিল (unjointed) চোয়াল থাকে।
উদাহরণ—পাউরোপাস *(pauropus)*।

শ্রেণী-ডিপ্লোপোডা (Diplopoda)

1. দেহ লম্বাটে নলাকার।
2. দেহকাণ্ডে অসংখ্য খণ্ডক থাকে।
3. প্রত্যেক খণ্ডকে দুই জোড়া পা থাকে। কিন্তু প্রথম চারটি খণ্ডকে একজোড়া করে পা থাকে।
3. যুগ্ম অ্যানটিনি, ম্যান্ডিবল্ ও ম্যাক্সিলা থাকে।
4. ট্রাকিয়া গুচ্ছাকারে উৎপন্ন হয় কিন্তু জালক উৎপন্ন করে না।
উদাহরণ— কেন্নো *(Julus),* পলিডেসমাস *(Polydesmus)* প্রভৃতি।

শ্রেণী—কাইলোপোডা (Chipoda)

1. অসংখ্য খণ্ডক দ্বারা দেহ গঠিত।
2. লম্বা শুঙ্গ, ম্যান্ডিবল ও দুই জোড়া ম্যাক্সিলা থাকে।
3. সঙ্গম অঙ্গ থাকে না।

4. দেহকাণ্ডের প্রথম খণ্ডকের উপাঙ্গ জোড়া বিষ নখরে পরিণত হয়।
5. ট্রাকিয়া জালক তৈরী করে।

উদাহরণ—তেঁতুল বিছা *(Scolopendra),* লিথোবিয়াস *(Lithobius)* প্রভৃতি।

শ্রেণী—সিম্‌ফাইলা (Symphyla):

1. ক্ষুদ্রাকৃতি (1-8 মিমি. দীর্ঘ) দেহটিতে বারোটির বেশী খণ্ডক থাকে না।
2. প্রত্যেক দেহ খণ্ডকে পা থাকে।
3. প্রথম খণ্ডকে একজোড়া সার্সি (cerci) এবং রেশম গ্রন্থি (silk gland) ও শেষ খণ্ডকে একজোড়া লম্বা সংবেদন রোম (sensory rair) থাকে।
4. দুই জোড়া ম্যাক্সিলা মধ্যরেখা বরাবর যুক্ত হয়ে লেবিয়াম গঠন করে।
5. মস্তকে একজোড়া শ্বাসছিদ্র বর্তমান এবং দেহের প্রথম তিনটি খণ্ডকে শ্বাসনালী বিস্তৃত।

উদাহরণ— সিম্‌ফেল্লা *(Symphella),* স্কুটিজেরেল্লা *(Scutigerella)* প্রভৃতি।

শ্রেণী— ইনসেক্টা (Insecta)

1. দেহ মস্তক, বক্ষ ও উদরে বিভক্ত।
2. মস্তক ছয়টি খণ্ডক ও বক্ষ তিনটি খণ্ডক যুক্ত হয়ে গঠিত।
3. মস্তকে এক জোড়া অ্যান্টেনি, এক জোড়া ম্যান্ডিবল্, এবং দুই জোড়া ম্যাক্সিলা থাকে।
4. দ্বিতীয় জোড়া ম্যাক্সিলা-লোবিয়াম গঠন করে।
5. বক্ষ অঞ্চলে তিন জোড়া হাঁটবার পা থাকে।
6. উদর খণ্ডে কোন উপাঙ্গ থাকে না।
7. খাদ্যনালীর পশ্চাৎ অংশ থেকে ম্যালিপিজিয়ান নালী বাহির হয় যা রেচনে সাহায্য করে।
8. ট্রাকিয়াল তন্ত্র এবং প্রত্যেক খণ্ডে স্পাইরাক্‌ল্ থাকে।
9. সরাসরি বা রূপান্তরের মাধ্যমে বৃদ্ধি হতে পারে।

উপশ্রেণী—ডাইপ্লুরা (Diplura)

1. উদর 11টি খণ্ড যুক্ত।
2. শুঙ্গ খণ্ডক যুক্ত।
3. সারসি বর্তমান।
4. ম্যালপিজিয়ান নালিকা লুপ্তপ্রায় অথবা থাকে না।
5. প্রাথমিক ভাবে ডানা বিহীন।

উদাহরণ— ক্যাম্পোডিয়া *(Campodea),* জাপিক্স *(Japyx)* ইত্যাদি।

উপশ্রেণী—প্রোটুরা (Pratura)

1. ক্ষুদ্রাকৃতি পাখনাবিহীন প্রাণী।
2. এক বা একাধিক যুগ্ম উদর উপাঙ্গা বর্তমান।
3. কোন শুঙ্গা থাকে না।
4. মুখ উপাঙ্গা ছেদন কাজের জন্য (piercing) পরিবর্তিত।
5. উদরে এগারোটি খণ্ডক থাকে।
6. টেলসন থাকে।
7. লুপ্তপ্রায় ম্যালপিজিয়াম নালিকা থাকে।
8. রূপান্তর দেখা যায় না।

উদাহরণ— অ্যাসেরেনটোমোন *(Acerentomon)*।

উপশ্রেণী—কোলেমবোলা (Collembola)

1. উদর ছয় খণ্ডক যুক্ত, যার তিন খণ্ডকে উপাঙ্গা থাকে।
2. ম্যালপিজিয়ান নালিকা থাকে না।
3. অনেক প্রাণীতে শ্বাসনালী থাকে না।
4. প্রাথমিকভাবে ডানা বিহীন।
5. রূপান্তর দেখা যায় না।
   উদাহরণ পোড্যুরা *(Podura)*, স্মিন্থিউরাস *(Sminthuras)* প্রভৃতি।

উপশ্রেণী—আটেরিগোটা (Apterygota)

1. পূর্ণাঙ্গা প্রাণী ডানা বিহীন।
2. এক বা একাধিক জোড়া উপাঙ্গা থাকে।
3. শুঙ্গা বহুখণ্ডক যুক্ত।
4. ম্যান্ডিলা সাধারণত একটিমাত্র স্থানে সংলগ্ন থাকে।
5. উদরে জননছিদ্রের পূর্ব্বের খণ্ডকগুলিতে উপাঙ্গা থাকে।
6. রূপান্তর ঘটে না।
   উদাহরণ—লেপিস্‌মা *(Lepisma)*, পেট্রোবিয়াস *(Petrobius)* প্রভৃতি।

উপশ্রেণী—টেরিগোটা (Pterygota)

1. পূর্ণাঙ্গা প্রাণীরা সাধারণত ডানাযুক্ত।
2. ম্যান্ডিবল দুইটি স্থানে সংলগ্ন থাকে।
3. পূর্ণাঙ্গা প্রাণীতে উদরে জননছিদ্রের পূর্বের খণ্ডকগুলিতে উপাঙ্গা থাকে না।

4. ম্যালপিজিয়ান নালিকা থাকে।
5. জীবনচক্রে রূপান্তর দেখা যায়।

উদাহরণ— আরশোলা (Periplaneta), মাছি (Musca), মশা (Mosquito) প্রভৃতি।

1.4.3 আর্থ্রোপোডার বিবর্তন ধারা (Phylogency of Arthropoda)

পূর্বে আর্থ্রোপোডার প্রাণীগুলিকে দুইটি উপপর্বে ভাগ করা হতো, যথা—চেলিসেরাটা ও ম্যান্ডিবুলেটা। কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন বিজ্ঞানী (Manton, 1973; Anderson, 1973; Willmer, 1990) মনে করেন যে ঐ শ্রেণীবিণ্যাসে আথ্রোপোডা পর্বের প্রাণীদের সঠিক বিবর্তন ইতিহাস প্রতিফলিত হয় না। তাঁদের মতে এই পর্বের প্রাণীদের বিবর্তন ধারা বহুগোষ্ঠী ভিত্তিক (Polyphylatic) এবং অন্তত চারটি বিবর্তন ধারা লক্ষ্য করা যায়। যথা—ট্রাইলোবিটা, চেলিসেরাটা, ক্রাস্টেসিয়া এবং ইউনির‍্যামিয়া। Willmer (1990) এর মতে আদি চ্যাপ্টা কৃমি জাতীয় প্রাণী থেকে আর্থোপোডার বিভিন্ন প্রাণীদের উৎপত্তি হয়েছে।

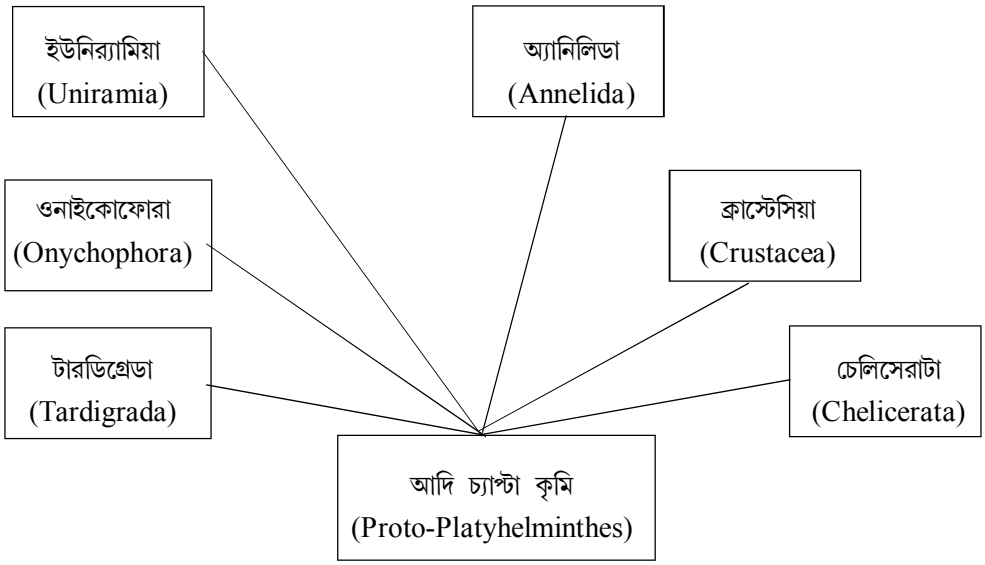

আর্থ্রোপোডার বিবর্তন ধারা

[Willmer (1990) এর Invertebrate Relationship নামক পুস্তক থেকে গৃহীত]

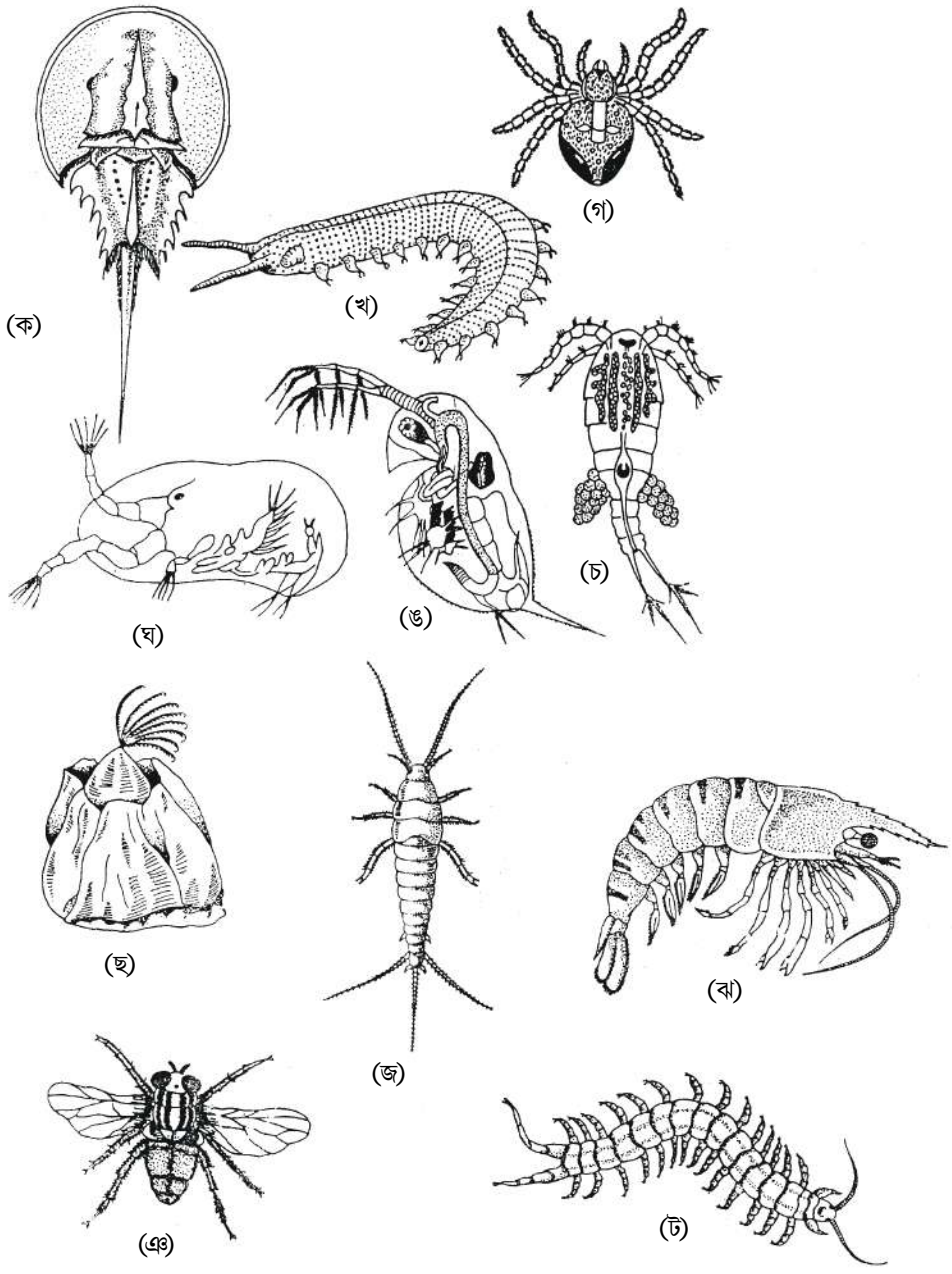

চিত্র 1.4 : আর্থ্রোপোডা পর্বের কয়েকটি প্রাণী (ক) লিমুলাস (খ) পেরিপেটাস (গ) মাকড়সা (ঘ) সাইপ্রিস (ঙ) ডাফ্নিয়া (চ) সাইক্লপস্ (ছ) বালানাস (জ) লেপিস্মা (ঝ) চিংড়ি (ঞ) মাছি (ট) তেঁতুলে বিছা

1.5 পর্ব : মোলাস্কার শ্রেণীবিন্যাস (Mollusca: L. molluscus, Soft)

1.5.1 শ্রেণীবিন্যাসের ছক

মোলাস্কা পর্বে প্রায় এক লক্ষ জীবিত প্রজাতি বর্তমান। পৃথিবীর জলে, স্থলে সর্বত্রই এদের অবস্থান। সংখ্যার নিরীক্ষে প্রাণিজগতে আর্থোপোডা পর্বের প্রাণিদের পরেই এদের স্থান।
মোলাস্কা পর্বের শ্রেণীবিন্যাসের ছক—

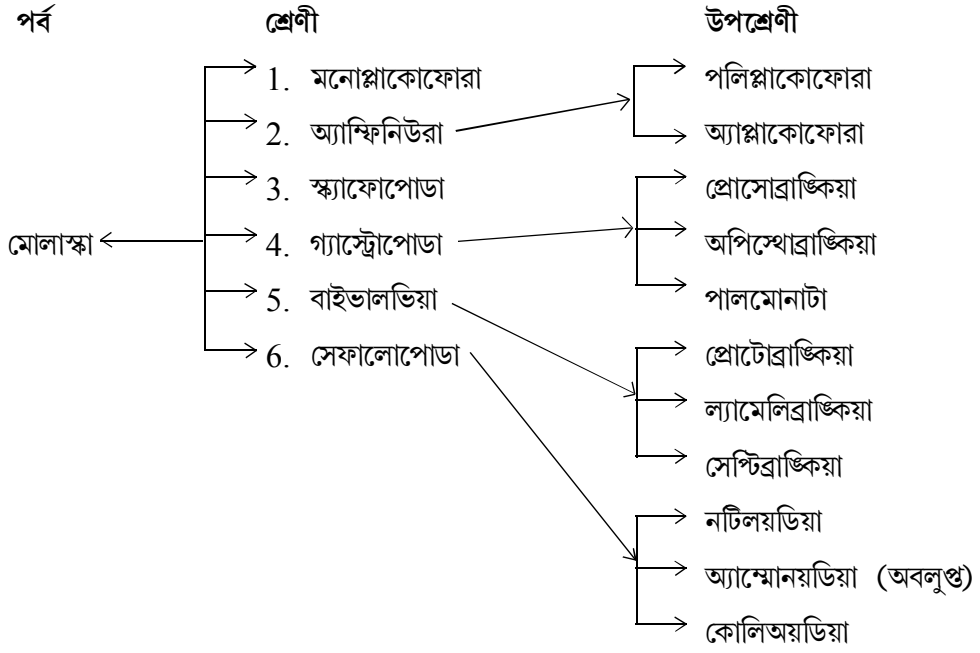

1.5.2 মোলাস্কার শ্রেণিবিন্যাসকরণ বৈশিষ্ট্য

1. ত্রিভ্রূণস্তরযুক্ত, কোমল ও খণ্ডকবিহীন প্রাণী (মনোপ্লাকোফোরা ব্যতীত)।
2. দেহ দ্বিপার্শ্বীয়ভাবে প্রতিসম (গ্যাস্ট্রোপোডা ব্যতীত)।
3. দেহে মাথা, আন্তরপিণ্ড, পা ও ম্যান্টেল নামক অংশ থাকে।
4. ক্যালসিয়াম কার্বনেট-এর খোলক দ্বারা দেহ আবৃত থাকে। খোলকটি বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীন হতে পারে।
5. অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেহের অঙ্কদেশে পেশীময় পদ থাকে।
6. ম্যান্টেল নামক পর্দা দ্বারা দেহটি ঢাকা থাকে।

7. শ্বসন অঙ্গ ফুলকা, টিনিডিয়াম বা ফুসফুস থলি।
8. রেচন অঙ্গের নাম বৃক্ক বা বোজেনাসের অঙ্গ (organ of Bojanus)।
9. মুখগহ্বরে র‍্যাডুলা থাকে।
10. একলিঙ্গ বা উভলিঙ্গ। বহিঃনিষেক সম্পন্ন হয়।
11. জীবনচক্রে ভেলিজার (Veliger) লার্ভা দশা দেখা যায়।

শ্রেণী- 1 : মনোপ্লাকোফোরা (Monoplacophora)

1. দেহ ডিম্বাকার বা গোলাকার, দ্বিপার্শ্বীয়ভাবে প্রতিসম।
2. দেহের বিভিন্ন অঙ্গগুলি অন্তরখণ্ডকে সাজানো থাকে।
3. একমাত্র মনোপ্লাকোফোরা শ্রেণীর মোলাস্কাদের এই খণ্ডীভবন দেখা যায়।
4. দেহের পৃষ্ঠদেশে ম্যান্টে থাকে।
5. ম্যান্টেলের উপরিভাগে একটি শক্ত খোলক থাকে।
6. শরীরের অঙ্কীয় ভাগ চ্যাপ্টা ও পেশীময় পদ থাকে।
7. রেচন অঙ্গ নেফ্রিডিয়া। ফুলকা, অলিন্দ ও নেফ্রিডিয়া একাধিক জোড়ায় অবস্থিত এবং দেহখণ্ডক অনুযায়ী সাজানো।
   উদাহরণ—নিওপাইলিনা *(Neopilina sp.)*।

শ্রেণী- 2 : অ্যাম্ফিনিউরা (Amphineura)

1. দেহ দ্বিপার্শ্বীয়ভাবে প্রতিসম এবং লম্বাটে।
2. চক্ষু ও কর্ষিকাবিহীন মস্তকটি অস্পষ্ট।
3. অঙ্কীয় দেহতলে চ্যাপ্টা বড় পদ থাকে। পদটি কোন কোন ক্ষেত্রে ছোট অথবা না থাকতেও পারে।
4. শ্বাস অঙ্গ ফুলকা।
5. স্নায়ুতন্ত্র অনুন্নত।

উপশ্রেণী—পলিপ্ল্যাকোফোরা (Polyplacophora)

1. উপর নিচে দেহটি চাপা।
2. সমগ্র অঙ্কীয়তল বরাবর বড়, চ্যাপ্টা পদ থাকে।
3. পৃষ্ঠদেশে আটটি খণ্ডকযুক্ত খোলক থাকে।
4. অঙ্কদেশে অসংখ্য যুগ্ম ফুলকা থাকে।
   উদাহরণ—কাইটন *(Chiton),* নুটালোকাইটিন *(Nuttalochiton)* প্রভৃতি।

উপশ্রেণী—আপ্লাকোফোরা (Aplacophora)

1. দেহ সরু ও লম্বা।
2. পদ খুবই ছোট অথবা অনুপস্থিত।
3. খোলক অনুপস্থিত, ম্যান্টেলে অসংখ্য ক্যালসিয়াম নির্মিত স্পিকিউল থাকে।
4. অবসারণী প্রকোষ্ঠ বা ভাঁজে অবস্থিত ফুলকা বা টিনডিয়া দিয়ে শ্বাসকার্য করে।
   উদাহরণ ঃ- নিওমেনিয়া *(Neomenia),* কিটোডার্মা *(Chaetoderma)* প্রভৃতি।

শ্রেণী- 3 : স্ক্যাফোপোডা (Scaphopoda)

1. দেহ লম্বাটে (মূলতঃ 2-5 সেমি. দীর্ঘ), নলাকার, দ্বিপার্শ্বীয়ভাবে প্রতিসম। খোলকের আকার হাতির দাঁতের মত।
2. সামুদ্রিক কাদা বালির মধ্যে বাস করে।
3. দেহ খোলকটি নলাকার এবং উভয় প্রান্ত খোলা, অগ্রভাগ চওড়া।
4. পদটি ত্রিকোণাকৃতি।
5. মুখছিদ্রটি প্রোবোসিসের উপর থাকে।
6. এরা একলিঙ্গা প্রাণী।
   উদাহরণ— অ্যান্টালিস *(Antalis),* ডেন্টালিয়াম *(Dentalium)* প্রভৃতি।

শ্রেণী- 4 : গ্যাস্ট্রোপোডা (Gastropoda)

1. টরসনের ফলে আন্তর যন্ত্রগুলি প্যাঁচানো এবং দেহ অসম।
2. লার্ভা দশায় এদের দেহ 180^0 পেঁচিয়ে যায়, একে টরসন বলে।
3. মস্তক উন্নত এবং কর্ষিকা ও চোখ থাকে।
4. দেহের অঙ্কীয় তলে চওড়া পেশীযুক্ত পদ থাকে।
5. দেহ একটি প্যাঁচানো খোলকে আবৃত অথবা নাও আবৃত হতে পারে।
6. মুখ গহ্বরে র‍্যাডুলা (Radula) থাকে।

উপশ্রেণী—প্রোসোব্রাঙ্কিয়া (Prosobranchia)

1. হৃৎপিণ্ডের অগ্রপ্রান্তে দুইটি ফুলকা থাকে।
2. টরসনের (torsion) ফলে মুখছিদ্র ও পায়ুছিদ্র দেহের একই দিকে থাকে এবং স্নায়ুতন্ত্র পেঁচিয়ে '8' এর মত হয়।
3. দেহ খোলক দ্বারা আবৃত এবং খোলকের ঢাকনি (opeculum) থাকে।
4. মস্তকে একজোড়া কর্ষিকা থাকে।
5. একলিঙ্গা প্রাণী এবং জননগ্রন্থি দেহের ডানদিকে উন্মুক্ত হয়।
6. জীবনচক্রে ট্রোকোফোর এবং ভেলিজার লার্ভা দশা দেখা যায়। উদাহরণ—পাইলা *(Pila),* প্যাটেলা *(Patella),* মরেক্স *(Murex)* প্রভৃতি।

উপশ্রেণী—অপিস্থোব্রাঙ্কিয়া (Opisthobranchia)

1. টরসনের পাক খুলে ডিটরসন (detorsion) ঘটে।
2. খোলক লুপ্ত প্রায় অথবা অনুপস্থিত, অপারকুলাম থাকে না।
3. মস্তকে দুই জোড়া কর্ষিকা থাকে।
4. শ্বসন অঙ্গ গৌণ ফুলকা, টিনিডিয়া অনুপস্থিত।
5. উভলিঙ্গা প্রাণী। জীবনচক্রে ভেলিজার লার্ভা দশা দেখা যায়।
   উদাহরণ—ডোরিস *(Doris),* অ্যাপ্লাইসিয়া *(Aplysia)* ইত্যাদি।

উপশ্রেণী—পালমোনাটা (Pulmonata)

1. ফুসফুস থলি শ্বাসকার্যে সাহায্য করে, ফুলকা থাকে না।
2. টরসন ঘটে এবং দেহ খোলকটি প্যাঁচানো। কোন কোন ক্ষেত্রে দেহ খোলক অনুপস্থিত।
3. মস্তকে এক অথবা দুই জোড়া কর্ষিকা এবং একজোড়া চোখ দেখা যায়।
4. উভলিঙ্গা প্রাণী, লার্ভা দশা থাকে না।
5. স্বাদু জলে অথবা স্থলে বাস করে।
   উদাহরণ—হেলিক্স *(Helix),* অ্যাকাটিনা *(Achatina)* প্রভৃতি।

শ্রেণী- 5 : বাইভালভিয়া (Bivalvia)

1. বেশীর ভাগ প্রাণিই সমুদ্রে অথবা স্বাদু জলে বালিতে বা কাদায় বাস করে।
2. দেহ দ্বিপার্শ্বীয়ভাবে প্রতিসম এবং পাশাপাশি চ্যাপ্টা।
3. টরসন ঘটে না।
4. ম্যান্টেল দ্বারা দেহ আবৃত।
5. মস্তক লুপ্ত প্রায়, চোখ ও কর্ষিকা থাকে না।
6. মুখের উভয় দিকে একজোড়া লেবিয়াল পাল্প থাকে, র‍্যাডুলা নেই।
7. খোলক দুইখণ্ড যুক্ত এবং পৃষ্ঠদেশে কব্জার ন্যায় যুক্ত।
8. পেশীময় লাঙ্গালের ফলার মত পদ দেখা যায়।
9. শ্বসন অঙ্গের নাম ফুলকা।
10. একলিঙ্গা প্রাণী।
11. জীবনচক্রে ট্রোকোফোর এবং ভেলিজার লার্ভা দেখা যায়।

উপশ্রেণী—প্রোটোব্র্যাঙ্কিয়া (Protobranchia)

1. পা চ্যাপ্টা এবং পায়ের প্রান্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত।
2. ফুলকা একজোড়া এবং পালকের মত।
3. অগ্র এবং পশ্চাদ উভয় ধরনের অ্যাডাক্টার (adductor) পেশী থাকে।
4. লেবিয়াল পাল্পের সাহায্যে খাদ্য গ্রহণ করে।

উদাহরণ—সোলেমায়া *(Solemya),* নুকিউলা *(Nucula)* প্রভৃতি।

উপশ্রেণী—ল্যামেলিব্রাঙ্কিয়া (Lamellibranchia)

1. পদ চ্যাপ্টা কিন্তু খণ্ডকে বিভক্ত নয়।
2. 'W' আকৃতির ফুলকা এবং আকারে বড়।
3. খাদ্য গ্রহণে ফুলকার সিলিয়া সাহায্য করে।
4. অগ্র ও পশ্চাদ অ্যাডাক্টার পেশীদ্বয় সমান অথবা অসমান হতে পারে। কখনও কখনও অগ্র অ্যাডাক্টার পেশী থাকে না।
   উদাহরণ—ল্যামেলিডেন্স্ বা ঝিনুক *(Lamallidens)* মাইটিলাস *(Mytilus),* টেরিডো *(Teredo)* প্রভৃতি।

উপশ্রেণী—সেপ্টিব্রাঙ্কিয়া (Subclass : Septibranchia)

1. ফুলকা পেশীময় ব্যবধায়ক পর্দায় (Septum) রূপান্তরিত এবং পাম্প করে ম্যান্টেল গহবরের জল বের করে।
2. অ্যাডাক্টর পেশীগুলি সমান।
3. ম্যান্টেলের প্রান্তদেশ স্বাধীন।
4. খোলকের কব্জা সামান্য দাঁতের মত খাঁজযুক্ত।
   উদাহরণ— পোরোমিয়া *(Poromya),* কাস্পিডারিয়া *(Cuspidaria)* প্রভৃতি।

শ্রেণী - 6 : সেফালোপোডা (Class : Cephalopoda)

1. মস্তক উন্নত।
2. মস্তকে একজোড়া চক্ষু ও কয়েকজোড়া কর্ষিকা থাকে।
3. স্নায়ুতন্ত্র ও জ্ঞানেন্দ্রিয় উন্নত।
4. প্রায় সবক্ষেত্রে খোলক থাকে এবং দেহের ভিতর অবস্থিত। অক্টোপাস জাতীয় প্রাণীতে খোলক অনুপস্থিত।
5. দেহ দ্বিপার্শ্বীয়ভাবে প্রতিসম।
6. টরসন ঘটেনা।
7. র‍্যাডুলা থাকে।
8. জীবনচক্রে লার্ভা দশা অনুপস্থিত।
9. একলিঙ্গা প্রাণী।

উপশ্রেণী—নটিলয়ডিয়া (Nautiloidea)

1. দেহ খোলক দ্বারা দেহ আবৃত, প্রকোষ্ঠযুক্ত, প্যাঁচানো অথবা সোজা হয়।
2. মাথার চারপাশে চোষকবিহীন অসংখ্য কর্ষিকা থাকে।
3. শরীরে দুই জোড়া ফুলকা, দুই জোড়া বৃক্ক এবং দুই জোড়া অলিন্দ থাকে।
4. চক্ষু উন্মুক্ত থলির মত, চোখে কর্ণিয়া এবং লেন্স অনুপস্থিত।
   উদাহরণ— নটিলাস *(Nautilus)* ।

উপশ্রেণী—কোলিঅয়ডিয়া (Coleoidea)

1. খোলক দেহের অভ্যন্তরে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে খোলক থাকে না।
2. মস্তকে আটটি চোষকযুক্ত কর্ষিকা এবং দুইটি বৃহৎ আকৃতির কর্ষিকা থাকে।
3. দেহে একজোড়া ফুলকা, একজোড়া বৃক্ক এবং একজোড়া অলিন্দ থাকে।
4. ম্যান্টেল উন্মুক্ত এবং দেহকে ঢেকে রাখে।
5. চক্ষুতে লেন্স থাকে।
6. নালিযুক্ত কালি গ্রন্থি (Ink gland) থাকে।

উদাহরণঃ— সেপিয়া *(Sepia),* ললিগো *(Loligo)* এবং অক্টোপাস *(Octopus)*।

উপশ্রেণী—অ্যাম্মোনয়ডিয়া (Ammonoidea)

1. এই উপশ্রেণীভুক্ত প্রাণীরা সকলেই বিলুপ্ত। প্যাঁচানো খোলক দ্বারা দেহ ঢাকা থাকে। উদাহরণ—অ্যামোনাইট *(Ammonite),* ইডোসেরাস *(Idoceras)*।

1.5.3 মোলাস্কা পর্বের বিবর্তন ধারা (Phylogeny of Mollusca)

ভ্রূণগত সাদৃশ্যের ভিত্তিতে মোলাস্কা পর্বের প্রাণীরা যে পলিকিটা শ্রেণীর অ্যানেলিডা পর্বের প্রাণী থেকে উৎপত্তি ঘটেছিল তা বহুল স্বীকৃত। কিন্তু বর্তমানে অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন যে মোলাস্কা ও অ্যান্নলিডা উভয় পর্বের প্রাণীরাই চ্যাপ্টাকৃমি জাতীয় পূর্বপুরুষ থেকে সৃষ্টি হয়েছিল। মনোপ্লাকোফোরা প্রাণীদের দেহ খণ্ডকযুক্ত। তাই অনেকে মনে করেন যে এই মোলাস্কা পর্বের প্রাণীরাই অ্যানিলিডা প্রাণীদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং আদি মনোপ্লাকোফোরা জাতীয় প্রাণীদের থেকেই অন্যান্য মোলাস্কা প্রাণীদের উদ্ভব ঘটেছে।

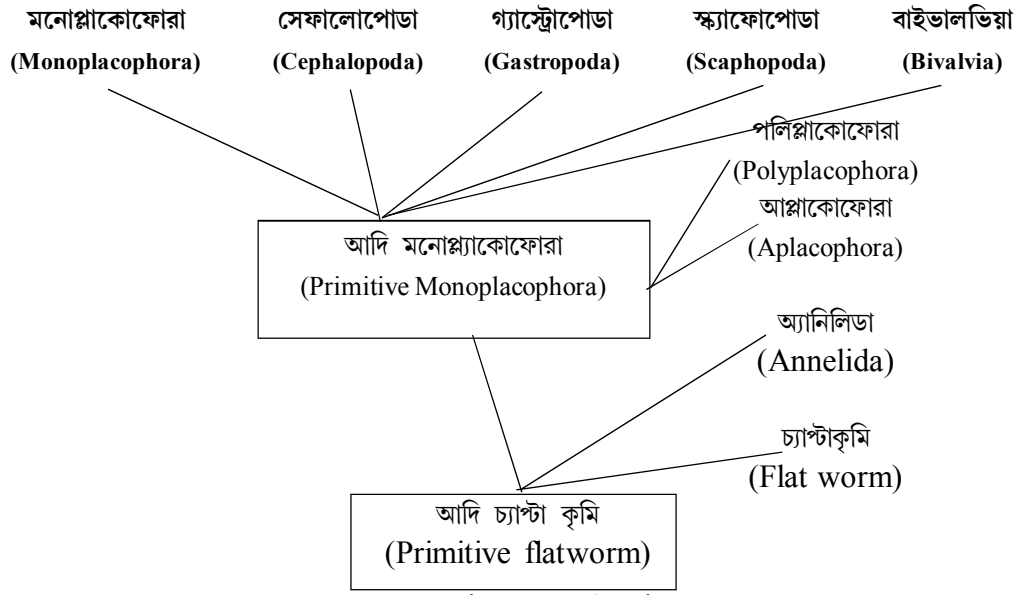

মোলাস্কা পর্বের সম্ভাব্য বিবর্তন ধারা
(Runneger ও Pogeta, 1974 এর মতবাদ অনুসারে)

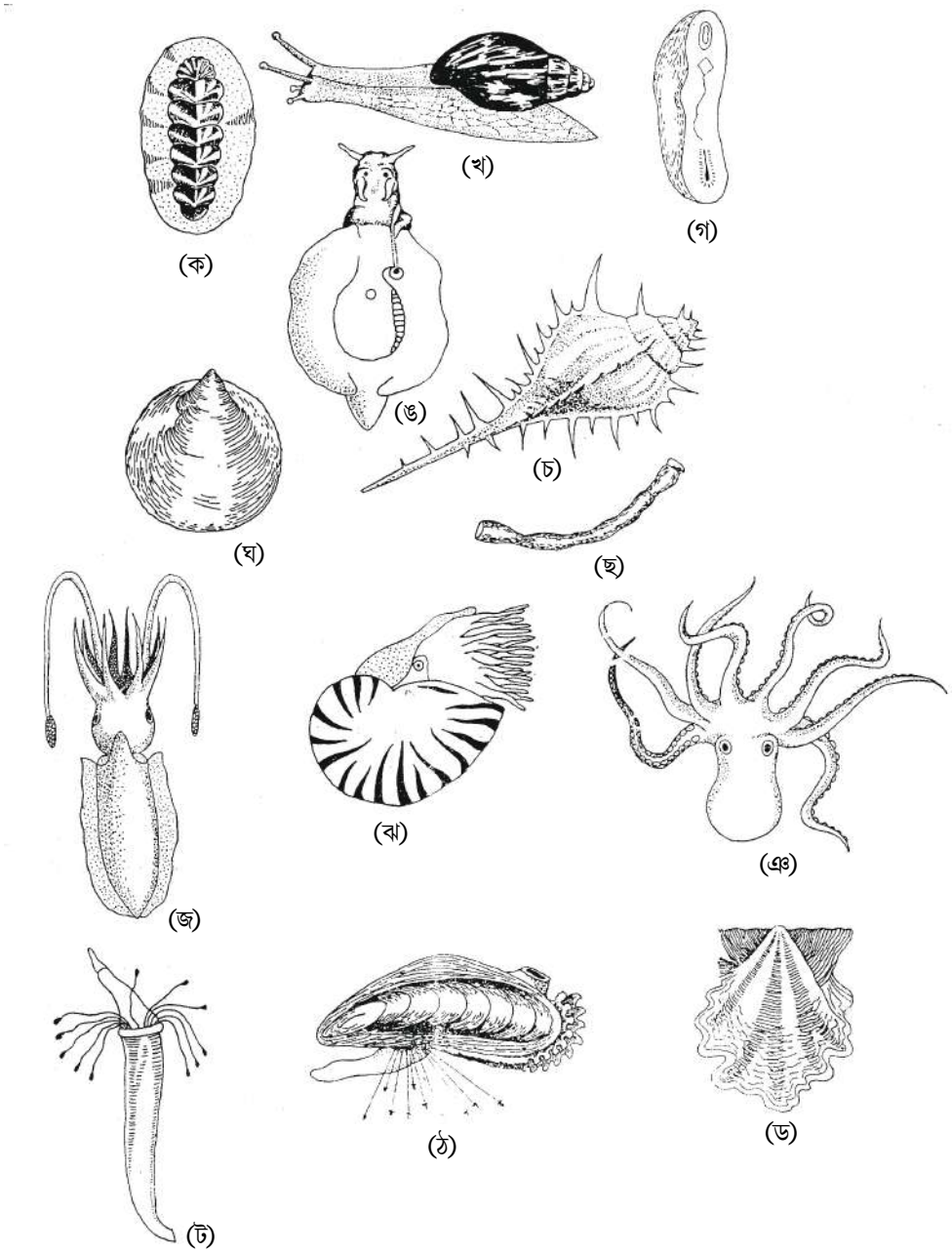

চিত্র 1.5 : কয়েকটি মোলাস্কা পর্বের প্রাণী (ক) কাইটন (খ) অ্যাকাটিনা (গ) নিওমোনিয়া (ঘ) নিওপিলিন (ঙ) অ্যাপ্লাইসিয়া (চ) মিউরেক্স (ছ) কিটোডার্মা (জ) সেপিয়া (ঝ) নটিলাস (ঞ) অক্টোপাস (ট) ডেন্টালিয়াম (ঠ) মাইটিলাস (ড) পিঙ্কটাডা।

1.6 পর্ব : একাইনোডার্মাটার শ্রেণীবিন্যাস (Echinodermata : GK. echinos=spine; derma=skin)

1.6.1 শ্রেণীবিন্যাসের ছক

এই পর্বের প্রজাতির সংখ্যা প্রায় 6000 (ছয় হাজার)। এদের দেহত্বক কন্টকময়। এই পর্বের সমস্ত প্রাণীই সামুদ্রিক। এরা সাধারণত সমুদ্রের তলদেশে বাস করে। ক্যাম্‌ব্রিয়ান যুগের প্রারম্ভে এদের উদ্ভব হয়েছিল। এখানে একাইনোডার্মাটা পর্বের শ্রেণীবিণ্যাস Parker ও Haswell প্রণীত এবং Marshall ও Williams কর্তক সম্পাদিত (1972) শ্রেণীবিন্যাস অনুসরণ করা হ'ল—

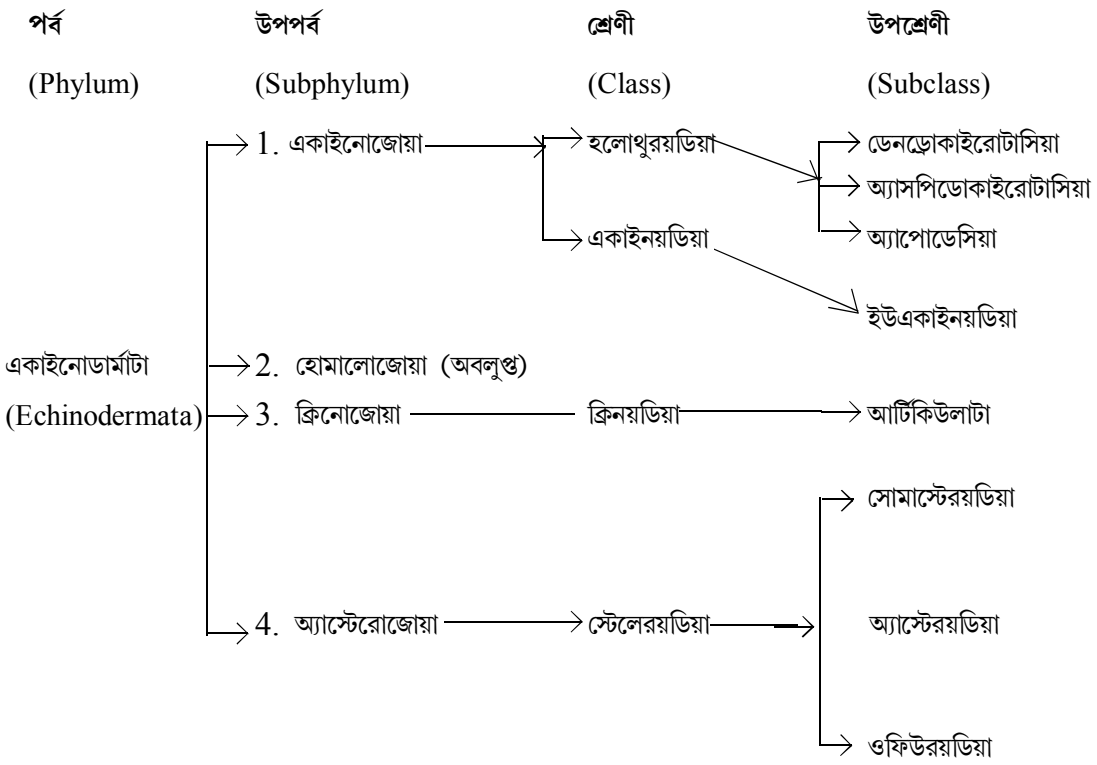

1.6.2 একাইনোডার্মাটার শ্রেণীবিন্যাসকরণ বৈশিষ্ট্য

পর্ব : একাইনোডার্মাটা (Echinodermata)

1. দেহ অরীয়ভাবে (Radially) প্রতিসম এবং পাঁচ অংশযুক্ত। লার্ভার দেহ দ্বিপার্শ্বীয়ভাবে প্রতিসম।
2. দেহের অন্তঃকঙ্কাল ক্যালসিয়াম কার্বনেট দ্বারা গঠিত।
3. বহিঃস্তক কন্টকযুক্ত।
4. সিলোম বা দেহগহ্বর যুক্ত প্রাণী।
5. দেহে জল সংবহনতন্ত্র দেখা যায়।
6. টিউব ফুট (Tube foot) বা নালী পদ চলনে, খাদ্য গ্রহণে, শ্বসনে সাহায্য করে।
7. একলিঙ্গা প্রাণী (বেশীরভাগই)।
8. বহিঃনিষেক ঘটে।
9. জীবনচক্রে লার্ভা দশা দেখা যায়।

উপপর্ব - 1 : একাইনোজোয়া (Echinozoa)

1. দেহ অরীয়ভাবে প্রতিসম।
2. দেহ গোলাকার বা চাকতির মতো।
3. দেহে কোন বাহু থাকে না।
4. হাইড্রোসিল রিং-এর আকারে মুখছিদ্রকে বেষ্টন করে থাকে।
5. মুখছিদ্র ও পায়ুছিদ্র দেহের বিপরীত দিকে থাকে।

শ্রেণী—হলোথুরয়ডিয়া (Holothuroidea)

1. দেহ লম্বাটে শশাকৃতির।
2. অন্তঃকঙ্কাল আনুবীক্ষনিক অসিক্‌লে পরিবর্তিত হয়।
3. দেহের বিপরীত প্রান্তে মুখছিদ্র ও পায়ুছিদ্র অবস্থিত।
4. মুখছিদ্র সঙ্কোচনশীল কর্ষিকা আবৃত।
5. অবসারণীর সঙ্গে শ্বসন বৃক্ষ নামক শ্বসন অঙ্গ যুক্ত।

উপশ্রেণী—ডেনড্রোকাইরোটাসিয়া (Dendrochirotacea)

1. অসিকলের একটি চক্রাকার রিং গ্রাসনালীকে বেষ্টন করে থাকে।
2. গলবিলে রিট্রাক্টর (retractor) পেশী থাকে।
3. শ্বসন বৃক্ষ (respiratory tree) নামক শ্বসন অঙ্গ বর্তমান।
   উদাহরণ—সমুদ্র শশা *(Cucumaria),* প্লাকোথুরিয়া *(Placothuria)* ইত্যাদি।

উপশ্রেণী—অ্যাসপিডোকাইরোটাসিয়াঃ (Aspidochirotacea)

1. বর্মের আকারের 10-30 টি কর্ষিকা থাকে।
2. গলবিলে রিট্রাক্টর পেশী থাকে না।
3. অন্তঃকঙ্কাল স্পিটিকিউলে পরিণত এবং ত্বকের উপর বিস্তৃত।
4. অঙ্কীয়দেশের নালী পদ (Tube foot) চলন অঙ্গ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
5. পৃষ্ট দেশের নালীপদ সংবেদন অঙ্গে পরিণত হয়।

উদাহরণঃ স্টাইকোপাস *(Stichopus),* এলপিডিয়া *(Elpidia)* প্রভৃতি।

উপশ্রেণী-অ্যাপোডাসিয়া (Apodacea) :

1. কর্ষিকা সরল অথবা অঙ্গুলাকৃতির।
2. গলবিলে রিট্রাক্টর পেশী নেই।
3. নালিপদ হ্রাসপ্রাপ্ত বা অবলুপ্ত।
4. অন্তঃকঙ্কাল স্পিকিউলে পরিণত এবং ত্বকে ছড়ানো থাকে।

উদাহরণ—ম্যালপোডিয়া *(Malpodia),* লেপ্টোসাইন্যাপ্টা *(Leptosynapta)* প্রভৃতি।

শ্রেণী : একাইনয়ডিয়া (Echinoidea)

1. দেহ ডিম্বাকৃতি, গোলাকার বা উপর-নীচে চাপা।
2. দেহে কোন বাহু থাকে না।
3. দেহ সঞ্চারণশীল ও শক্ত কণ্টক দ্বারা আবৃত।
4. কাঁটাগুলি আত্মরক্ষায় ও চলনে সহায়তা করে।
5. কঙ্কালের অসিক্‌ল্‌গুলি টেস্ট (test) নামক আবরণ গঠন করে।
6. নালীপদ মধ্যরেখায় *(meridionally)* সজ্জিত এবং চোষকযুক্ত।

উপশ্রেণী—ইউএকাইনয়ডিয়া (Euechinoidea)

1. দেহের টেস্টটি কঠিন অথবা নমনীয়।
2. কাঁটাগুলি ফাঁপা অথবা কঠিন।
3. কোন কোন ক্ষেত্রে পায়ু পশ্চাদ্ দিকে সরে যাওয়ার দ্বিপার্শ্বীয়ভাবে প্রতিসাম্য লক্ষ্য করা যায়।

উদাহরণ—একিনাস *(Echinus),* একাইনোকার্ডিয়াম *(Echinocardium)* প্রভৃতি।

উপপর্ব - 2 : হোমালোজোয়া (অবলুপ্ত)

উপপর্ব - 3 : ক্রিনোজোয়া (Crinozoa)

1. দেহ গোলাকার ; দেহ অরীয়ভাবে প্রতিসম।
2. পেয়ালার মত অ্যাবোরাল (aboral) অংশকে ক্যালিক্স বলে।
4. মুখ তল উর্দ্ধদিকে অবস্থিত।
5. দেহে বাহু থাকে।

শ্রেণী—ক্রিনয়ডিয়া

1. দেহে সাধারণত লম্বা বৃন্ত থাকে ; কিছু কিছু ক্ষেত্রে থাকে না।
2. ক্যালিক্সের প্রান্তে পাঁচটি সঞ্চরণশীল বাহু থাকে।
3. মুখছিদ্র ও পায়ুছিদ্র উভয়েই উপরের দিকে অবস্থিত।
4. বাহুগুলি এক বা একাধিক শাখায় বিভক্ত হতে পারে।
5. প্রতিটি বাহুর খোঁজের ধারে কর্ষিকার মত নালিপদ থাকে।

উপশ্রেণী—আর্টিকিউলাটা (Articulata)

1. অগভীর স্বচ্ছ জলে বাস করে।
2. বাহু সাধারণত শাখাযুক্ত ও সঞ্চরণশীল পিনিউল যুক্ত।
3. দেহ সাধারণভাবে বৃন্ত যুক্ত। অনেক সময় পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় বৃন্ত থাকে না।
   উদাহরণ— সী লিলি *(Antedon),* মেটাক্রাইনাস *(Metacrinus)* প্রভৃতি।

উপপর্ব-4 : অ্যাস্টেরোজোয়া (Asterozoa)

1. দেহ অরীয়ভাবে প্রতিসম এবং উপর-নিচে চাপাস তারার মত এবং পাঁচটি বাহু যুক্ত।
2. স্বাধীনজীবী।
3. সিলোম বাহুতে প্রসারিত থাকে।

শ্রেণী : স্টেলেরয়ডিয়া (Stelleroidea)

1. অ্যাম্বুল্যাক্রাল খাঁজ মুক্ত এবং দেহের কেন্দ্রস্থল থেকে বাহু পর্যন্ত বিস্তৃত।

উপশ্রেণী—সোমাস্টেরয়ডিয়া (Somasteroidea)

1. দেহ চ্যাপ্টা এবং দেহের কেন্দ্রে ছোট চাকতির মত অংশ থাকে।
2. বাহুর কঙ্কালের অসিক্‌ল্‌গুলি পালকের মত বিন্যস্ত থাকে।
3. বাহুমূলগুলি কেন্দ্রীয় অংশে সঙ্কুচিত থাকে।
4. পৌষ্টিকতন্ত্র বন্ধ।
5. পায়ু নেই।
   উদাহরণ—চিনিয়ান্যাস্টার *(Chinianaster),* অ্যাম্পুলেস্টার *(Ampullester)* প্রভৃতি।

উপশ্রেণী—অ্যাস্টেয়ডিয়া (Asteroidea)

1. মুখতলে অ্যাম্বুল্যাক্রাল খাঁজ থাকে।
2. অ্যাম্বুলাক্রাল খাঁজের মধ্যে নালিপদ থাকে।
3. অ্যাব্‌ওরাল তলে ম্যাড্রিপোরাইট থাকে।
4. বাহুগুলি সংলগ্ন অংশ মোটা এবং প্রান্তের দিকে ক্রমশঃ সরু হয়।
   উদাহরণ—তারা মাছ *(Asterias),* অ্যাস্ট্রোস্টোল *(Astrostole)* প্রভৃতি।

উপশ্রেণী-ওফিউরয়ডিয়া (Ophiuroidea)

1. দেহের কেন্দ্রীয় অংশটি সুস্পষ্ট এবং চাকতির মত।
2. কেন্দ্রীয় অঞ্চল থেকে পাঁচটি চাবুকের মত বাহু নির্গত হয়।
3. নালীপদ চোষক বিহীন।
4. অ্যাম্বুল্যাক্রাল খাঁজ নেই।
5. ম্যাডিপোরাইট মুখতলে আছে।
6. পায়ুছিদ্র থাকে না।

উদাহরণ—ওফিউরা (ophiura), পোক্টিনিউরা (Pectinura) প্রভৃতি।

1.6.3 একাইনোডার্মাটা পর্বের বিবর্তন ধারা (Phylogeny of Echinodermata)

1973 খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী Jeffries হোমোলোজোয়া প্রাণীদের সবচেয়ে প্রাচীন একাইনোডার্মাটারূপে গণ্য করেন এবং এদের পর্ব ক্যালসিকর্ডাটা নামে অভিহিত করেন।

এই প্রাণীদের কর্ডাটা পর্বের প্রাণীদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বলে ধরা হয়। কিছু বিজ্ঞানী মনে করেন যে একাইনোজোয়া প্রাণীরা স্বাধীন সন্তরণশীল পূর্বপুরুষ থেকে উৎপন্ন হয়েছিল। একাইনোডার্মাটা প্রাণীদের পারস্পরিক সম্পর্ক প্রসঙ্গে Paul and Smith (1984)-এর মতবাদ অনুসৃত হল—

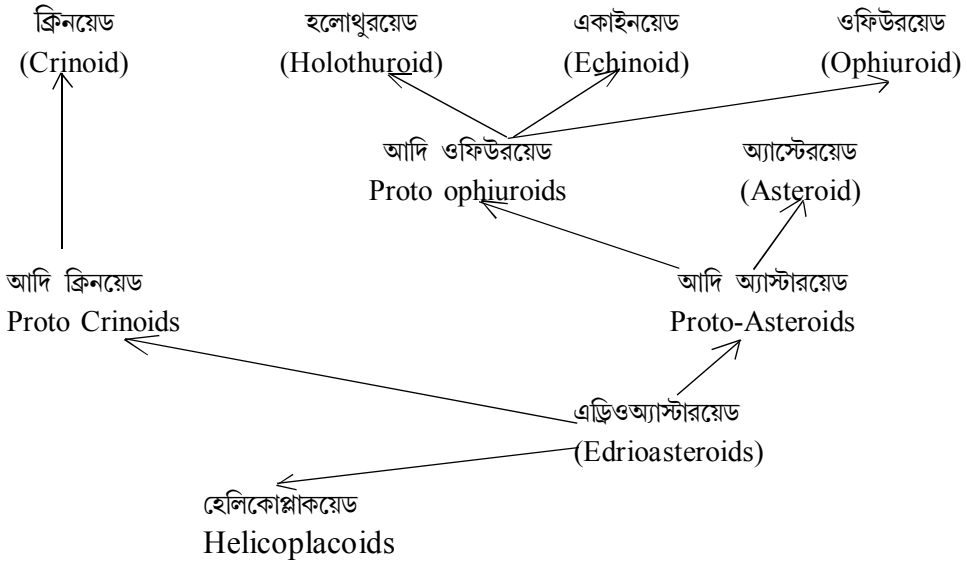

একাইনোডার্মাটা পর্বের বিবর্তন ধারা

[Paul এবং Smith (1984) —এর মতবাদ অনুযায়ী]

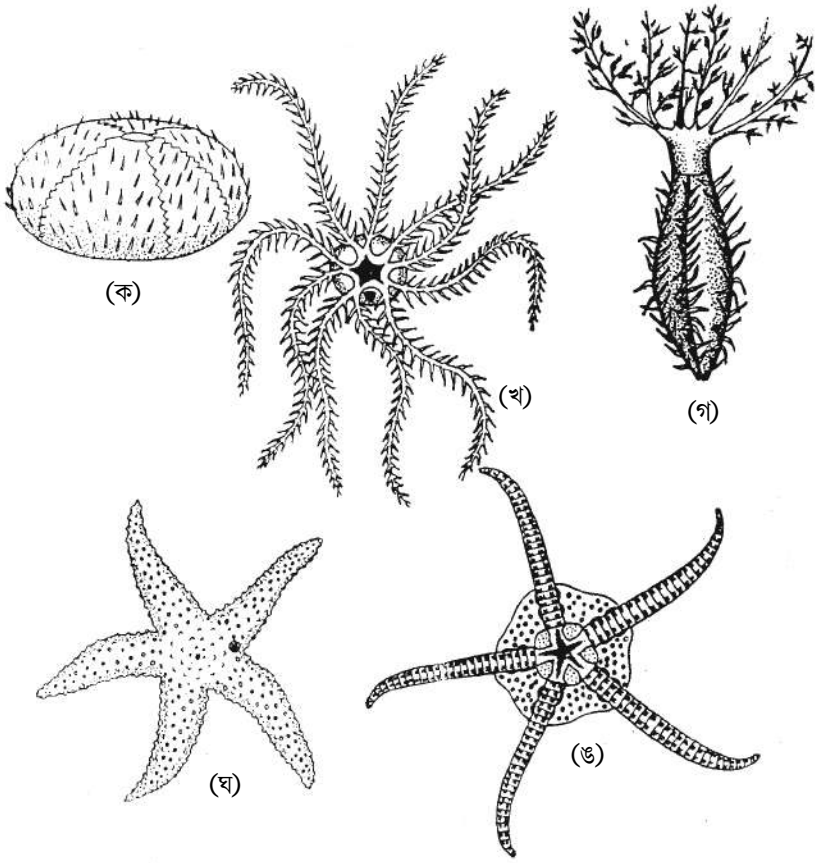

চিত্র 1.6 : একাইনোডার্মাটা পর্বের কয়েকটি প্রাণী
(ক) একিনাস (খ) আম্বেডন (গ) সমুদ্র শশা (ঘ) তারা মাছ (ঙ) অফিউরা।

1.7 অনুশীলনী

1. উপরাজ্য প্রোটোজোয়াকে কয়টি পর্ব ও উপপর্বে বিভাজন করা হয়েছে (লেভিনর শ্রেনীবিন্যাস আনুযায়ী) ? ও কি কি ?
2. উপপর্ব ও পালিনাটার উদাহরণ চারটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।
3. নিম্নলিখিত প্রানীগুলির কোন্ পর্বের আন্তর্ভূক্ত—
   মিক্সোবেলাস, নিকটোথেরাস, প্যারামিশ্রা।
4. সিলিওফোরা পর্বের উদাহরণসহ চারটি বৈশিষ্ট উল্লেখ করুন।
5. চকের সাহায্যে প্রোটোজোয়া পর্বের বিবর্তন ধারা লিপিবদ্ধ করুন।
6. শ্রেনী ক্যালকেরিয়ার চারটি বৈশিষ্ট লিখুন।

7. পর্ব অ্যানেলিডার বৈশিষ্টগুলি উল্লেখ করুন।
8. অ্যানেলয়া পর্বের বির্বতন ধারা সম্পর্কে লিখুন।
9. অষ্ট্রাকোডা উপশ্রেনীর বৈশিষ্ট্য ও উদাহরন দিন।
10. টেরিগোটা ও আটেরিওগোটা উপস্রেনীর প্রানীদের পার্থকে ও উদাহরণ দিন।
11. ছকের সাহায্যে Willmer(1990) নির্দেশিত পর্ব আথ্রোপোডার বিবর্তন ধারা বিবৃত করুন।
12. ছকের সাহায্যে মোলাস্কা পর্বের প্রানীদের উপশ্রেনীর আন্তঃত একটি উদাহরণ দিন।
13. শ্রেনী অ্যাম্ফিনিউরার চারটি বৈশিষ্টে উল্লেখ করুন।
14. উদাহরণসহ স্ক্যাফোপোডা শ্রেনীর বৈশিষ্ট লিখুন।
15. উদাহরণসহ পালমোনাটা উপশ্রেনীর বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করুন।
16. মোলাস্কা পর্বের বিবর্তন ধারা বিবৃত কর।
17. একাইনোডার্মাটা পর্বের বৈশিষ্টগেুলি উল্লেখ করন।
18. উদাহরণসহ ইউএকাইনয়ডিয়া উপশ্রেনীর বৈশিষ্ট্য লিখুন।
19. অ্যাস্টেয়য়ডিয়া উপশ্রেনী বৈশিষ্ট্যগুলি লিখুন এবং দুইটি-উদাহরণ দিন।
20. ছকের সাহায্যে একাইনোডার্মাটা পর্বের বিবর্তন ধারা বিকৃত করন।

1.8 উত্তরমালা

1. পৃষ্ঠা — 24
2. পৃষ্ঠা — 25
3. পৃষ্ঠা — 27
4. পৃষ্ঠা — 27
5. পৃষ্ঠা — 28
6. পৃষ্ঠা — 31
7. পৃষ্ঠা — 35
8. পৃষ্ঠা — 38
9. পৃষ্ঠা — 44
10. পৃষ্ঠা — 48-49
11. পৃষ্ঠা — 49
12. পৃষ্ঠা — 51
13. পৃষ্ঠা — 52
14. পৃষ্ঠা — 53
15. পৃষ্ঠা — 54
16. পৃষ্ঠা — 56
17. পৃষ্ঠা — 59
18. পৃষ্ঠা — 60
19. পৃষ্ঠা — 61
20. পৃষ্ঠা — 62

একক 2 ? প্যারামোসিয়াম, স্কাইফা, কেঁচো ও আরশোলার অঙ্গসংস্থান ও বিবরণ (Morphology, description of *Paramoecium*, Scypha, Earthworm and Cockroach)

গঠন

2.1 প্যারামেসিয়াম
- **2.1.1** প্রাণীজগতে অবস্থান
- **2.1.2** সাধারণ গঠন
- **2.1.3** প্যারামেসিয়ামের গমন পদ্ধতি
- **2.1.4** প্যারামেসিয়ামের পুষ্টি
- **2.1.5** প্যারামেসিয়ামের জনন

2.2 স্কাইফা
- **2.2.1** প্রাণীজগতে অবস্থান
- **2.2.2** সাধারণ গঠন
- **2.2.3** জলবাহিকা তন্ত্র
- **2.2.4** স্কাইফার কোষের প্রকারভেদ
- **2.2.5** স্পিকিউল ও স্পিকিউলের প্রকারভেদ
- **2.2.6** স্কাইফার প্রজনন

2.3 কেঁচো
- **2.3.1** সাধারণ গঠন
- **2.3.2** মেটামেরিজম
- **2.3.3** কেঁচোর গমন
- **2.3.4** কেঁচোর সংবহন
- **2.3.5** রেচন
- **2.3.6** জনন

2.4 আরশোলা
- **2.4.1** সাধারণ গঠন
- **2.4.2** শ্বসন তন্ত্র
- **2.4.3** রেচনতন্ত্র
- **2.4.4** সংবহন তন্ত্র
- **2.4.5** আরশোলার জননতন্ত্র ও জনন
- **2.4.6** স্নায়ুতন্ত্র

2.5 অনুশীলনী

2.6 উত্তরমালা

2.1. প্যারামেসিয়াম কডাটাম *(Paramoecium caudatum)*

2.1.1 প্রাণীজগতে অবস্থান (Systematic position)

উপরাজ্য	:	প্রোটোজোয়া (Protozoa)
পর্ব	:	সিলিওফোরা (Ciliophora)
শ্রেণি	:	অলিগোহাইমেনোফোরিয়া
উপশ্রেণি	:	হাইমেনোস্টোমাসিয়া
বর্গ	:	হাইমেনোস্টোমাটিডা
উপবর্গ	:	পেনিফিউলিনা
উদাহরণ	:	*প্যারামেসিয়াম কডাটাম (Paramoecium caudatum)*

2.1.2 সাধারণ গঠন (General Organization)

বসবাস : এই আণুবীক্ষণিক এককোষী প্রাণীরা সাধারণত মিঠা জলে মৃত ও ক্ষয়প্রাপ্ত, পচা উদ্ভিজ্জের উপস্থিতিতে বসবাস করে। এদের গবেষণাগারে হে-কালচার পদ্ধতিতে সহজেই বংশবৃদ্ধি ও কালচার করা যায়। এদের বিভিন্ন প্রজাতি আছে।

দৈহিক বৈশিষ্ট্য : *প্যারামেসিয়াম কডাটাম (Paramoecium caudatum)*-এর দেহের সম্মুখ ভাগ ভোঁতা এবং পশ্চাৎ ভাগ অনেকটা সূঁচালো। দেহের মধ্যাংশ সবচেয়ে চওড়া, অনেকটা চটি-জুতার (slipper-shaped) ন্যায়। এদের শরীরের দৈর্ঘ্য প্রায় 0.15 mm থেকে 0.3 mm পর্যন্ত।

দেহাবরণ বা পেলিক্‌ল্‌ (pelicle) স্থিতিস্থাপক। এই পেলিক্‌লের উপরিভাগ অসংখ্য সূক্ষ্ম সিলিয়ায় আবৃত। দেহের পিছনের দিকে সিলিয়াগুলি সাধারণত বড় বড়। এদের একত্রে বলা হয় caudal tuft (কডাল টাফট)। পেলিক্‌ল্‌ দিয়ে ঘেরা প্রোটোপ্লাজমের পেলিক্‌ল্‌ সংলগ্ন স্বচ্ছ গাঢ় অংশকে বলে এক্টোপ্লাজম (ectoplasm) এবং ভিতরের অংশকে বলে এন্ডোপ্লাজম (endoplasm)।

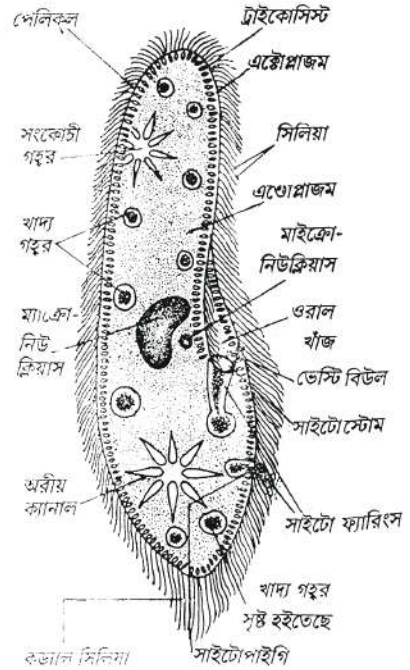

চিত্র 2.1 : প্যারামোসিয়ামের গঠন (আনুবীক্ষনিক)

এক্টোপ্লাজমে অবস্থিত সিলিয়ার সঙ্গে পর্যায়ক্রমে ট্রাইকোসিস্ট (trichocyst) নামক কোষাঙ্গ দেখা যায়। প্রয়োজনে প্যারামেসিয়ামের দেহের এই ট্রাইকোসিস্ট থেকে দীর্ঘ সূত্রবৎ দেহাঙ্গ বাইরের দিকে বেরিয়ে আসে। আত্মরক্ষা বা কোন বস্তুর সঙ্গে দেহকে আটকাবার সময় প্যারামেসিয়াম এই ট্রাইকোসিস্টের সাহায্য নেয়।

দেহের সামনের অঙ্কীয় তলে পেরিস্টোম বা মুখগহ্বর নামক অগভীর খাঁজ দেখা যায়। মুখগহ্বর (peristome) দেহের ভিতরের প্রায় অর্ধেক দৈর্ঘ্য অতিক্রম করে এবং এই গহ্বর শেষ হয় সাইটোস্টোম (cytostome) নামক গর্তে। একে বলা হয় কোষ মুখ বা cell mouth। এই মুখের পর সাইটোফ্যারিংক্স cytopharynx বা gullet নামক একটি খুব ছোট খাদ্যনালিকা দেখা যায় যেটি এন্ডোপ্লাজমের মধ্যে গিয়ে শেষ হয়। এই খাদ্যনালিকার ভিতরকার সিলিয়া পরস্পর সংলগ্ন হয়ে পেনিকিউলাস (penniculus) নামক কোষ অঙ্গ গঠন করে। সাইটোফ্যারিংক্সের কাছেই এক্টোপ্লাজমের লাগোয়া একটি অতি ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে, যাকে বলা হয় সাইটোপাইজ (cytopyge)। এই সাইটোপাইজ প্যারামেসিয়ামের মলদ্বার হিসাবে কাজ করে, এই পথে বর্জ্য পদার্থ পরিত্যক্ত হয়।

দেহের দুই প্রান্তে দুটি সংকোচী গহ্বর দেখা যায়। দেহের বর্জ্য পদার্থ তরলাকারে এই গহ্বরে প্রবেশ করে। তারপর ঐ তরল এক্টোপ্লাজম অংশে আসে এবং দেহের বাইরে বেরিয়ে যায়।

এর দেহের মধ্যে বড় ও ছোট দুটি নিউক্লিয়াস দেখা যায়। বড় নিউক্লিয়াসটিকে বলা হয় ম্যাক্রোনিউক্লিয়াস এবং ছোট নিউক্লিয়াসটি মাইক্রোনিউক্লিয়াস নামে পরিচিত। মাইক্রোনিউক্লিয়াসটি ম্যাক্রোনিউক্লিয়াসের খুব কাছেই অবস্থিত।

2.1.3 প্যারামেসিয়ামের গমন পদ্ধতি (Locomotion)

প্যারামেসিয়ামের গমন অঙ্গের নাম সিলিয়া (একবচনে সিলিয়াম)। প্যারামেসিয়ামের সিলিয়া একই প্রকারের, অনুদৈর্ঘ্য সারিতে সারাদেহে সজ্জিত থাকে। সেই জন্য এইগুলিকে বলা হয় **হলোট্রিকাস** (holotrichus)। ইলেকট্রন অনুবীক্ষণ যন্ত্রে সিলিয়ার গঠন সম্পর্কে জানা যায়। প্রতিটি সিলিয়াম কাইনেটোসোম থেকে উৎপন্ন হয়। প্রস্থচ্ছেদে সিলিয়ার অভ্যন্তরে 9+2-টি অণুনালিকা দেখা যায় এবং কাইনেটোসোমে ত্রয়ী অণুনালিকা দেখা যায়।

সিলিয়ামের অণুনালিকার বিন্যাস :

প্যারামেসিয়ামের সিলিয়াম গঠনের অণুনালিকাকে কাইনেটোডেসমাটা বলে। প্রতিটি কাইনেটোডেসমাটা সাইটোপ্লাজমের ভিতরে থাকে এবং সরাসরি বেসাল দানার সঙ্গে যুক্ত। সিলিয়াগুলি একটি সারিতে সজ্জিত থাকে। এই প্রতিটি সারিকে বলে কাইনেটি (kinety)। প্রতিটি সিলিয়াম কাইনেটোডেসমাটা এবং বেসাল দানা গঠিত একটি জটিল বিন্যাস। সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রে কাইনেটোডেসমাটাকে সূত্রবৎ মনে হয়। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে কাইনেটোডেসমাটাকে ওভারল্যাপিং কাইনেটোডেসমাল তন্ত্রীর সমষ্টি হিসাবে দেখা যায়। প্রতিটি তন্ত্রী বেসাল দানার সঙ্গে যুক্ত। একটি কাইনেটোডেসমায় এই তন্ত্রীর সংখ্যা প্রায় 500 পর্যন্ত হতে পারে। এই সরেখ তন্ত্রীগুলি সিলিয়ামের কাঠামো তৈরি করে। এছাড়া প্যারামেসিয়ামের

পেলিক্‌লের নিচে অতিসূক্ষ্ম অরেখ অণুতন্ত্রী থাকে যেগুলি বেসাল দানার সঙ্গে যুক্ত হয় অথবা সাইটোফ্যারিংক্স-এর মোটোরিয়াম (Motorium)-এর সঙ্গে যুক্ত থাকে (চিত্র :2.2)।

গঠন অনুযায়ী প্যারামেসিয়ামের প্রতিটি সিলিয়াম দুটি অঞ্চলে বিভক্ত। যথা—(১) কাইনেটোজোমাল (Kinetosomal) অঞ্চল এবং (২) স্যাফ্‌ট্ অঞ্চল (shaft region)। প্রস্থচ্ছেদে কাইনেটোডেসমা অঞ্চল (9+2) তন্ত্রীবিন্যাস এবং প্রতিটি পরিধিস্থ নালিকাগুচ্ছ (নয়টি) আবার তিনটি অণুনালিকা দ্বারা যুক্ত। অন্তঃস্থ নালিকা পরবর্তী নালিকাগুচ্ছের বহিঃনালিকার সঙ্গে সূত্র দ্বারা যুক্ত। সিলিয়ার কেন্দ্রে অণুনালিকা দানাদার বস্তু দিয়ে ঢাকা থাকে। এই অঞ্চল থেকে পরিধিস্থ নালিকার দিকে অণুনালিকাগুলি গরুর গাড়ির চাকার মত বিন্যস্ত থাকে বলে একে Cart wheel সজ্জাবিন্যাস বলা হয়। স্যাফ্‌ট্ অঞ্চলে 9+2 সজ্জাবিন্যাস দেখা গেলেও এই পরিধিস্থ নালিকাগুচ্ছে দুটি অণুনালিকা থাকে (চিত্র :2.3)।

বেসাল বডি, কাইনেটোডেসমা এবং সিলিয়া একত্রে যে জালিকাকার বিন্যাস তৈরি করে তাকে বলে ইনফ্রাসিলিয়েচার (infraciliature)।

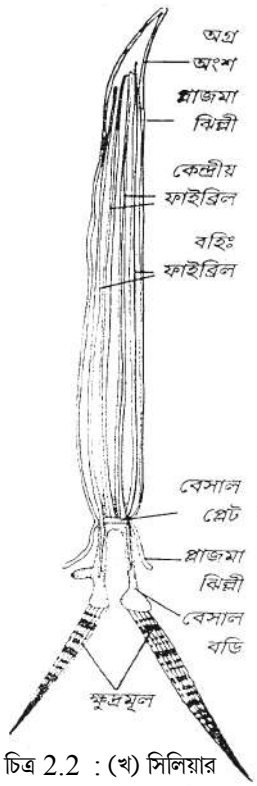

চিত্র 2.2 : (খ) সিলিয়ার লম্বচ্ছেদ

সিলিয়ারী গমন পদ্ধতি (ciliary locomotion) : প্যারামেসিয়াম সিলিয়ার সাহায্যে গমন সম্পন্ন করে। সিলিয়াগুলির সঞ্চালন অনিয়ন্ত্রিতভাবে বা একই ছন্দে সঞ্চালিত হয় না। সিলিয়ার চলন মেটাক্রোনাস ছন্দে (metachronus rhythm) সম্পন্ন হয়। এই ছন্দে সঞ্চালনের জন্য সিলিয়ামের সক্রিয় ঘাত (effective stroke) এবং প্রত্যাবর্তন ঘাত (recovery stroke)-এর প্রয়োজন হয়। সক্রিয় ঘাতের আগে সিলিয়ামের প্রোটিন তন্তুর সংকোচনের ফলে এটি ঋজু হয় এবং পার্শ্বীয় অণুনালিকার সংকোচনে বেঁকে গিয়ে জলে আঘাত করে, এটিই সক্রিয় ঘাত। বিপরীত প্রক্রিয়ায় ন্যূনতম বলের দ্বারা সিলিয়াম পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। এইভাবে মেটাক্রোনাস ছন্দের সক্রিয় ঘাত ও প্রত্যাবর্তন

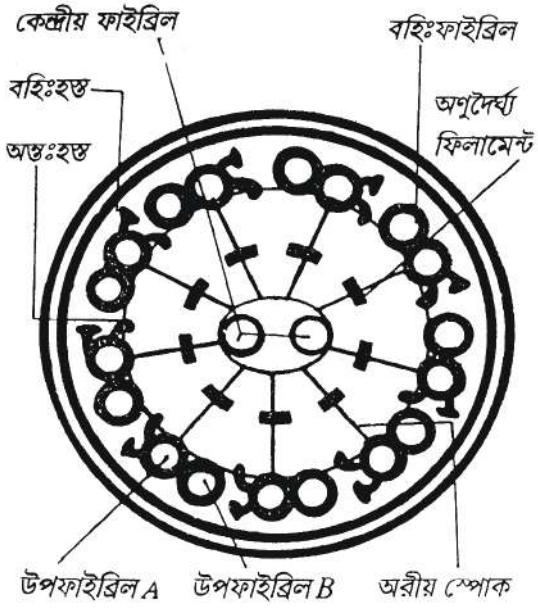

চিত্র 2.3: সিলিয়ার ইলেকট্রন আনুরক্ষণিক চিত্র

ঘাতের প্রভাবে প্যারামেসিয়ামের পরিবেশের জলে আঘাত সৃষ্টি হয় এবং প্রাণীটি বলের বিপরীত দিকে গমন করে। (চিত্র 2.4)

মেটাক্রোনাস ছন্দে সৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রণের মতবাদ :

(i) নিউরয়েড মতবাদ (Neuroid theory) :

বিজ্ঞানী Taylor (1964) এই মতবাদ ব্যক্ত করেন। তাঁর মত অনুযায়ী একটি পেসমেকার অনবরত সংকেত সৃষ্টি করে। যার ফলে সিলিয়ার তরঙ্গায়িত গতির সৃষ্টি হয়।

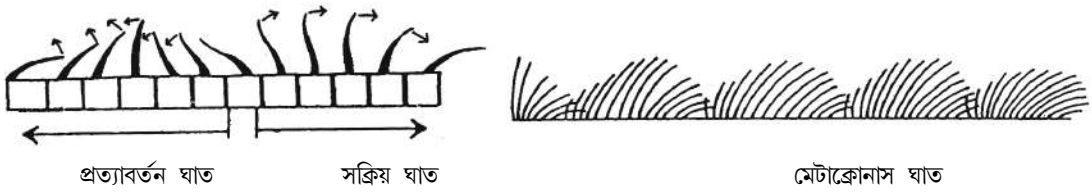

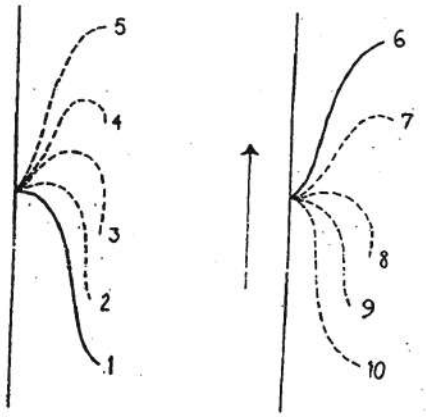

চিত্র 2.4 : প্যারামেসিয়ামের সিলিয়ার সঞ্চালন পদ্ধতি

(ii) যান্ত্রিক হস্তক্ষেপ (Mechanism interference) :

Grey (1928) প্রস্তাব করেন যে স্বাধীন দোলকের সান্দ্র স্থিতিস্থাপক সংযুক্তির ফলে মেটাক্রোনাস ছন্দের সৃষ্টি হয়।

(iii) তড়িৎ-বিভব মতবাদ (Electropotential theory) :

Paralucz (1967), Naitoh (1974) এবং Eckert (1972) এই মতবাদের প্রবক্তা। তাঁদের মতে সক্রিয় ঘাত ও প্রত্যাবর্তন ঘাতের মধ্যে যে তড়িৎ-বিভব প্রভেদ সৃষ্টি হয় তার ফলেই মেটাক্রোনাস ছন্দ বজায় থাকে।

যাহা হোক, এখনও পর্যন্ত উপরোক্ত মতবাদগুলির সঠিক বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

গমনের প্রকারভেদ (Types of locomotion) :

প্যারামেসিয়ামের দুই প্রকার গমন দেখা যায়। যথা—(i) ক্রিপিং চলন (ii) সন্তরণ।

(i) ক্রিপিং চলন (Creeping movement) :

কোনো বস্তুতে বাধা পেলে প্যারামেসিয়ামের অঙ্কীয় তলের সিলিয়াগুলি ক্ষুদ্রাকার পায়ের মত কাজ করে এবং দেহটিকে বাঁকিয়ে ও সঙ্কুচিত করে ছোট সংকীর্ণ জায়গার মধ্য দিয়ে গমন করতে পারে।

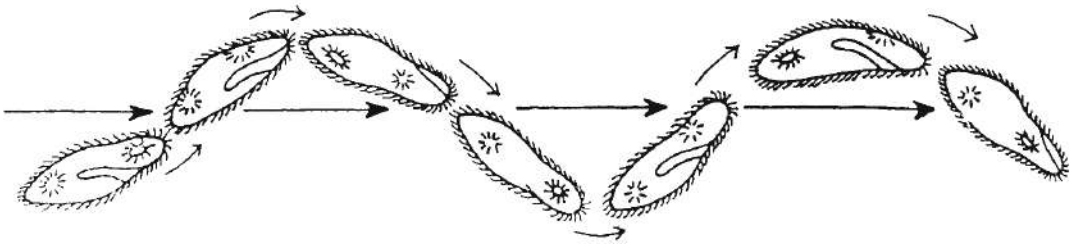

চিত্র 2.5 : প্যারামেসিয়ামের সর্পিল গতিপথ ও আবর্তন

(ii) সন্তরণ (Swimming) :

সিলিয়ার সঞ্চালনের দ্বারা জলে ঘাত সৃষ্টি করে এবং আঘাতের বিপরীত দিকে প্যারামেসিয়ামটি সন্তরণের মাধ্যমে গমন করতে পারে। দেহের সাইটোফ্যারিংক্স-এর সিলিয়া তুলনামূলকভাবে বড় ও দ্রুত সঞ্চালন করে এবং অণুদৈর্ঘ্য সারিতে সজ্জিত সিলিয়ার মেটাক্রোনাস ছন্দে সঞ্চালনের মাধ্যমে প্রাণীটির গতিপথ সর্পিল হয় এবং প্রাণীটি নিজের অক্ষে আবর্তিত হতে হতে এগিয়ে যায়। (চিত্র 2.5)

2.1.4 প্যারামেসিয়ামের পুষ্টি (Nutrition)

অতি ক্ষুদ্র এককোষী প্রাণী, ব্যাক্টিরিয়া, এবং উদ্ভিজ্জ ক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক শৈবাল ও ঈস্ট (yeast) প্রভৃতি প্যারামেসিয়ামের খাদ্যবস্তুর অন্তর্ভুক্ত।

জলজ প্রাণী হওয়ায় মুখগহ্বরস্থ সিলিয়ার চলাচলের ক্ষিপ্রতার কারণে জলমধ্যস্থ খাদ্যবস্তু মুখ বা cytostome-এর মধ্য দিয়ে সাইটোফ্যারিংক্সে প্রবেশ করে। এরপর খাদ্যনালিকা বা সাইটোফ্যারিংক্সের শেষে একটি জলবিন্দুর মতো হয়ে খাদ্যবস্তুটি খাদ্যগহ্বরের সৃষ্টি করে (food vacuole)। খাদ্যগহ্বরের ভিতর গৃহীত খাদ্যের পরিপাক ক্রিয়া শুরু হয়। দেহস্থ প্রোটোপ্লাজমের স্রোতের প্রভাবে খাদ্য- গহ্বরটি স্থানান্তরিত হতে থাকে। এইভাবে একাধিক খাদ্যগহ্বর একটির পর অপরটি প্রোটোপ্লাজমের স্রোতে প্রবাহিত হতে থাকে। খাদ্যগহ্বরের এই গতিপ্রবাহকে বলা হয় **সাইক্লোসিস** (cyclosis)। পরিপাক ক্রিয়ার শেষে খাদ্যের বর্জ্য সাইটোপাইজ বা মলদ্বারে উপস্থিত হয়ে দেহের বাইরে প্রক্ষিপ্ত হয়। প্যারামেসিয়ামের

খাদ্যগহ্বরের গতিপ্রবাহ-এর পথ নির্দিষ্ট। অর্থাৎ প্রথমে পশ্চাদ দিকে, পরে সম্মুখ ভাগে ক্রমে মুখ সন্নিকটে, পুনরায় পশ্চাৎ দিকে এবং অবশেষে সাইটোপাইজের দিকে ধাবিত হয়।

খাদ্যগহ্বরের জল প্রথমে আম্লিক (acidic) এবং পরে ক্ষারীয় হয়। এন্ডোপ্লাজম থেকে ক্ষরিত উৎসেচকের প্রভাবে খাদ্যের পরিপাক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। পরিপাক ক্রিয়া উৎপন্ন পাচিত খাদ্যসামগ্রী এন্ডোপ্লাজম অংশে প্রবেশ করে। এই পাচিত খাদ্য প্যারামেসিয়ামের দৈনিক প্রয়োজনে লাগে। অতিরিক্ত খাদ্য দেহ গঠনে অথবা ভবিষ্যৎ সময়ে ব্যবহারের জন্য সঞ্চিত থাকে।

2.1.5 প্যারামেসিয়ামের জনন (Reproduction)

প্যারামেসিয়াম-এর জনন দুটি পদ্ধতিতে সম্পন্ন হতে পারে। যথা—

(a) অযৌন জনন পদ্ধতি

(b) যৌন জনন পদ্ধতি

A. অযৌন জনন পদ্ধতি (Asexual reproduction) :

প্যারামেসিয়ামের আযৌন জনন সম্পন্ন হয় দ্বিভাজন পদ্ধতিতে। এই পদ্ধতিতে পরিণত প্যারামেসিয়ামের দেহ দুই ভাগে বিভক্ত হয় বলে এই পদ্ধতির নাম দ্বিবিভাজন বা binary fission। এই প্রক্রিয়ায় প্রথমে এর ম্যাক্রোনিউক্লিয়াসটি অ্যামাইটোসিস (Amitosis) পদ্ধতিতে আড়াআড়িভাবে দ্বিধাবিভক্ত হয়। এতে ক্রোমোজোমের কোনো ভূমিকা থাকে না। কিন্তু এর মাইক্রোনিউক্লিয়াস বিভাজিত হয় মাইটোসিস (Mitosis) প্রক্রিয়ায়। এখানে মাইক্রোনিউক্লিয়াস বিভাজনে ক্রোমোজোম বিশেষ ভূমিকা পালন করে। দুটি নবগঠিত মাইক্রোনিউক্লিয়াস (micronucleus) দেহের দুই প্রান্তে সরে যায়। এরপর নতুন দুটি সংকোচী গহ্বরের আবির্ভাব ঘটে এবং দুটি নতুন গালেট-এরও আবির্ভাব ঘটে। অতঃপর প্যারামেসিয়ামটির সাইটোপ্লাজম অংশটি আড়াআড়িভাবে বিভাজিত হয়ে দুটি সম আকৃতির নূতন প্যারামেসিয়াম-এর সৃষ্টি হয়। উভয়ের একই ধরনের কোষাঙ্গ লক্ষ্য করা যায়। পূর্ণতা প্রাপ্তির পর তাদের আবার একই পদ্ধতিতে বিভাজন ঘটে।

B. যৌন জনন পদ্ধতি (Sexual Reproduction) :

প্যারামেসিয়ামের যৌন জনন প্রধানত **কনজুগেশান** বা যুগ্ম জনন পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়। এছাড়াও অটোগ্যামী (autogamy), হেমিক্সিস (hemixis) এবং সাইটোগ্যামী (cytogamy) পদ্ধতিতেও এর যৌন জনন সম্পন্ন হয়।

(a) কনজুগেশান বা যুগ্মজনন বা সংশ্লেষ (Conjugation) :

এই যৌন জনন প্রক্রিয়ায় একই প্রজাতির দুটি ভিন্ন জেনোটিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন প্যারামেসিয়াম-এর প্রয়োজন হয়। এদের মেটিং টাইপ বলে। মেটিং টাইপগুলিকে রোমান হরফ I বা II দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। সোনেবর্ন্ (Sonneborn, 1937) সর্বপ্রথম লক্ষ্য করেন যে একই প্রজাতির দুটি প্যারামেসিয়াম যথেচ্ছভাবে সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে না। কেবলমাত্র জেনেটিক পার্থক্যযুক্ত দুটি একই প্রজাতির প্যারামেসিয়ামের সংশ্লেষ ঘটতে পারে।

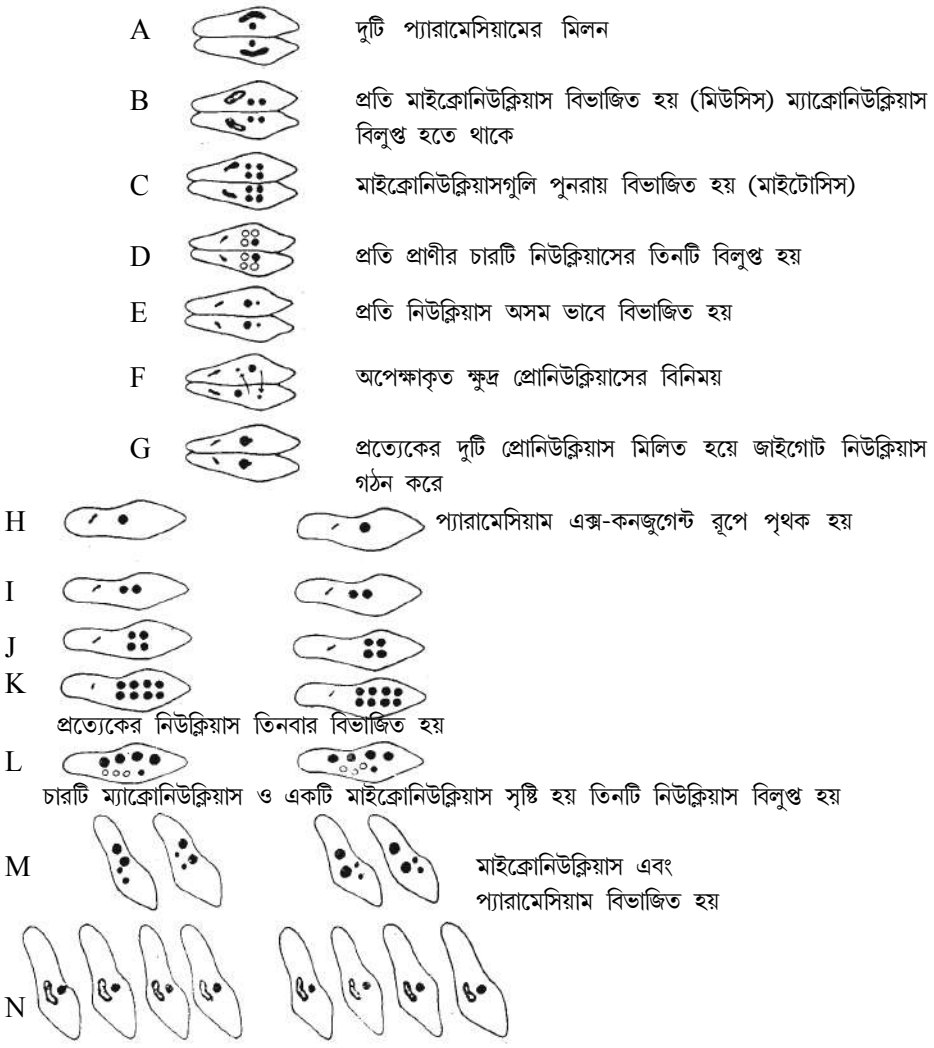

চিত্র 2.6 : কনজুগেশান পদ্ধতিতে প্যারামেসিয়ামের জনন

এই প্রক্রিয়ায় দুটি পরিণত একই প্রজাতির (ভিন্ন জেনেটিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত) প্যারামেসিয়াম প্রথমে কাছাকাছি আসে এবং অক্ষীয় তলের সাহায্যে পরস্পর যুক্ত হয় (চিত্র 2.6)। এই যুগ্ম সংশ্লেষকারী প্রাণী দুটিকে বলা হয় কনজুগ্যান্ট। পরে এদের মধ্যে একটি প্রোটোপ্লাজমীয় সেতু তৈরি হয়। সংযুক্ত অবস্থায় প্রাণী দুটির নিউক্লিয়াসে বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটে। Paramoecium caudatum-এর ক্ষেত্রে —

(i) দুটি কনজুগ্যান্টের প্রতিটির মাইক্রোনিউক্লিয়াসটি দু'বার বিভাজিত হয় (চিত্র 2.6) এবং ম্যাক্রোনিউক্লিয়াস দুটি ক্রমে লুপ্ত হতে থাকে। এই পর্যায়ে ক্রোমোজোমগুলি মিয়োসিস প্রক্রিয়ায় হ্যাপ্লয়েড সংখ্যক হয়ে পড়ে।

(ii) একটি কনজুগ্যান্টে উৎপন্ন চারটি নিউক্লিয়াসের মধ্যে একটি পুনরায় বিভাজিত হয়ে থাকে এবং দুটি অসম গ্যামেট নিউক্লিয়াস (gamete nucleus) উৎপন্ন করে। বড় গ্যামেট নিউক্লিয়াসটি স্থির নিউক্লিয়াস (stationary nucleus) এবং একে স্ত্রী গ্যামেট নিউক্লিয়াস বলে এবং ছোটটি সঞ্চরণশীল নিউক্লিয়াস (migratory nucleus) এবং পুং গ্যামেট নিউক্লিয়াস রূপে গণ্য হয়। অবশিষ্ট তিনটি নিউক্লিয়াস লুপ্ত হয়। (চিত্র 2.6)

(iii) এরপর একটির পুংগ্যামেট বা সঞ্চরণশীল নিউক্লিয়াসটি অপর কনজুগ্যান্টে যায় এবং বিপরীতক্রমে দ্বিতীয়টির পুং গ্যামেট বা সঞ্চরণশীল নিউক্লিয়াসটিও প্রথম কনজুগ্যান্টে আসে এবং একে অপরের স্ত্রী গ্যামেট বা স্থির নিউক্লিয়াসের সঙ্গে মিলিত হয় (চিত্র 2.6)।

(iv) পুং গ্যামেট নিউক্লিয়াস এবং স্ত্রী গ্যামেট নিউক্লিয়াসের মিলনের ফলে **সিনক্যারিয়ন** (synkaryon) বা ডিপ্লয়েড জাইগোট নিউক্লিয়াস উৎপন্ন হয় (চিত্র 2.6)।

(v) এরপর কনজুগ্যান্ট দুটি পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয় এবং ঐ বিচ্ছিন্ন স্থানে নতুন পেলিকল্ গঠিত হয়। প্রতিটি বিচ্ছিন্ন কনজুগ্যান্টকে এক্সকনজুগ্যান্ট বলে। প্রতিটি এক্সকনজুগ্যান্টের নিউক্লিয়াসটি পরপর তিনবার মাইটোসিস পদ্ধতিতে বিভাজিত হয়ে আটটি নিউক্লিয়াস গঠিত হয়। এই আটটি নিউক্লিয়াসের থেকে চারটি ম্যাক্রোনিউক্লিয়াস গঠিত হয় এবং এর মধ্যে তিনটি বিলুপ্ত হয় এবং অবশিষ্টটি মাইক্রোনিউক্রিয়াস সৃষ্টি করে। (চিত্র)

(vi) এইভাবে প্রতিটি এক্সকনজুগ্যান্ট প্যারামেসিয়াম এবং তাদের মাইক্রোনিউক্লিয়াসটি দু'বার বিভাজিত হয়ে চারটি অপত্য প্যারামেসিয়ামের সৃষ্টি করে, যাদের প্রতিটিতে একটি করে ম্যাক্রোনিউক্লিয়াস ও একটি মাইক্রোনিউক্লিয়াস দেখা যায় (চিত্র 2.6)।

b. অটোগ্যামী (Autogamy) :

অটোগ্যামী, কনজুগেশান বা সংশ্লেষ প্রক্রিয়ার সঙ্গে তুলনীয়, কিন্তু একটি মাত্র প্যারামেসিয়ামে নিউক্লিয়াসের পুনর্গঠন ঘটে বলে এই প্রক্রিয়ায় নাম অটোগ্যামী। প্যারামেসিয়াম অরেলিয়ায় (*paramoecium aurelia)* অটোগ্যামী পদ্ধতিতে জনন দেখা যায়।

c. হেমিক্সিস (Hemixis) : এই প্রক্রিয়ায় শুধুমাত্র ম্যাক্রোনিউক্লিয়াসের পরিবর্তন ঘটে। *P. caudatum, P. aurelia* এবং *P. multimicronucleatum* এই তিনটি প্রজাতিতে এই জনন প্রক্রিয়া দেখা যায়।

d. সাইটোগ্যামী (Cytogamy) : এক্ষেত্রে সংশ্লেষের মতোই দুটি প্রাণীর cytoplasm-এর মিলন ঘটে কিন্তু মাইক্রোনিউক্লিয়াসের কোন ভূমিকা থাকে না।

2.2 স্কাইফা (Scypha or Sycon)

সামুদ্রিক স্পঞ্জগুলির মধ্যে স্কাইফা অন্যতম। এটি সমুদ্রের সর্বত্র, বিশেষত উত্তর আটলান্টিক সমুদ্রের অগভীর জলে সমগ্র সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে দেখা যায়। এটি স্থিতিশীল কলোনী গঠন করে কোন সমুদ্র নিমজ্জিত পাথর বা অন্য কোন শক্ত জিনিসের উপর অবস্থান করে। যে সমস্ত স্থানে ঢেউ কম এবং সমুদ্রের অপেক্ষাকৃত স্থায়ী অঞ্চলে এদের কলোনী দেখা যায়।

2.2.1 প্রাণীজগতে অবস্থান

পর্ব—পরিফেরা (Porifera)

শ্রেণি—ক্যাল্কেরিয়া (Calcarea)

উপশ্রেণি—ক্যালকেরোনিয়া (Calcaronea)

গণ—স্কাইফা (Scypha)

2.2.2 সাধারণ গঠন (General organization)

শরীরটি চোঙাকৃতি ফুলদানীর মত অংশবিশেষ, যার মধ্যাংশ মোটা বা ফোলা এবং দুই প্রান্ত অপেক্ষাকৃত সরু, শাখা-প্রশাখাযুক্ত। স্টোলোন (Stolon) নামক ভিত্তির সাহায্যে স্কাইফার দেহ সমুদ্রের শক্ত আবরণী বা পাথরে আটকে থাকে। দেহ অরীয়ভাবে (radially) প্রতিসম। বহুকোষী দ্বিস্তরবিশিষ্ট প্রাণী। দৈহিক পরিমাণ 1 থেকে 3 সেমি (cm) লম্বা বা উচ্চতাযুক্ত এবং 5 থেকে 6 মিমি (mm) ব্যাস যুক্ত। নির্দিষ্ট কোন বর্ণের হয় না। সাধারণত ধূসর থেকে হাল্কা বাদামী। দেহের অগ্রভাগ একটি ছিদ্র দ্বারা Å^ Ø• öi **অসকিউলাম** (osculum) নামে পরিচিত। অস্কিউলাম ক্যালসিয়ামযুক্ত (calcareous), দীর্ঘ, ঋজু, সূচাকৃতি মনোঅ্যাক্সন নামক স্পিকিউল্ দ্বারা পরিবেষ্টিত ; একে অসকিউলাম ফ্রিঞ্জ বলে। এই অস্কিউলাম ফ্রিঞ্জ দেহের অভ্যন্তরে ক্ষুদ্র প্রাণীদের প্রবেশে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। অসকিউলামের নীচে সরু গলার মত অংশকে কলার অঞ্চল (collar region) বলে। দেহগহ্বর (coelom) থাকে না। দেহে নির্দিষ্ট কোন অঙ্গাতন্ত্র থাকে না। দেহে কোনরূপ কেন্দ্রীভূত স্নায়ুকলা থাকে না। দেহের ভিতরের নির্দিষ্ট অংশ এক ধরনের ফ্লাজেলাযুক্ত কোষ বা কোয়ানোসাইট (choanocyte) দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। দেহের বাইরের প্রাকার অসংখ্য সূক্ষ্ম আণুবীক্ষণিক ছিদ্র বা **অস্টিয়া** (ostia) যুক্ত। এই ছিদ্রগুলি দিয়ে স্কাইফার শরীরের ভিতর জল প্রবেশ করে এবং বড় প্রান্তিক ছিদ্র বা অসকিউলাম দিয়ে শরীর থেকে জল বেরিয়ে যায় (চিত্র 2.7)।

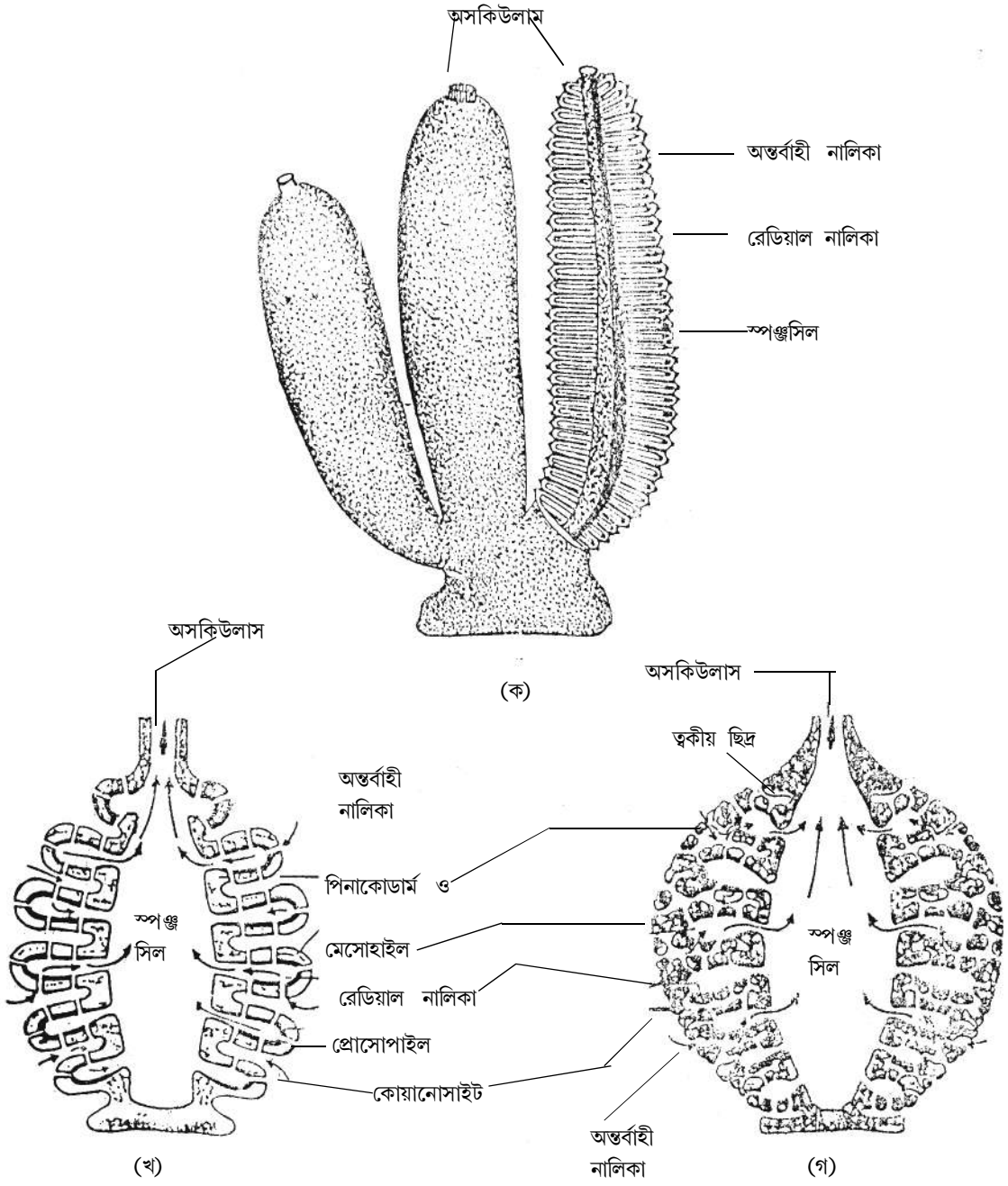

চিত্র 2.7 : সাইফার গঠন ও সাইকনয়েড নালিকা তন্ত্র
(ক) বিবর্ধিত সাইকনের কলোনি ও অন্তর্গঠন ; (খ) সাইকনয়েড নালিকা তন্ত্রের প্রাথমিক দশা (কর্টেক্স ছাড়া) ; (গ) কর্টেক্স সহ সম্পূর্ণ সাইকোনয়েড নালিকা তন্ত্র

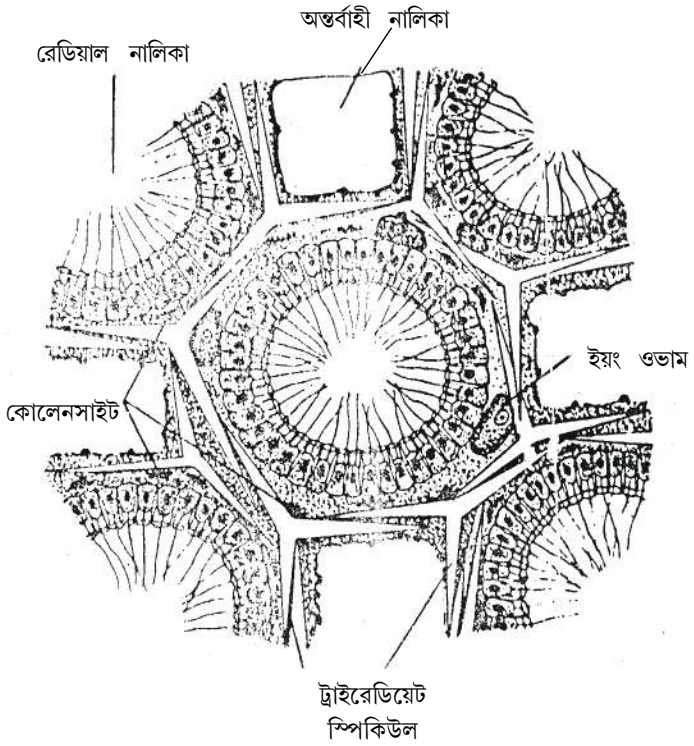

চিত্র 2.8 : সাইকনের প্রস্থচ্ছেদে অন্তর্গঠন

2.2.3 জল বাহিকাতন্ত্র (Water vascular system or Water canal system)

অন্যান্য স্পঞ্জদের মতো স্কাইফার জল সংবহন তন্ত্র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এর শরীরে নালিকা বিন্যাস আছে। এই নালিকার মাধ্যমে দেহে জল প্রবেশ করে। একে জলবাহিকা তন্ত্র বলে, স্কাইফার এই নালিতন্ত্রকে বলা হয় সাইকনয়েড ধরনের (Syconoid type) নালিকা তন্ত্র। সাইকনয়েড নালিকাতন্ত্রে স্পঞ্জের শরীরে এক অবিরাম অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী জলের প্রবাহ চলতে দেখা যায় (চিত্র 2.8, 2.9)।

A. নালিকাতন্ত্রের গঠন : স্কাইফার নালিকাতন্ত্রে নিম্নলিখিত গঠনগুলি দেখা যায়।

1. স্পঞ্জোসিল (Spongocoel)

যদি উল্লম্বভাবে স্কাইফার ছেদ করা হয় তবে দেখা যাবে যে অসকিউলাম একটি সরু নলাকার গহ্বরের সঙ্গে যুক্ত। এই গহ্বরটিকে বলা হয় স্পঞ্জোসিল (spongocoel)। এই স্পঞ্জোসিল অসংখ্য বহির্মুখী নালিকা (excurrent canal)-র সঙ্গে যুক্ত। একটি কলোনীর বিভিন্ন শাখার স্পঞ্জোসিলগুলি নীচের দিকে একটি সাধারণ বৃহৎ গহ্বরের সাথে যুক্ত। এই গহ্বরের প্রাকার পিনোসাইট (pinocyte) কোষ দ্বারা নির্মিত।

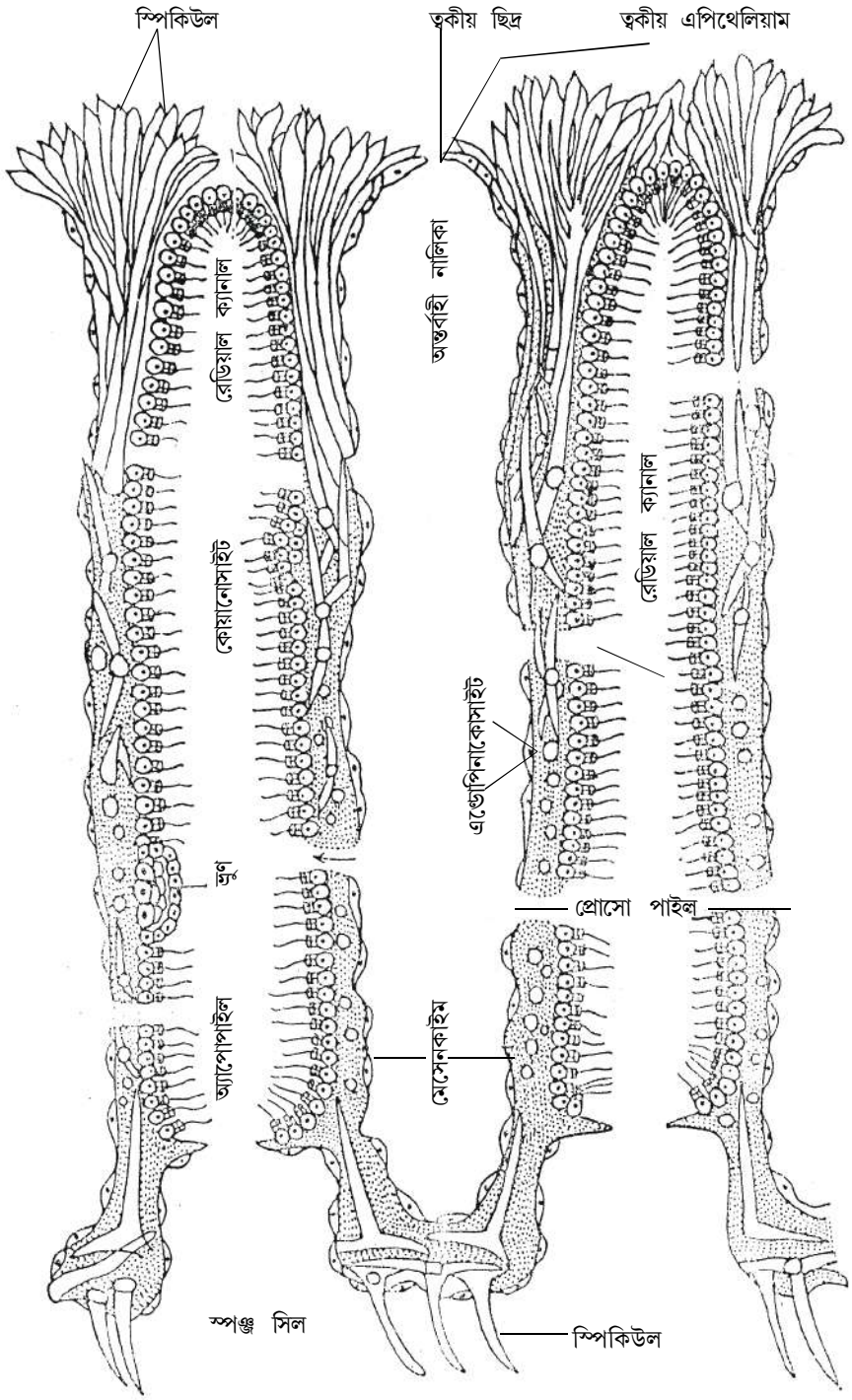

চিত্র 2.9 : লম্বচ্ছেদে সাইকনের অন্তর্গঠন দৃশ্য

2. অন্তর্মুখী নালিকা (Incurrent canal) :

স্কাইফার প্রতিটি শাখার বহিঃগাত্র উঁচু-নীচু খাঁজ যুক্ত। এই খাঁজের ভিতরে ছোট ছোট অন্তর্বাহী ছিদ্র বা অস্টিয়া থাকে। এই অস্টিয়া দিয়ে জল শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। এই নালিগুলি বাইরের দিকে প্রশস্ত এবং ভিতরের দিকে সরু এবং ছিদ্র বিহীন। এর গাত্রও **পিনাকোসাইট** কোষ দ্বারা গঠিত।

3. রেডিয়াল নালিকা (Radial canal) :

অন্তর্মুখী নালিকার সমান্তরালে এবং বিপরীতক্রমে যে নালিকা থাকে তাদের বলে রেডিয়াল নালিকা। প্রশস্ত অংশের বিপরীত প্রান্তে এদের অবস্থান। এগুলি অন্তর্মুখী নালিকার বিপরীত গঠনযুক্ত। এই নালিকা বহির্দিকে সরু এবং ছিদ্রহীন কিন্তু ভিতরের দিকে উন্মুক্ত। এগুলির প্রাকার কোয়ানোসাইট কোষ দ্বারা আবৃত। **প্রোসোপাইল** (prosopyle) নামক সংযোগকারী পথের মাধ্যমে অর্ন্তমুখী নালিকা ও রেডিয়াল নালিকা সংযুক্ত।

4. বহির্মুখী নালিকা (Exccurent canal) :

এইগুলি ক্ষুদ্র ও চওড়া নালিকা বিশেষ। একই রেডিয়াল নালিকার লম্ব অক্ষ বরাবর এরা অবস্থিত এবং বহিঃত্বকীয় চ্যাপ্টা কোষ দ্বারা নির্মিত। অ্যাপোপাইল (apopyle) নামক ছিদ্রের মাধ্যমে বহির্মুখী নালিকা বাইরের প্রান্তে রেডিয়াল নালিকার সঙ্গে সংযুক্ত। এটি ভিতরের প্রান্তে ইন্টারনাল অসটিয়াম নামক অপেক্ষাকৃত বড় ছিদ্রের মাধ্যমে প্যারাগ্যাস্ট্রিক গহ্বরের সঙ্গে সংযুক্ত।

B. জল সংবহন পথ (Course of water current) :

রেডিয়াল নালিকার গাত্রে ফ্লাজেলাযুক্ত কোয়ানোসাইট কোষগুলির দ্রুত পশ্চাৎমুখী চলনের ফলে একটি অবিরাম জল সংবহন স্রোত নালিকাতন্ত্রে দেখা যায়। এই সংবহন প্রবাহের গতি নালিকাতন্ত্রের নালিকার ব্যাসের তারতম্যের জন্য বৃদ্ধি বা হ্রাস পায় এবং নিয়ন্ত্রিত হয়।

বাইরের জল অস্টিয়ার মাধ্যমে অন্তর্মুখী নালিকার মাধ্যমে স্কাইফার শরীরে প্রবেশ করে। অতঃপর অন্তর্মুখী নালিকা থেকে প্রোসোপাইলের মাধ্যমে রেডিয়াল নালিকাতে পৌঁছায়। রেডিয়াল নালিকা থেকে জল অ্যাপোপাইল (apopyle) মারফৎ বহির্মুখী নালিকাতে পৌঁছায়। বহিঃমুখী নালিকা থেকে গ্যাস্ট্রিক অস্টিয়ার মাধ্যমে ঐ জল যায় স্পঞ্জোসিলে। স্পঞ্জোসিল থেকে এই জল অসকিউলামের মাধ্যমে বাইরে বেরিয়ে যায়।

নীচে ছকের সাহায্যে স্কাইফার জল সংবহন পথ দেখানো হল—

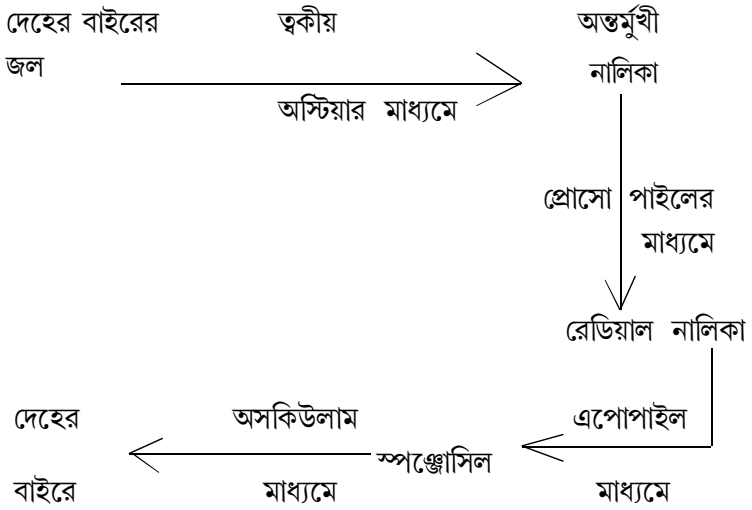

স্কাইফার শরীরের জল সংবহনের গতি প্রায় 0.01 mm/sec. অর্থাৎ প্রতি সেকেন্ডে 0.01 মিলিমিটার।

C. নালিকাতন্ত্রের ভূমিকা (Role of water vascular system) :

স্কাইফার নালিকাতন্ত্র বিভিন্ন কার্য সম্পাদন করে। যথা—

1. জল সংবহন তন্ত্রের মাধ্যমে প্রাণীটি পুষ্টি গ্রহণ করে। জলের সংবহনে ডায়াটম, প্রোটোজোয়া প্রভৃতি জলের সঙ্গে রেডিয়াল নালিকার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় ঐ বস্তুগুলি ফ্লাজেলাযুক্ত কোষ দ্বারা আহৃত ও পরিপাচিত হয়ে স্পঞ্জের খাদ্য ও পুষ্টি সরবরাহ করে।
2. শরীরে অক্সিজেন সরবরাহ হয়।
3. জল সংবহন মাধ্যমে রেচন সম্পন্ন হয়। রেচন পদার্থ যথা কার্বনিক অ্যাসিড এবং অন্যান্য নাইট্রোজেন ঘটিত রেচন পদার্থগুলি অসকিউলামের মাধ্যমে শরীরের বাইরে চলে যায়।
4. বহির্বাহী জল সংবহন ডিম্বাণু ও শুক্রাণু শরীরের বাইরে প্রেরণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।
5. জটিল নালিকাতন্ত্র প্রাণীটির অন্তরের আয়তন ক্ষেত্র (surface area) বাড়িয়ে প্রাণীটিকে সরাসরি জলে পরিব্যাপ্তি ঘটায়।

2.2.4 স্কাইফার কোষের প্রকারভেদ (Types of cells)

নীচে স্কাইফার দেহ প্রাকারের বিভিন্ন ধরনের কোষের বর্ণনা দেওয়া হ'ল—

1. স্কাইফার দেহ প্রাকারে—

(i) অন্তঃত্বকীয় কোষ (এক্টোডারমাল কোষ), (ii) বহিঃত্বকীয় কোষ (এন্ডোডারমাল কোষ) এবং (iii) মায়োসাইটস্ দেখা যায়।

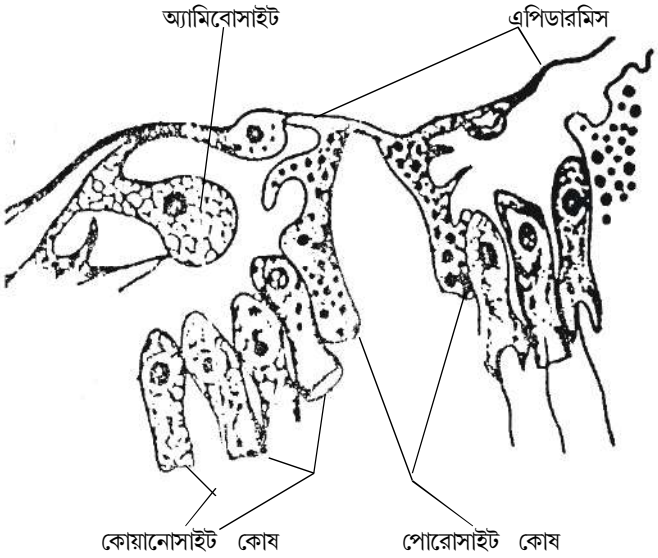

চিত্র 2.10 : দেহ ব্যবচ্ছেদে (section) স্কাইফার বিভিন্ন ধরনের কোষ-এর অবস্থান।

(i) বহিঃত্বকীয় কোষ (ectodermal cells) :

এই কোষগুলি চ্যাপ্টা আঁশের মত পাত্‌লা, অস্পষ্ট নিউক্লিয়াস যুক্ত এবং পাশাপাশি সন্নিবেশিত থাকে, অনেকটা এপিথেলিয়াম বা আবরণী কোষ-এর মত। বহিঃত্বকীয় এই আবরণী কোষকে পিনাকোসাইট বলা হয় (pinacocyte)। প্রতিটি পিনাকোসাইট কোষ-এর একটি কেন্দ্রীয় নিউক্লিয়াস থাকে। কিছু কিছু পিনাকোসাইট কোষকে অন্তর্মুখী নালিকা ও স্পঞ্জোসিলে দেখা যায়। অন্তর্মুখী নালিকাতে অবস্থিত পিনাকোসাইটকে স্কেলিটোজেনাস কোষ বলে (skeletogenous cell)।

(ii) অন্তঃত্বকীয় কোষ (Endodermal cell)

এই কোষগুলি ঘনকাকার। প্রতিটি কোষে একটি নিউক্লিয়াস থাকে, এক বা একাধিক গহ্বর যুক্ত। অন্তঃপ্রান্তে ফ্লাজেলাম যুক্ত, যার গোড়ায় কোলার-সদৃশ সূক্ষ্ম, স্বচ্ছ উপবৃদ্ধি দেখা যায়। এই কোষগুলিকে কোয়ানোসাইট (choanocyte) কোষ বলা হয়। এদের কেবলমাত্র রেডিয়াল নালিকাতেই দেখা যায়।

(iii) মিয়োসাইট (Myocyte)

অস্টিয়া, প্রোসোপাইল এবং অ্যাপোপাইল অংশের ছিদ্রের চারপাশে বৃত্তাকার সজ্জায় এই সংকোচী কোষগুলি দেখা যায়।

2. মেসেনকাইম বস্তু :

স্কাইফার মেসেন কাইম একটি জিটালিন নির্মিত, প্রোটিন জাতীয় স্বচ্ছ ধাত্র বিশেষ। এটি মেসোগ্লিয়া

নামে পরিচিত। এটি প্রাণীটির দৃঢ়তা প্রদান করে। মেসোগ্লিয়া (mesoglea) অ্যামিবোসাইট নামক কোষ দ্বারা গঠিত। স্কাইফার বিভিন্ন ধরনের অ্যামিবোসাইট কোষ নিম্নরূপ :

(i) অ্যামিবয়েড ওয়ান্ডারিং কোষ—এই কোষ অ্যামিবার আকৃতির মতো এবং স্থান থেকে স্থানান্তরে গমন করতে পারে। এরা স্কাইফার পুষ্টিতে সহায়তা করে।

(ii) কোলেনোসাইট—এই ধরনের কোষে ক্ষণপদের মত অংশ দেখা যায়। বিভিন্ন বস্তুর সংযোগে এর বিশেষ ভূমিকা দেখা যায়। বাইপোলার কোলেনোসাইটকে ডেসমোসাইট বা তন্তু কোষ বলা হয়।

(iii) ক্রোমোসাইট—এই কোষগুলি লোবোসস্ ক্ষণপদযুক্ত এবং রং বা পিগমেন্ট বহন করে। এই রং থাকার জন্যই স্পঞ্জ রঙিন হয়।

(iv) থেসোসাইট (Thesocyte) : ক্রোমোসাইট-এর মত লোবোস (lobose) ক্ষণপদযুক্ত এবং এরা খাদ্য সঞ্চয় করে রাখে।

(v) স্ক্লেরোব্লাস্ট (Scleroblast) : এই ধরনের কোষগুলি স্কেলিটাল পদার্থ বা স্পিকিউল ক্ষরণ করে। এটি দুই ধরনের হতে পারে।

(a) **ক্যাল্‌কোব্লাস্ট (Calcoblast)** —এই ধরনের অ্যামিবোসাইট কোষগুলি ক্যালসিয়াম যুক্ত স্পিকিউল উৎপন্ন করে ও ক্ষরণ করে।

(b) **সিলিকোব্লাস্ট (Silicoblast)** —এরা সিলিকাযুক্ত স্পিকিউল ক্ষরণ করে।

(vi) জনন কোষ : এগুলি পরিমার্জিত (modified) অ্যামিবোসাইট এবং পরিমার্জিত কোয়ানোসাইট কোষ।

(vii) পোরোসাইট : এই কোষগুলি নলাকার। যার কেন্দ্রে একটি নালিকা বা ফাঁপা অংশ অন্তর্মুখী স্রোতের পথ হিসাবে কাজ করে। এদের ছিদ্রগুলি পাতলা সাইটোপ্লাজম দ্বারা বন্ধ থাকে, একে বলে ছিদ্র ডায়াফ্রাম, পোরোসাইটগুলিকে ছিদ্র কোষ (pore cell) নামেও অভিহিত করা হয়। এই কোষগুলি পিনাকোসাইটে পরিবর্তিত হয়।

2.2.5 স্পিকিউল ও স্পিকিউলের প্রকারভেদ (Types of spicules)

দেহের মেসেনকাইমে যে অসংখ্য ছোট ছোট, কেলাসাকৃতির, ক্যালসিয়াম গঠিত অংশ দেখা যায় তাদের বলা হয় **স্পিকিউল**। স্কাইফা নামক স্পঞ্জের শরীরে দুই ধরনের স্পিকিউল পাওয়া যায়। যথা—মোনাক্সন ও টেট্রাক্সন।

(a) মোনাক্সন স্পিকিউল (Monaxon spicule)

এটি একক বা দ্বি-শাখাযুক্ত (uniradiate ও biradiate)। একটি অক্ষ থেকে যখন একই দিকে বিবর্ধিত হয় তখন সেই স্পিকিউলকে বলা হয় ইউনিরেডিয়েট মোনাক্সন স্পিকিউল। আর যখন একই অক্ষ থেকে দুই দিকে বিবর্ধিত হয় তখন তাকে বলা হয় বাইরেডিয়েট (biradiate) মোনাক্সন স্পিকিউল। এগুলি সরু, ঋজু, সূচের মত অথবা বাঁকানো আকৃতির হয়।

(b) টেট্রাক্সন স্পিকিউল (Tetraxon spicule)

এর প্রত্যেকটি স্পিকিউল একই তলের চারদিকে প্রবর্ধিত বা বিকিরিত হয়ে থাকে। একটি ray -র অভাবে বা বিনষ্ট হয়ে গিয়ে এরা ট্রাইরেডিটও হতে পারে। প্রত্যেকটি রে সমান কোণ উৎপন্ন করে অথবা নাও করতে পারে। সমান কোণ উৎপন্নকারী স্পিকিউলকে নিয়মিত বা regular কোণসমৃদ্ধ স্পিকিউল বলা হয়।

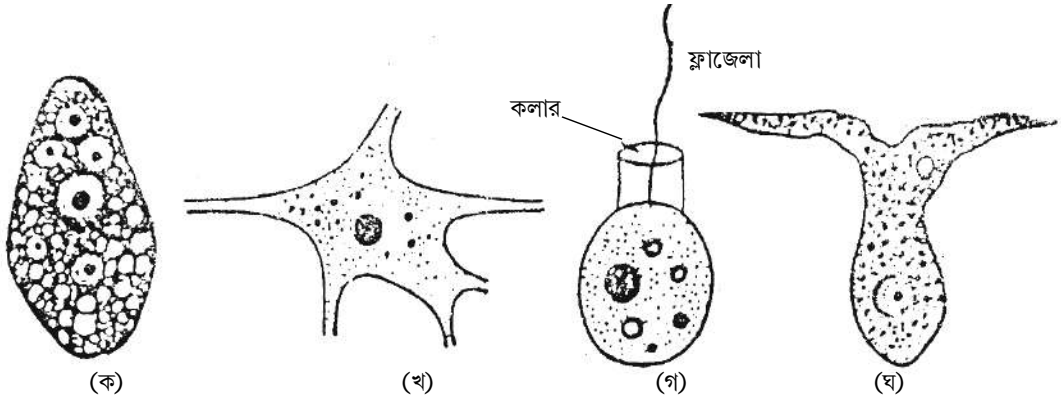

চিত্র 2.11: পঞ্জের বিভিন্ন প্রকার কোষ (ক) আর্কিওসাইট (খ) অ্যামিবোসাইট (গ) কোয়ানোসাইট (ঘ) এপিডার্মাল কোষ

2.2.6 স্কাইফার প্রজনন (Reproduction)

স্কাইফার জনন প্রধানত দুটি পদ্ধতিতে সংঘটিত হয়। যথা—অযৌন জনন পদ্ধতি এবং যৌন জনন পদ্ধতি।

A. অযৌন জনন :

কোরকোদ্‌গম বা বাডিং (budding) পদ্ধতিতে স্কাইফার অযৌন জনন সম্পন্ন হয়। প্রথমে সিলিন্ডারের ভিতর থেকে একটি কোরক বা বাড উত্থিত হয়। এই বাডের ঊর্ধ্ব প্রান্তে পরে একটি অসকিউলামের আবির্ভাব ঘটে। এরপর পরিণত বাডটি জনিতৃ কলোনীর সঙ্গে সংযুক্ত থাকতে পারে অথবা পৃথকভাবে জলের তলদেশের সঙ্গে আবদ্ধ হয়ে স্বাধীনভাবে অবস্থান করে থাকে।

B. যৌন জনন :

স্কাইফা মনোএসিয়াস (monoecious) প্রাণী ; অর্থাৎ একই স্কাইফার শরীরে ডিম্বাণু ও শুক্রাণু উৎপন্ন হয়ে থাকে। আরকিওসাইট (বিশেষ ধরনের অ্যামিবোসাইট কোষ) গঠনের মাধ্যমে এদের যৌন জনন সম্পন্ন হয়। এদের কোন যৌন অঙ্গ থাকে না। মেসেনকাইমের গ্যাস্ট্রাল স্তরের ফ্লাজেলেট প্রকোষ্ঠে যৌন কোষের উৎপত্তি ঘটে। স্কাইফা মনোএসিয়াস হলেও এদের পরনিষেক বা ক্রস-ফার্টিলাইজেশান ঘটে।

স্কাইফা নামক স্পঞ্জের শুক্রাণুর মস্তক গোলাকার এবং লম্বা লেজযুক্ত হয়। জলস্রোতের মাধ্যমে এই শুক্রাণু এক স্কাইফার শরীর থেকে অন্য স্কাইফার শরীরের রেডিয়াল ক্যানাল অঞ্চলে পৌঁছায়। ডিম্বাণু গোলাকৃতির, বড় ধরনের এবং মাতৃ স্পঞ্জের কলা কোষের সঙ্গে আটকে থাকে। মাতৃ স্পঞ্জের শরীরের মধ্যেই নিষেক সম্পন্ন হয়। নিষিক্ত ডিম্বাণুটি জাইগোট গঠন করেও উল্লম্বভাবে বিভাজিত হয়ে থাকে এবং আটটি শঙ্কু (conical) আকৃতির কোষ তৈরি করে। এরপর এই কোষগুলির অনুপ্রস্থ ক্লিভেজ ঘটে। এর ফলে ব্লাস্টোসিল উৎপন্ন হয় যার মধ্যে আটটি লম্বা কোষ ও আটটি ক্ষুদ্র কোষের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। দীর্ঘ বা লম্বা কোষগুলি পরে ভবিষ্যৎ এপিডারমিস গঠন করে এবং ক্ষুদ্র কোষগুলি কোয়ানোসাইট

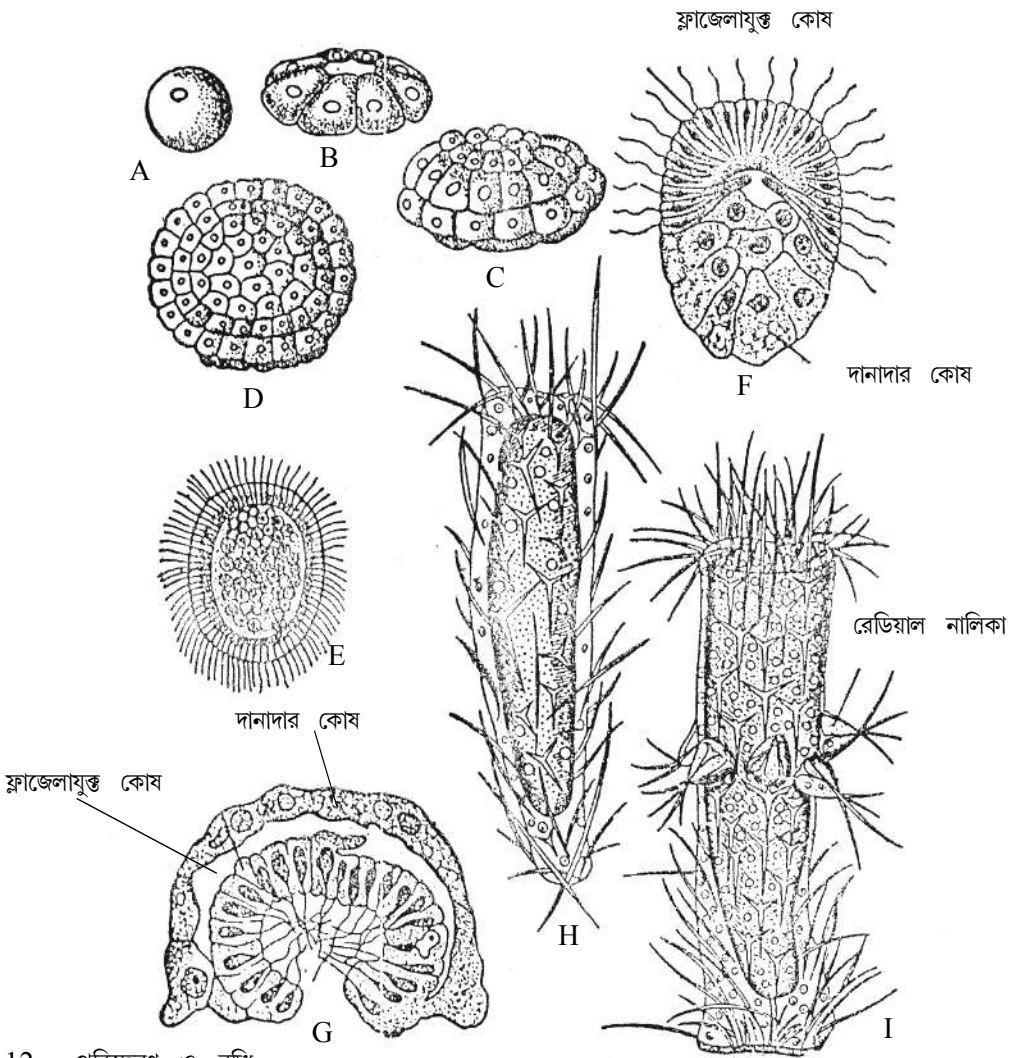

চিত্র 2.12 : পরিস্ফুরণ ও বৃদ্ধি
A. জাইগোট B. 8-কোষ দশা C.32-টি কোষ দশা D. প্রারম্ভিক ব্লাস্টুলা E. একটি অ্যাম্ফিব্লাস্টুলা g. একটি-গ্যাট্রুলা H. & I. একটি সদ্যজাত (young) স্পঞ্জ।

কোষ গঠন করে। ক্ষুদ্র কোষ আটটি ক্রমশ আকারে বাড়তে থাকে এবং ভিতরের দিকে এদের ফ্লাজেলার আবির্ভাব ঘটে। অপর দিকে দীর্ঘ কোষগুলির কোন বিভাজন ও বৃদ্ধি হয় না। পরিবর্তে এই দীর্ঘ কোষগুলি গোলাকৃতির হতে থাকে এবং ক্রমে দানাদার আকারের হয়। ব্লাস্টোসিল ব্লাস্টুলায় রূপান্তরিত হয়। এর মধ্যে মাঝ বরাবর মুখের আবির্ভাব ঘটে যেগুলি পাশের কোষগুলিকে শোষণ করে নেয়। ব্লাস্টুলার এই অবস্থাকে বলা হয় স্টোমোব্লাস্টুলা (stomoblastula)। ব্লাস্টুলার ইন্‌ভারসান ঘটে এবং ফলে ফ্লাজেলাযুক্ত কোষগুলি বাইরে বেরিয়ে আসে।

ভ্রূণের এই দশাকে **অ্যাম্ফিব্লাস্টুলা** (amphiblastula) বলে। এটি একটি দৃষ্টান্তমূলক (typical) ক্যালকেরিয়াস লার্ভা। এই লার্ভা মাতৃ স্পঞ্জ বা স্কাইফা থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে। এই লার্ভায় থাকে ক্ষুদ্র সরু ফ্লাজেলাযুক্ত কোষ এবং বড় গোল দানাদার কোষ। স্বাধীনভাবে এই লার্ভা দশা কিছুক্ষণ বা কয়েকঘণ্টা চলার পর লার্ভার গ্যাস্ট্রুলেশান ঘটে। ফলে ফ্লাজেলাযুক্ত কোষগুলির অর্ধেক-এর ইনভ্যাজিনেশান ঘটে অথবা বড় দানাদার কোষগুলির বৃদ্ধি ঘটে। এই অবস্থায় এই লার্ভাটির ব্লাস্টোপোরাল অংশটি কোন শক্ত, দৃঢ় বস্তুর সঙ্গে আবদ্ধ হয়। এরপর ক্রমশ এটি পরিবর্তিত হতে শুরু করে এবং সরু নলের মত বা চোঙের মত গঠন সম্পন্ন হয়। অতঃপর ছোট ক্ষুদ্র স্পঞ্জে পরিণত হয়। ফ্লাজেলাযুক্ত কোষগুলি কোয়ানোসাইটে পরিণত হয় এবং দানাদার কোষগুলি বৃদ্ধি পেয়ে ত্বকীয় আবরণ গঠন করে। মেসেনকাইমের কোষ দুটি স্তরের কোষ থেকেই গঠিত হয়। ক্রমশ লম্বাটে চোঙাকৃতি লার্ভাটি পুরু প্রাকারযুক্ত হতে থাকে। পরিস্ফুরণের পর্যায়ে রেডিয়াল ও অন্য নালিকাগুলিরও আবির্ভাব ঘটে। এইরূপে যৌন জনন প্রক্রিয়ায় নতুন স্কাইফার সৃষ্টি হয়।

2.3 কেঁচো *(Pheretima poshthuma)*

কেঁচো অ্যানিলিডা পর্বের, (Phylum Annilida) কিটোপোডা শ্রেণিভুক্ত, অলিগোকিটা বর্গের একটি অমেরুদণ্ডী প্রাণী। আর্দ্র মাটির উপরিভাগে স্ব-নির্মিত গর্তে কেঁচো বসবাস করে। দিবাভাগে নিজ গর্তে এরা লুকিয়ে থাকে। সাধারণত এরা নিশাচর। রাত্রিতে এবং মেঘাচ্ছন্ন দিবাভাগে এদের গর্তের বাইরে চলাফেরা করতে দেখা যায়। মাটিতে অবস্থিত মৃত জৈব পদার্থ এরা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। এরা উভলিঙ্গ প্রাণী। একই প্রাণীর (কেঁচোর) শরীরে স্ত্রী ও পুং জনন তন্ত্র থাকে। তাই একে হারমাফ্রোডাইট (harmaphrodite) বা উভলিঙ্গ প্রাণী বলে।

2.2.1 সাধারণ গঠন (General Organisation)

বহিরাকৃতি

কেঁচো লম্বাটে, সরু, বেলনাকৃতির এবং উভয় প্রান্ত ঈষৎ সূঁচালো। এর সম্মুখ দেহপ্রান্ত সরু, কিন্তু পশ্চাৎ দেহপ্রান্ত কিছুটা ভোঁতা। শরীরের সম্মুখপ্রান্তে মুখ এবং পশ্চাৎ প্রান্তে পায়ু অবস্থিত।

একটি পূর্ণাঙ্গ কেঁচো দৈর্ঘ্যে প্রায় 150 mm লম্বা এবং 3-5 মিলিমিটার (mm) ব্যাসযুক্ত হয় (চিত্র 2.13)। কেঁচোর শরীরের পৃষ্ঠীয় তল বাদামী রঙের কিন্তু অঙ্কীয় তল হাল্কা, ধূসর বর্ণের। একটি দীর্ঘ গাঢ় মধ্যরেখা পৃষ্ঠীয়দেশ বরাবর শরীরের সামনের দিক থেকে পশ্চাৎ প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। কেঁচোর ত্বকে সরু আংটির মত অসংখ্য খাঁজ থাকে। সমস্ত শরীরটি 100-200 টি মেটামেয়ার বা দেহ-খণ্ডকে বিভক্ত। বহিঃখণ্ডকগুলি দেহের অভ্যন্তর পর্যন্ত বিস্তৃত এবং সমস্ত শরীরটি ছোট ছোট প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। কেঁচোর মুখটি সামান্য নীচের দিকে অর্থাৎ অঙ্কীয় তলের দিকে অবস্থান করে। দেহের সম্মুখ প্রান্তে অর্ধচন্দ্রাকৃতি মুখের ছিদ্র দেখা যায়। মুখের উপরিভাগে পৃষ্ঠীয় দিকে প্রোস্টোমিয়াম নামক ক্ষুদ্র মাংসল পিণ্ড দেখা যায়। প্রোস্টোমিয়ামটি প্রথম দেহখণ্ডকের উপরে মুখের ছিদ্রের উপর ঝুলে থাকে এবং ঠোঁটের ন্যায় কাজ করে। দেহের সম্মুখ প্রান্ত থেকে প্রায় 20 মিমি. দূরে ক্লাইটেলাম নামক খণ্ডিত মাংসল ব্যান্ড বা ফিতার মত আস্তরণ দেখা যায়। ক্লাইটেলাম 14, 15 এবং 16 তম দেহখণ্ডকে অবস্থান করে। ক্লাইটেলাম কেঁচোর দেহকে তিনটি সুস্পষ্ট অঞ্চলে বিভক্ত করে। যথা সম্মুখ অংশ বা অগ্রক্লাইটেলার, মধ্যাংশ বা ক্লাইটেলার এবং পশ্চাৎ অংশ বা পোস্ট ক্লাইটেলার অঞ্চল।

চতুর্দশ দেহখণ্ডকের অঙ্কীয় তলের দিকে কেঁচোর স্ত্রী জনন ছিদ্র থাকে (চিত্র 2.13)।

এর অষ্টাদশ দেহখণ্ডকের অঙ্কীয় তলে এক জোড়া ফোলা প্যাপিলাযুক্ত অর্ধচন্দ্রাকৃতি পুংজনন ছিদ্র থাকে। পুং জনন ছিদ্রের সামনে ও পিছনে 17 তম এবং 19 তম দেহখণ্ডকে এক জোড়া করে মোট দুই জোড়া জনন প্যাপিলা (Genital papillae) দেখা যায়। এই কারণে সপ্তদশ থেকে ঊনবিংশ (19th) দেহখণ্ডককে জনন অঞ্চল (genital area) বলা হয়। 5 ও 6, 6 ও 7, 7 ও 8, 8 ও 9 এই চারটি দেহখণ্ডকের সংযোগস্থলে কেঁচোর দেহের অঙ্কীয় তলের দিকে প্রতিটি যুগ্ম, অর্থাৎ মোট আটটি স্পার্মাথিকা ছিদ্র থাকে।

সরু ছুঁচের মতো কাইটিন নির্মিত 'f'-এর ন্যায় আকৃতির সিটা প্রতিটি দেহখণ্ডকের মাঝ বরাবর বৃত্তাকারে কেঁচোর অঙ্গো থাকে। সিটা প্রথম, শেষ দেহখণ্ডকে এবং ক্লাইটেলাম অংশে অনুপস্থিত। সিটা কেঁচোর গমন অঙ্গ হিসাবে কাজ করে।

দেহের দুটি দেহখণ্ডকের মাঝের খাঁজে পৃষ্ঠ মধ্যরেখা বরাবর অতি ক্ষুদ্র পৃষ্ঠ ছিদ্র

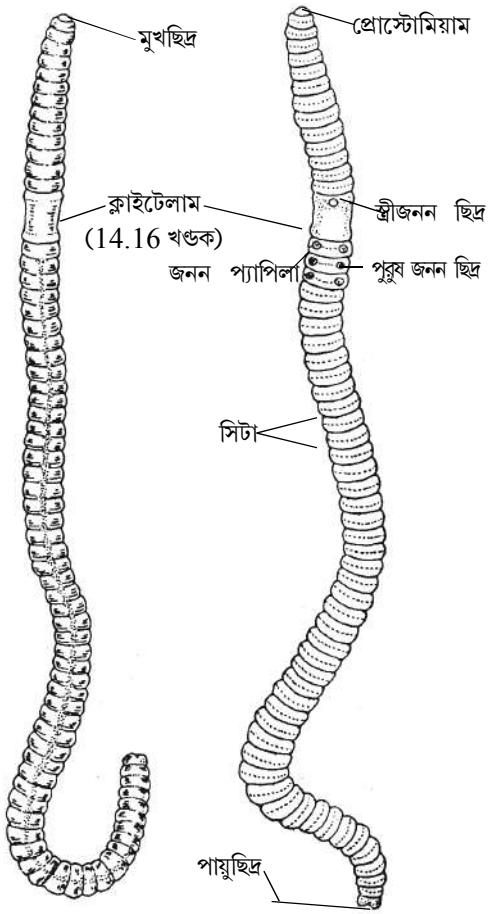

চিত্র 2.13 কেঁচোর বহিরাকৃতি

বর্তমান। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পৃষ্ঠ ছিদ্রগুলি প্রায় সমস্ত আন্তরখণ্ডক খাঁজের মধ্যেই দেখা যায়, ব্যতিক্রম শুধুমাত্র দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ আন্তর দেহখণ্ডক খাঁজ এবং সর্বশেষ খাঁজে। এর দেহের শেষ দেহখণ্ডকের প্রান্তে সরু পায়ু ছিদ্র দেখা যায়। শরীরের প্রথম দুটি দেহখণ্ডক ব্যতীত সমগ্র দেহখণ্ডকেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নেফ্রিডিওপোর বা নেফ্রিডিয় ছিদ্র দেখা যায়, যা রেচন পদার্থ বহিষ্কারে সহায়তা করে।

2.3.2 মেটামেরিজম (Metamerism)

কেঁচো দ্বিপার্শ্বীয়ভাবে প্রতিসম অঙ্গ্যুরীমল প্রাণী। এর শরীরের অনুদৈর্ঘ্য ব্যবচ্ছেদে (Longitudinal section) শরীরের একই ধরনের অন্তর গঠন দেখা যায়। বহিরাগতভাবে এবং অন্তর গঠনের এই সাদৃশ্যকে মেটামেরিজম বলা হয়।

কেঁচোর দেহের অনুদৈর্ঘ্য ছেদে সমস্ত অঙ্গ, যথা—পেশী সংস্থান, সিটা, রক্তবাহ, স্নায়ু, স্নায়ুগ্রন্থি, রেচনতন্ত্র, জননতন্ত্র প্রভৃতি প্রত্যেকটি অঙ্গেরই পুনঃপুন ছেদ দেখা যায়। এমনকি সিলোমের গঠনের পুনরাবৃত্তিও দেখা যায়। কেবলমাত্র পৌষ্টিকতন্ত্র এই মেটামেরিজমের ব্যতিক্রম।

2.3.3 কেঁচোর গমন (Locomotion)

কেঁচোর গমন সম্পন্ন হয় 'সিটা' নামক গমন অঙ্গ ও অনুদৈর্ঘ্য এবং অনুপ্রস্থ পেশীর সহায়তায়।

সিটা (Setae) :

প্রথম, শেষ এবং ক্লাইটেলাম অংশের খণ্ডক ব্যতীত কেঁচোর প্রতিটি দেহখণ্ডকে আংটির মত সজ্জায় সিটা দেখা যায়। প্রতিটি সিটা স্ক্লেরোপ্রোটিন নির্মিত সরু ফলার মত শক্ত কাইটিনাস গঠন যুক্ত হয়। এটা হাল্‌কা হলুদ রঙের এবং ইংরাজী 'f' অক্ষরের মত গঠনযুক্ত (চিত্র)। এপিডারমাল গর্তে প্রোথিত পশ্চাৎ প্রান্ত সূঁচালো ও অগ্রপ্রান্ত ভোঁতা এবং মধ্যাংশ পর্বযুক্ত মোটা অংশ সমৃদ্ধ। প্রতিটি সিটা সিটাল থলিতে (Setal sac) অবস্থিত।

গমন পদ্ধতি (Mechanism of Locomotion) :

সংকোচন, প্রবর্ধন এবং নোঙর (anchoring) পদ্ধতিতে কেঁচোর গমন সম্পন্ন হয়। গমনের শুরুতে কেঁচো শরীরের পশ্চাৎ ভাগের সিটাগুলিকে গমনতলের উপরিভাগের সঙ্গে শক্তভাবে আটকে দেয়। একে বলে নোঙর করণ বা anchoring । এরপর কেঁচোটি অনুপ্রস্থ পেশীর (circular muscle) সংকোচনের ফলে শরীর-এর অভ্যন্তরস্থ তরলের উপর চাপ সৃষ্টি করে। সেই বলের প্রভাবে শরীরের সম্মুখ ভাগের অনুদৈর্ঘ্য পেশীগুলির প্রসারণ ও প্রবর্ধন ঘটে এবং শরীরের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায় ও ঐ অংশটি সরু হয়ে যায়। ফলে কেঁচোর শরীর সামনের দিকে কিছুটা এগিয়ে যায়।

এরপর কেঁচোটি দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রসারিত সম্মুখ দেহাংশে অবস্থিত অঙ্কীয় সিটাগুলি গমনতলের উপরিভাগে দৃঢ়ভাবে আটকে দেয়। বিপরীত দিকে দেহের পশ্চাৎ অংশের আটকানো সিটাগুলোর সক্রিয়তা হারিয়ে পশ্চাৎ দেহাংশটির প্রসারণ ঘটায় এবং সম্মুখ দেহাংশের সংকোচন ঘটায়। ফলে পশ্চাৎ দেহাংশ কিছুটা সামনের দিকে এগিয়ে যায়। এইভাবে পর্যায়ক্রমিক পশ্চাৎ দেহাংশ, অগ্র দেহাংশ এবং সিটার সংকোচন, প্রসারণ এবং আবদ্ধন প্রক্রিয়ায় কেঁচোর গমন সম্পন্ন হয়।

2.3.4 কেঁচোর সংবহন (Circulation)

কেঁচোর দেহে বন্ধ সংবহন তন্ত্র দেখা যায়। এর রক্ত সংবহন তন্ত্র প্রধানত রক্ত, রক্তনালী এবং শাখানালী নিয়ে গঠিত (চিত্র 2.4)।

A. রক্ত (Blood) :

কেঁচোর রক্তের রঙ লাল। রক্ত গঠিত হয় রক্তরস ও রক্তকণিকা নিয়ে। কেঁচোর রক্তরসে হিমোগ্লোবিন নামে লৌহ গঠিত শ্বসন রঞ্জক এবং বিভিন্ন জৈব ও অজৈব পদার্থ দ্রবীভূত থাকে। কেঁচোর রক্তকণিকা বর্ণহীন, নিউক্লিয়াসযুক্ত এবং মেরুদণ্ডী প্রাণীদের শ্বেতরক্ত কণিকার মত। এর পাঁচ প্রকার রক্তকণিকা থাকে। যথা ইলিওসাইট (4%), গ্র্যানুলোসাইট (6%), ফ্রাইব্রোসাইট (5%), বড় অ্যামিবোসাইট (25%) এবং ক্ষুদ্র/ছোট অ্যামিবোসাইট (60%)। রক্তের মাধ্যমে খাদ্যরস এবং অক্সিজেন দেহের বিভিন্ন কোষে সঞ্চালিত হয় এবং দেহকোষ থেকে উৎপাদিত কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও বিভিন্ন রেচন পদার্থ নির্দিষ্ট অঙ্গে প্রেরিত হয়।

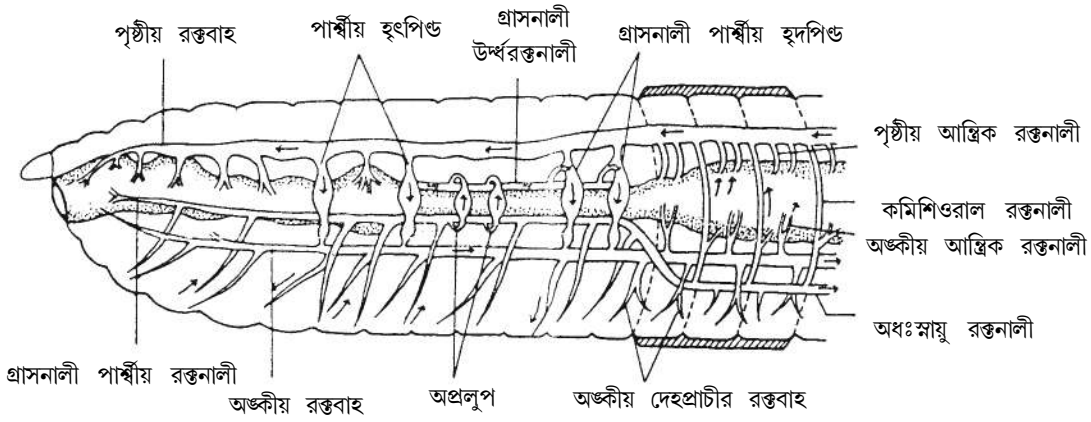

চিত্র 2.14. কেঁচোর সংবহন তন্ত্র

B. রক্তনালী বা রক্তবাহ (Blood vessel) :

কেঁচোর রক্তনালীর বিন্যাস জটিল। এর দেহের প্রথম 13 টি দেহখণ্ডক ও পরবর্তী দেহখণ্ডকের রক্তনালীর বিন্যাসের তারতম্য দেখা যায়। কেঁচোর রক্তবাহগুলিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা— (a) অনুদৈর্ঘ্য রক্তবাহ, (b) পার্শ্বীয় রক্তবাহ এবং (c) আন্ত্রিক রক্ত জালিকা (চিত্র 2.14)।

(a) অনুদৈর্ঘ্য রক্তবাহ (Longitudinal blood vessel)

এই ধরনের রক্তবাহগুলি লম্বালম্বিভাবে দেহে প্রবাহিত। এরা বিভিন্ন প্রকারের হয়। যেমন—

(i) পৃষ্ঠীয় রক্তবাহ (Dorsal)

(ii) অঙ্কীয় রক্তবাহ (Ventral)
(iii) গ্রাসনালী পার্শ্বীয় (Lateral oesophageal)
(iv) অধঃস্নায়ু (Sub-neural)
(v) গ্রাসনালী উর্ধ্ব (Supra oesophageal)

(i) পৃষ্ঠীয় রক্তবাহ (Dorsal, Blood Vessel) :

এটি কেঁচোর শরীরের দীর্ঘতম রক্তনালী ; পৌষ্টিক নালীর উপর দেহের পৃষ্ঠমধ্যরেখা বরাবর দেহের সামনে থেকে পিছন পর্যন্ত প্রসারিত। এই রক্তনালীর প্রাকার পুরু, পেশীবহুল, সংকোচনশীল এবং নালীর অভ্যন্তরে প্রতি দেহখণ্ডকে একজোড়া করে কপাটিকা (valve) থাকে। এর মাধ্যমে রক্ত দেহের পশ্চাৎভাগ থেকে সম্মুখভাগে প্রবাহিত হয়।

13 তম দেহখণ্ডকের পরের খণ্ডকগুলিতে এই রক্তনালীটি সংগ্রাহী নালিকারূপে কাজ করে। প্রতিটি খণ্ডক অন্ত্র থেকে যুগ্ম পৃষ্ঠীয় আন্ত্রিক রক্তনালী এবং অধঃস্নায়ু রক্তনালিকা থেকে এক জোড়া কমিশিওরাল রক্তনালীর মাধ্যমে রক্ত সংগ্রহ করে। দেহের 13 তম খণ্ডকের সামনের দিকের অংশে এই নালী খাদ্যনালীর অগ্রাংশে এবং হৃৎপিণ্ডের মাধ্যমে অঙ্কীয় রক্তবাহে রক্ত সরবরাহ করে। এই রক্তনালী তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং অষ্টম দেহখণ্ডকে এক জোড়া করে ছোট, মোটা—স্পন্দনশীল শাখা বিস্তার করে, যাদের মাধ্যমে রক্ত নেফ্রিডিয়া, গ্রাসনালী এবং গিজার্ডে প্রবাহিত হয়।

(ii) অঙ্কীয় রক্তবাহ (Ventral Blood Vessel) :

এটিও দেহের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত লম্বা রক্তনালী। এটি দেহপ্রাকার এবং পৌষ্টিক নালীর মাঝে অঙ্কীয় মধ্যরেখা বরাবর অবস্থান করে। এর প্রাকার অপেক্ষাকৃত পাতলা, অসংকোচনশীল ও কপাটিকা বিহীন। এই রক্তনালীর মাধ্যমে দেহের পশ্চাৎদিকে এবং বিভিন্ন অঙ্গে রক্ত প্রবাহিত হয়।

এই নালী প্রতিটি দেহখণ্ডকে একজোড়া অঙ্কীয় দেহপ্রাকার রক্তবাহের মাধ্যমে ত্বকীয় নেফ্রিডিয়া, দেহপ্রাকার খণ্ডক ব্যবধায়ক পর্দা এবং জনন অঙ্গে রক্ত সরবরাহ করে।

13 তম খণ্ডকের পরের দেহখণ্ডকগুলিতে, প্রতি খণ্ডকে অঙ্কীয় দেহপ্রাকার রক্তবাহ থেকে একটি ছোট সেপ্টোনেফ্রিডিয়াল শাখা বের হয়, যা ব্যবধায়ক নেফ্রিডিয়াতে রক্ত সরবরাহ করে। 13 তম খণ্ডকের পরের দেহখণ্ডকগুলিতে প্রতি দেহখণ্ডকে অঙ্কীয় রক্তবাহ থেকে একটি করে অঙ্কীয় আন্ত্রিক নালী (Ventro-intestinal vessel) উৎপন্ন হয়ে অন্ত্রে রক্ত সরবরাহ করে।

(iii) গ্রাসনালী পার্শ্বীয় রক্তনালী (Lateral oesophageal blood vessel) :

এরা সংখ্যায় দুটি। গ্রাসনালীর দুই পাশে দেহের অগ্রপ্রান্ত থেকে 13 তম দেহখণ্ডক পর্যন্ত প্রসারিত। এই রক্তনালীতে প্রতিটি দেহখণ্ডকে এক জোড়া করে অঙ্কীয় দেহপ্রাকার রক্তনালী মিলিত হয়। যাদের মাধ্যমে দেহপ্রাকার ব্যবধায়ক পর্দা, নেফ্রিডিয়া এবং জনন অঙ্গ থেকে রক্ত সংগৃহীত হয়। রক্ত পিছনের দিকে প্রবাহিত হওয়ার সময় কিছু রক্ত দেহের দশম ও একাদশ দেহখণ্ডকে অবস্থিত এক

জোড়া অগ্রলুপের (anterior loop) মাধ্যমে গ্রাসনালী ঊর্ধ্ব রক্তনালীতে (supra oesophageal vessel) প্রবাহিত হয়। অবশিষ্ট রক্ত অধঃস্নায়ু রক্তনালীতে প্রবাহিত হয়।

(iv) অধঃস্নায়ু রক্তবাহ (Sub neural blood vessel) :

এটি অপেক্ষাকৃত সরু রক্তনালী। অঙ্কীয় স্নায়ুরজ্জুর ঠিক নীচে অবস্থান করে। এই রক্তনালীটি দেহের চতুর্দশ (14 th) দেহখণ্ডক থেকে দেহের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। দুটি গ্রাসনালী ও পার্শ্বীয় রক্তনালীর মিলনে এটি গঠিত হয়। এটি অঙ্কীয় স্নায়ুরজ্জু এবং অঙ্কীয় দেহপ্রাকার থেকে শাখানালীর মাধ্যমে রক্ত সংগ্রহ করে পিছনের দিকে প্রেরণ করে। প্রতিটি দেহখণ্ডকে এক জোড়া কমিশিওরাল রক্তনালীর মাধ্যমে এই রক্তনালী থেকে রক্ত পৃষ্ঠীয় রক্তবাহে প্রবাহিত হয়।

(v) ঊর্ধ্ব গ্রাসনালী রক্তবাহিকা (Supra-oesophageal blood vessel) :

এটি ছোট, পাতলা প্রাকারযুক্ত একটি সংগ্রাহী রক্তনালী। এটি পাকস্থলীর মধ্যপৃষ্ঠীয় অংশে থাকে এবং দেহের নবম থেকে ত্রয়োদশ দেহখণ্ডকে অবস্থান করে। এই রক্তনালীটি অগ্রলুপ দ্বারা গ্রাসনালী পার্শ্বীয় রক্তনালীতে সংযুক্ত থাকে। দুই জোড়া গ্রাসনালী-পার্শ্বীয় রক্তনালী হৃৎপিণ্ডের সাহায্যে অঙ্কীয় রক্তবাহের সঙ্গে যুক্ত থাকে। এটি পাকস্থলী, গিজার্ড প্রভৃতি থেকে রক্ত সংগ্রহ করে এবং গ্রাসনালী পার্শ্বীয় হৃৎপিণ্ডের মাধ্যমে পাম্প করে অঙ্কীয় রক্তবাহে প্রেরণ করে।

(b) পার্শ্বীয় রক্তবাহিকা (Lateral blood vessel) :

অনুদৈর্ঘ্য রক্তবাহগুলি প্রধানত অসংখ্য পার্শ্বীয় রক্তবাহ দ্বারা পরস্পর যুক্ত থাকে।

(i) **হৃৎপিণ্ড**— প্রতিপাশে দুই জোড়া হিসাবে এদের সংখ্যা আটটি। সপ্তম ও নবম দেহখণ্ডকের প্রতিপাশে অবস্থিত একজোড়া হৃৎপিণ্ড পৃষ্ঠীয় ও অঙ্কীয় অনুদৈর্ঘ্য রক্তবাহ দুটির সঙ্গে যুক্ত। এদের পার্শ্বীয় হৃৎপিণ্ড বলা হয় (চিত্র 2.14)। অপর এক জোড়া হৃৎপিণ্ড দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ দেহখণ্ডকে থাকে। এই যুগ্ম হৃৎপিণ্ড দুটি পৃষ্ঠীয় এবং অঙ্কীয় রক্তবাহ ছাড়া উর্ধ্বগ্রাসনালী রক্তবাহের সঙ্গেও সংযুক্ত। এদের পার্শ্বীয় গ্রাসনালী হৃৎপিণ্ড বলে।

(ii) অগ্রলুপ—কেঁচোর দেহের প্রতি পাশে একজোড়া অগ্রলুপ দশম ও একাদশ খণ্ডকে ঊর্ধ্বগ্রাসনালী ও পার্শ্বীয় গ্রাসনালী রক্তবাহের সঙ্গে যুক্ত হয়।

(iii) অঙ্গুরী রক্তবাহ (Ring vessel) : পাকস্থলীর পেশী স্তরের মধ্যে অবস্থিত এবং প্রতি দেহখণ্ডকে প্রায় 12 টি আংটির মতো রক্তনালী থাকে। এর মাধ্যমে গ্রাসনালী পার্শ্বীয় রক্তনালী থেকে রক্ত, ঊর্ধ্বগ্রাসনালী রক্তবাহিকাতে পৌঁছায়।

(iv) কমিশিওরাল (Commissural) রক্তনালী : আন্ত্রিক অঞ্চলে প্রতিটি দেহখণ্ডকে অধঃস্নায়ু রক্ত বাহের সঙ্গে পৃষ্ঠীয় রক্তবাহের একজোড়া কমিশিওরাল রক্তবাহ দ্বারা সংযোগ সাধিত হয় (চিত্র 2.14)।

(v) অঙ্কদেহ প্রাকার রক্তবাহ—অঙ্কীয় রক্তবাহ থেকে অধঃত্বকীয় রক্তবাহ দেহত্বক, নেফ্রিডিয়া, জননঅঙ্গ, ও সেপ্টাল প্রাকারে রক্ত সরবরাহ করে।

(vi) পৃষ্ঠ আন্ত্রিক রক্তবাহ দ্বারা রক্ত অন্ত্রের গাত্র থেকে পৃষ্ঠীয় রক্তবাহে পরিবাহিত হয়।

c) আন্ত্রিক রক্তজালিকা :

বিভিন্ন রক্তবাহগুলি ছাড়াও অন্ত্রের গাত্রে প্রচুর আন্ত্রিক রক্তজালিকা অবস্থান করে। এরা দুই প্রকার—বহিঃস্থ জালিকা এবং অন্তঃস্থ জালিকা। এরা অঙ্কীয় আন্ত্রিক ও পৃষ্ঠীয় আন্ত্রিক রক্তবাহের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

C. রক্ত উৎপাদনকারী গ্রন্থি :

4,5,6 দেহখন্ডকে, গলবিলের পৃষ্ঠদেশে, লালাগ্রন্থি সংলগ্ন কেঁচোর শরীরের এক বিশেষ অঙ্গাসমূহে ছোট ছোট ফলিক্‌ল্‌ অবস্থান করে। এই ফলিক্‌লগুলি কেঁচোর রক্তকণিকা ও হিমোগ্লোবিন উৎপন্ন হতে সাহায্য করে।

D. কেঁচোর রক্ত সংবহন পদ্ধতি :

কেঁচোর পৃষ্ঠীয় রক্তবাহের মাধ্যমে রক্ত দেহের পিছনের দিক থেকে সামনের দিকে প্রবাহিত হয় এবং অঙ্কীয় রক্তবাহ, গ্রাসনালী, পার্শ্বীয়, ঊর্ধ্বগ্রাসনালী রক্তবাহিকা ও অধঃস্নায়ু রক্তবাহিকার মাধ্যমে রক্ত দেহের অগ্রপ্রান্ত থেকে পশ্চাৎ প্রান্তের দিকে প্রবাহিত হয়।

ছকের সাহায্যে কেঁচোর রক্ত সংবহন পথ দেখানো হ'ল।

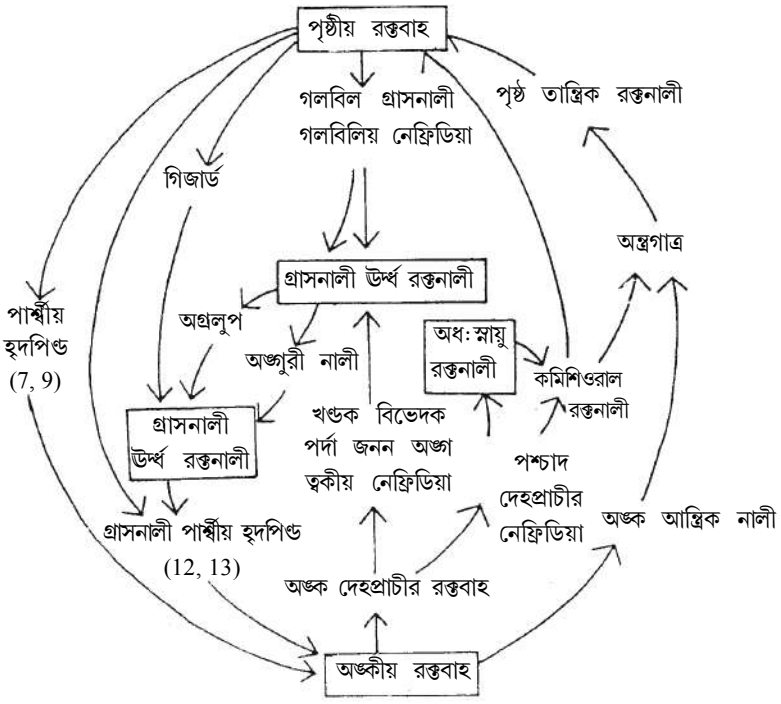

কেঁচোর সংবহন গতিপথের চিত্ররূপ

2.3.5 রেচন (Excretion)

কেঁচোর বিপাকীয় নাইট্রোজেনযুক্ত বর্জ্য পদার্থ বা রেচন পদার্থে বিমোচন ঘটে নেফ্রিডিয়ার মাধ্যমে অর্থাৎ কেঁচোর রেচন অঙ্গের নাম নেফ্রিডিয়া। অবস্থান অনুযায়ী কেঁচোর নেফ্রিডিয়াগুলিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—(1) সেপ্টাল, (2) গলবিলীয় এবং (3) ত্বকীয়। নেফ্রিডিয়া ছাড়া কেঁচো ক্ষুদ্রান্ত্রের পেরিটোনিয়াম কোষস্তর থেকে সৃষ্ট ক্লোরাগোজেন কোষ (Chloragogen cell) গুলিও কেঁচোর রক্ত থেকে উৎপন্ন রেচন পদার্থগুলি দূরীকরণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

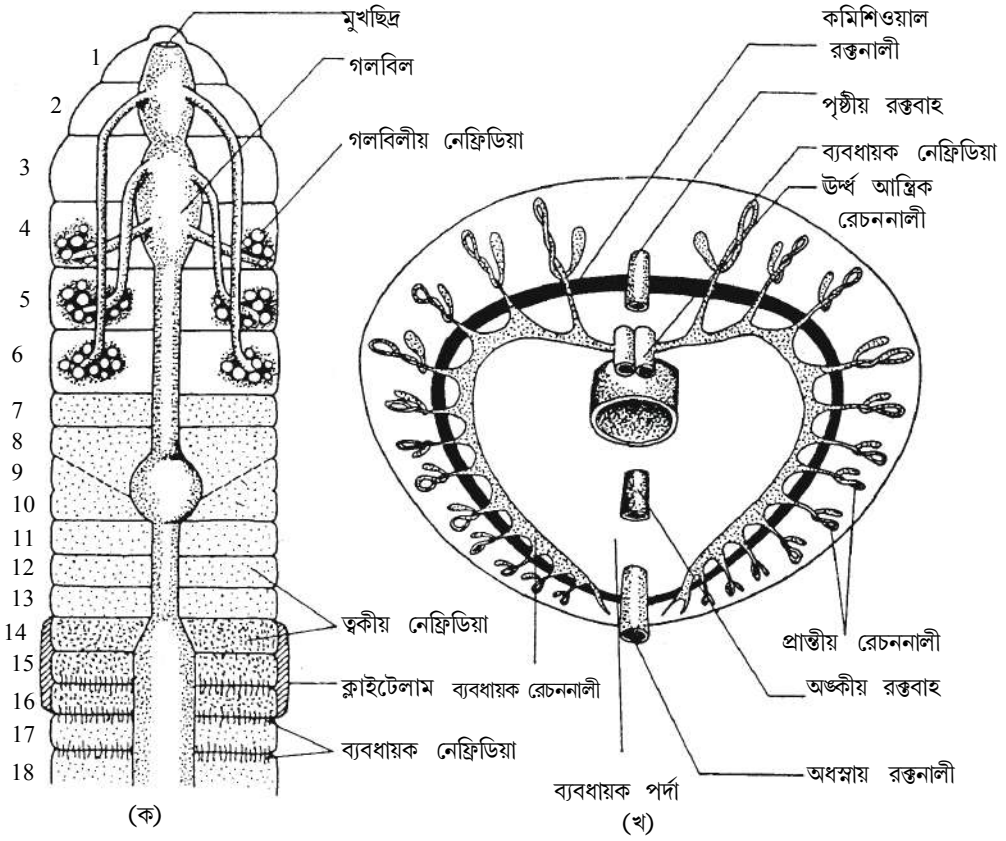

চিত্র 2.15: কেঁচোর রেচন তন্ত্র
(ক) বিভিন্ন প্রকার নেফ্রিডিয়ার অবস্থান, (খ) ব্যবধায়ক নেফ্রিডিয়া (Septal nephridia)এবং অন্ত্রের মধ্যে সম্পর্ক

(i) সেপ্টাল নেফ্রিডিয়া (Septal nephridia) :

কেঁচোর দেহের পঞ্চদশ খণ্ডকের পরবর্তী দেহখণ্ডক ব্যবধায়ক পর্দাগুলির প্রতি পাশে প্রায় 80–100টি সেপ্টাল নেফ্রিডিয়া থাকে (চিত্র : 2.15, 2.16)।

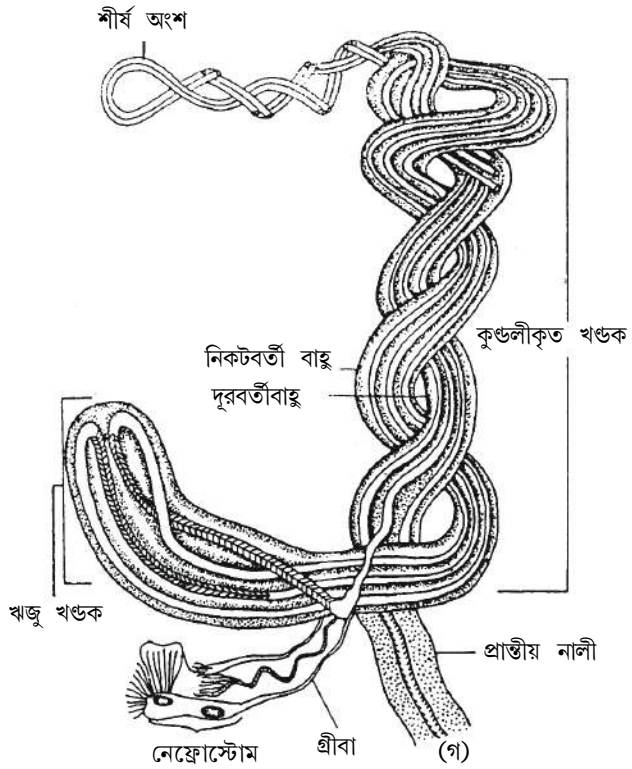

চিত্র 2.16: (গ) ব্যবধায়ক নেফ্রিডিয়া

গঠন : প্রতিটি সেপ্টাল নেফ্রিডিয়া চারটি অংশ নিয়ে গঠিত। ফানেল আকৃতির নেফ্রোস্টোম, ছোট গ্রীবা, দেহ এবং প্রান্তীয় নালী। নেফ্রোস্টোম সিলিয়া দ্বারা পরিবেষ্টিত ফানেলাকৃতি অংশ। এটি কেঁচোর দেহগহ্বরে থাকে এবং একটি ছোট গ্রীবা অংশ দ্বারা সংযুক্ত নেফ্রিডিয়া দেহের সঙ্গে যুক্ত। দেহাংশটির দুটি অংশ—একটি ঋজু অংশ এবং অপরটি কুণ্ডলীকৃত প্যাঁচানো অংশ। কুণ্ডলীকার অংশে নেফ্রিডিয়ার নালীটি প্যাঁচানোভাবে পরস্পর আবদ্ধ থাকে। প্রান্তীয় নালীটি অপেক্ষাকৃত সরু এবং খর্ব দৈর্ঘ্যের। প্রান্তীয় নালীটি ব্যবধায়ক রেচন নালীতে (Septal excretory canal) মিলিত হয়। ডান ও বাম দিকের ব্যবধায়ক রেচন নালী দুটি কেঁচোর অন্ত্রের পৃষ্ঠীয়দেশ বরাবর অবস্থিত একজোড়া অগ্র আন্ত্রিক রেচননালীতে (Supra intestinal excretory duct) মুক্ত হয়। এই শেষের রেচননালী দুটি প্রতিটি দেহখণ্ডকে ক্ষুদ্র অনুনালিকা (ductule) দ্বারা অন্ত্রে উন্মুক্ত হয়। দেহের বাইরে সরাসরি উন্মুক্ত না হয়ে যেহেতু প্রত্যক্ষভাবে সরাসরি পৌষ্টিক নালীতে সেপ্টাল নেফ্রিডিয়া মুক্ত হয় সেইজন্য সেপ্টাল নেফ্রিডিয়াকে এন্টারোনেফ্রিক প্রকৃতির বলা হয়।

(ii) গলবিলীয় নেফ্রিডিয়া (Pharyngeal nephridia) :

এই প্রকারের নেফ্রিডিয়া কেঁচোর চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ দেহখণ্ডকে যুগ্ম (জোড়া) গুচ্ছ হিসাবে বিন্যস্ত

থাকে। প্রতিটি গুচ্ছে অসংখ্য নেফ্রিডিয়া বর্তমান। এই ধরনের নেফ্রিডিয়ার নেফ্রোস্টোম থাকে না। অন্যান্য সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলি সেপ্টাল নেফ্রিডিয়ারই মতো। এক্ষেত্রে নেফ্রিডিয়ার প্রান্তীয় নালীগুলি একটি সাধারণ নালীতে পরিণত হয়ে কেঁচোর গলবিলে উন্মুক্ত হয়।

(iii) ত্বকীয় নেফ্রিডিয়া (Tegumental nephridia) :

কেঁচোর প্রতিটি দেহখণ্ডকে প্রায় 200-250টি এই প্রকার নেফ্রিডিয়া দেখা যায়। এই ধরনের নেফ্রিডিয়াগুলি সরাসরি নেফ্রিডিওপোর দ্বারা দেহের বাইরে উন্মুক্ত থাকে। এদেরও কোন নেফ্রোস্টোম থাকে না। যেহেতু নেফ্রিডিয়া সরাসরি দেহের বাইরে উন্মুক্ত হয় সেইজন্য এদের প্রকৃতি এক্সোনেফ্রিক (Exonephric)।

রেচন প্রক্রিয়া :

প্রথমে নেফ্রিডিয়াগুলিতে রক্ত এবং দেহগহ্বররস থেকে নাইট্রোজেনযুক্ত রেচন পদার্থ সংগৃহীত হয়। এরপর সংগৃহীত ও উৎপাদিত রেচন পদার্থগুলি সরাসরি ত্বকীয় নেফ্রিডিয়ার মাধ্যমে শরীরের বাইরে অথবা পৌষ্টিক নালীতে নিক্ষিপ্ত হয় (সেপ্টাল ও গলবিলীয় নেফ্রিডিয়ার মাধ্যমে)। পৌষ্টিক নালীর প্রাকার দ্বারা জলীয় অংশ পুনঃশোষণের পর (নাইট্রোজেন বিহীন) নাইট্রোজেনযুক্ত রেচন পদার্থগুলি বর্জ্য পদার্থের সঙ্গে পায়ু ছিদ্র দ্বারা দেহ থেকে নিষ্কাশিত হয়।

2.3.6 জনন (Reproduction)

কেঁচো উভলিঙ্গ প্রাণী অর্থাৎ একই দেহে পুরুষ ও স্ত্রী জনন তন্ত্র বর্তমান। এদের স্বনিষেক ঘটে না, পরনিষেকের মাধ্যমে যৌন জনন সম্পন্ন হয়। কেঁচোর শুক্রাশয় আগে পরিণতি প্রাপ্ত হয় এবং পরে স্ত্রী-জনন তন্ত্রের উৎপত্তি ঘটে। সঙ্গমকালে পরিণত শুক্রাণু অপর একটি কেঁচোর দেহে স্থানান্তরিত হয়।

পুংজনন তন্ত্র (Male reproductive system) :

কেঁচোর পুং জনন তন্ত্রের অঙ্গগুলি হল—শুক্রাশয়, শুক্রথলি, শুক্রধানী, শুক্রচুঙ্গী, শুক্রনালী, প্রস্টেট গ্রন্থি এবং আনুষঙ্গিক গ্রন্থি। কেঁচোর দেহে দশম ও একাদশ দেহখণ্ডকের অঙ্কীয় দেশের মধ্যরেখার দুই পাশে দুই জোড়া শুক্রাশয় দেখা যায়। প্রতি জোড়া শুক্রাশয় একটি পাতলা প্রাকারযুক্ত থলির মধ্যে আবৃত থাকে। এই থলিগুলিকে বলা হয় শুক্রাশয় থলি (testis sac)। দেহের দশম এবং একাদশ দেহখণ্ডকে মোট দুটি শুক্রাশয় থলি অবস্থিত। প্রতিটি শুক্রাশয় থলির ভিতরের সিলোমিক তরলে একজোড়া শুক্রাশয় এবং একজোড়া সিলিয়াযুক্ত শুক্রচুঙ্গী অবস্থিত (চিত্র 2.17)।

শুক্রথলি (Seminal Vesicle) :

দেহের একাদশ এবং দ্বাদশ খণ্ডকে দুই জোড়া বৃহাদাকার সাদা শুক্রথলি অবস্থিত। দশম ও একাদশ খণ্ডকের শুক্রাশয় থলি যথাক্রমে একাদশ ও দ্বাদশ খণ্ডকে অবস্থিত শুক্রথলির সঙ্গে যুক্ত থাকে। শুক্রথলিগুলি শুক্ররসে পুর্ণ থাকে এবং শুক্রাণুকে পুষ্টি প্রদান করে।

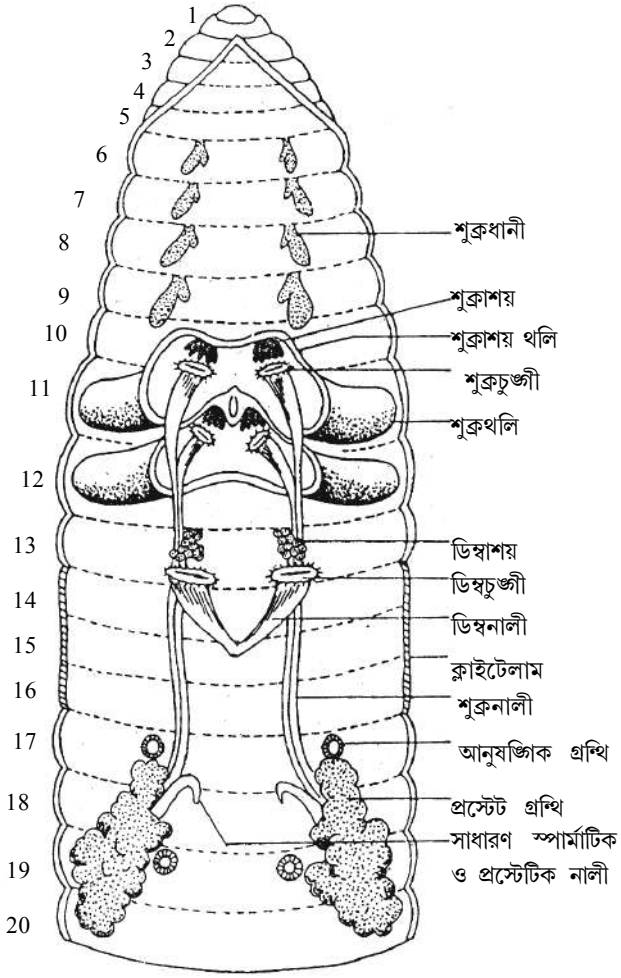

চিত্র 2.17: কেঁচোর জননতন্ত্র

শুক্রাশয়চুঙ্গী (Spermiducal funnel) :

প্রতিটি শুক্রাশয়ের ঠিক নিচে একটি করে মোট দুই জোড়া শুক্রাশয়চুঙ্গী, শুক্রাশয়ের সমখণ্ডকে অবস্থিত এবং ঐ খণ্ডকের শুক্রাশয় থলির মধ্যে আবদ্ধ থাকে।

শুক্রনালী (Vas deferens) :

প্রতিটি শুক্রাশয়চুঙ্গীর পশ্চাৎভাগ একটি সিলিয়াযুক্ত অত্যন্ত সরু নালীর সঙ্গে মিলিত হয়। এদের শুক্রনালী বলে। প্রতি পাশের শুক্রনালী দুটি সংলগ্ন অবস্থায় পাশাপাশিভাবে দেহের পিছনের দিকে বিস্তৃত হয়ে অষ্টাদশ দেহখণ্ডকে শেষ হয়ে প্রস্টেট নালীতে মিলিত হয়। শুক্রাণু পরিবহণ শুক্রনালীর কাজ।

প্রস্টেট গ্রন্থি (Prostate gland) :

কেঁচোর দেহের ষোড়শ অথবা সপ্তদশ দেহখণ্ডক থেকে 20 তম অথবা 21 তম খণ্ডক পর্যন্ত বিস্তৃত, পৌষ্টিকনালীর দুইপাশে অবস্থিত এক জোড়া সাদা রঙের, চ্যাপ্টা, অনিয়তাকার প্রস্টেট গ্রন্থি দেখা যায়। দেহের অষ্টাদশ (18 th) খণ্ডকে প্রতিটি প্রস্টেট গ্রন্থি থেকে একটি করে বাঁকা প্রস্টেট নালী নির্গত হয়। প্রতিটি প্রস্টেট নালী তার উৎপত্তিস্থল থেকে সেই পাশের দুটি ভাস ডিফারেন্স-এর সঙ্গে একটি পেশীবহুল আবরণী দ্বারা আবৃত এবং সাধারণ স্পার্মাটিক ও প্রস্টেটিক নালী গঠন করে। এর অভ্যন্তরে তিনটি নালীই পৃথকভাবে থাকে। এই নালীগুলি 18 তম খণ্ডকে অবস্থিত একজোড়া পুং জনন ছিদ্রের দ্বারা স্বাধীনভাবে দেহের বাইরে উন্মুক্ত হয় (চিত্র 2.17)।

আনুষঙ্গিক গ্রন্থি (Accessory gland) :

দেহের 17 তম এবং 19 তম দেহখণ্ডকে এক জোড়া করে মোট দুই জোড়া বৃত্তাকার সাদা বর্ণের আনুষঙ্গিক গ্রন্থি অঙ্কীয় স্নায়ু রজ্জুর দুই পাশে অঙ্ক-পার্শ্বীয়ভাবে অবস্থান করে। এগুলি নালীর মাধ্যমে 17 তম এবং 19 তম খণ্ডকে, মধ্যঅঙ্কীয় রেখার দুইপাশে দুই জোড়া জনন প্যাপিলাতে উন্মুক্ত হয়। এই গ্রন্থিগুলি সঙ্গমকালে দুটি কেঁচোকে সংলগ্ন হতে সাহায্য করে।

স্ত্রী জনন তন্ত্র (Female reproductive system) :

ডিম্বাশয়, ডিম্বচুঙ্গী, ডিম্বনালী এবং শুক্রধানী নিয়ে কেঁচোর স্ত্রী জনন তন্ত্র গঠিত।

ডিম্বাশয় (ovary) :

ত্রয়োদশ দেহখণ্ডকের অঙ্কীয় দেশে স্নায়ু রজ্জুর উভয়পাশে এক জোড়া ক্ষুদ্রাকৃতি আঙুলের মত শাখা বিশিষ্ট ডিম্বাশয় অবস্থিত। প্রতিটি ডিম্বাশয়ের পশ্চাতে (13-14 দেহখণ্ডকে) একজোড়া খর্বকায় ডিম্বনালী থাকে। ডিম্বনালী সম্মুখ অংশে সিলিয়াযুক্ত ডিম্বচুঙ্গী গঠন করে। বাম ও ডান উভয় পাশের ডিম্বনালী চতুর্দশ খণ্ডকে মিলিত হয়ে অঙ্কীয় দেশে অবস্থিত স্ত্রী জনন ছিদ্রে উন্মুক্ত হয় (চিত্র 2.17)।

শুক্রধানী (Spermatheca) :

ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম ও নবম দেহখণ্ডকে এক জোড়া করে মোট চার জোড়া শুক্রধানী বা স্পার্মাথিকা অবস্থিত। প্রতিটি শুক্রধানী ক্ষুদ্র কলসির আকৃতির এবং একটি ক্ষুদ্র ছিদ্রযুক্ত। দুটি কেঁচোর সঙ্গমকালে শুক্রাণুগুলি ছিদ্র দিয়ে শুক্রধানীতে সঞ্চিত হয়।

কেঁচোর সঙ্গম ক্রিয়া (Copulation of earthworm) :

কেঁচো উভলিঙ্গ প্রাণী হলেও এদের স্বনিষেক সম্পন্ন হয় না। দুটি কেঁচো একত্রিত হয়ে পারস্পরিক পরনিষেক সম্পন্ন করে। সাধারণত বর্ষাকালে নিকটস্থ গর্তের দুটি কেঁচো পাশাপাশি আসে। সাধারণত রাতেই এই ক্রিয়া সম্পন্ন করে। সঙ্গমকালে দুটি কেঁচো পরস্পরের সঙ্গে বিপরীতমুখী অবস্থায় অঙ্কদেশে এমনভাবে সংলগ্ন হয় যাতে একটি কেঁচোর পুং জনন ছিদ্র অপর কেঁচোর স্পার্মাথিকা

ছিদ্রের সঙ্গে সংযুক্ত হয় (চিত্র 2.18)। পুং জনন ছিদ্রের সন্নিহিত অঞ্চল ফুলে উঠে প্যাপিলা গঠন করে। জনন ছিদ্রের মাধ্যমে শুক্রাণুগুলি ক্রমান্বয়ে অপর কেঁচোর স্পার্মাথিকায় প্রবেশ করে ও সঞ্চিত হয়। সঙ্গম ক্রিয়াটি প্রায় এক ঘণ্টাকাল স্থায়ী হয়। এরপর পারস্পরিক শুক্রাণু আদান প্রদানের পর সঙ্গমরত কেঁচো দুটি পৃথক হয়।

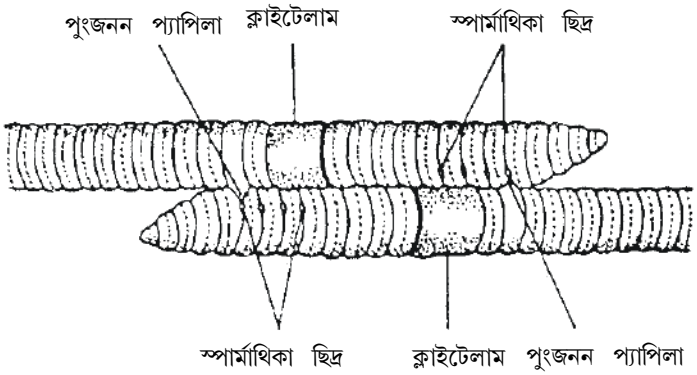

চিত্র 18: সঙ্গমরত দুটি কেঁচোর দেহাংশ

নিষেক ও কোকুন গঠন (Fertilization and cocoon formation) :

সঙ্গমের পর ক্লাইটেলাম এক প্রকার রস ক্ষরণ করে যা বাতাসের সংস্পর্শে কঠিন আবরণরূপে ক্লাইটেলামটিকে ঘিরে অবস্থান করে। একে বলা হয় কোকুন। কোকুন খাদ্যরস সমৃদ্ধ হয়। এরপর স্ত্রী জনন ছিদ্র দিয়ে নির্গত ডিম্বাণু কোকুনে সঞ্চিত হয় এবং দেহপেশীর বিপরীত পেরিস্টলটিক চলনের প্রভাবে কোকুন দেহের সামনের দিকে পরিচালিত হয়। দেহের সম্মুখে স্পার্মাথিকা ছিদ্রের মাধ্যমে অপর কেঁচোটি থেকে সংগৃহীত শুক্রাণু কোকুনে সঞ্চিত হয়। ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর মিলন ও নিষেক প্রক্রিয়াটি কোকুনের ভিতরে সম্পন্ন হয় বলে একে বহিঃনিষেক বলে। অবশেষে কোকুনটি কেঁচোর শরীর থেকে আর্দ্র মাটিতে পরিত্যক্ত হয়। এর পরবর্তী পরিস্ফুরণ সম্পন্ন হয় কোকুনের ভিতরে। একটি কোকুনে একটি মাত্র ভ্রূণের বৃদ্ধি ঘটে। কোকুনগুলি আকারে ক্ষুদ্র, গোলাকার ও হাল্কা হলুদ রঙের হয়। প্রতিটি কোকুনের ভিতরে একাধিক নিষিক্ত ডিম্বাণু থাকলেও কেবলমাত্র একটি ভ্রূণেরই পরিস্ফুরণ ঘটে। কেঁচোর জীবনচক্রে কোন লার্ভা দশা থাকে না অর্থাৎ এদের প্রত্যক্ষ পরিস্ফুরণ (direct development) ঘটে।

2.4 আরশোলা *(Periplaneta americana)*

পেরিপ্লানেটা (Periplaneta) বা আরশোলা (cockroach) আমাদের খুবই পরিচিত একটি পতঙ্গ। একে সাধারণত গৃহস্থালীর পেস্ট হিসাবে গণ্য করা হয়। এটি পর্ব আর্থ্রোপোডা, উপপর্ব ম্যান্ডিবুলেটা, শ্রেণি ইন্সেক্টা ও উপশ্রেণি টেরিগোটার অন্তর্গত একটি স্থলজ পতঙ্গ। সাধারণত বাড়ি-ঘরের চারপাশে যেখানে স্যাঁতসেঁতে পরিবেশ এবং প্রচুর জৈব খাদ্য থাকে তার পাশে রান্না

ঘর, ভাড়ার ঘর ও নর্দমায় এদের দেখা যায়। এরা সাধারণত নিশাচর, রাত্রিতেই এদের গতিবিধি বৃদ্ধি পায়। এরা সব কিছুই খায়।

2.4.1 সাধারণ গঠন (General organisation)

বহিরাকৃতি (External features) :

আরশোলার সমস্ত শরীরটা কাইটিন নির্মিত বাদামী বর্ণের কিউটিকলে আবৃত থাকে। এদের শরীর চারটি সুনির্দিষ্ট অঞ্চলে বিভেদিত। মস্তক, গ্রীবা, বক্ষ ও উদর অঞ্চল (চিত্র)।

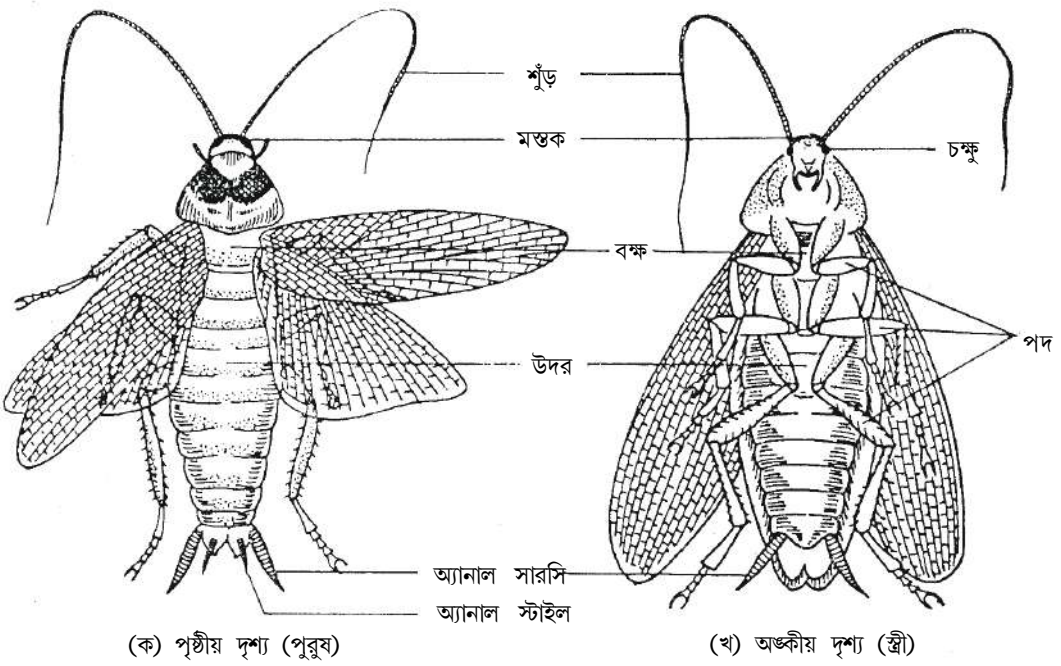

চিত্র 2.19: আরশোলা ; ক-পৃষ্ঠ দৃশ্য, খ-অঙ্কদৃশ্য

মস্তক অঞ্চল (Head) :

আরশোলার মাথাটি ত্রিকোণাকৃতির। সম্মুখ ভাগের অপেক্ষাকৃত সরু প্রান্তটি একটু নীচের দিকে অবদমিত এবং প্রশস্ত প্রান্তটি শরীরের পরবর্তী গ্রীবা অঞ্চলের সঙ্গে সমকোণে সংযুক্ত থাকে। মস্তকে নিম্নলিখিত অংশগুলি দেখা যায়।

(i) মস্তকের সম্মুখ ভাগে মুখছিদ্র আছে। এটিতে কতকগুলি মুখোপাঙ্গ দেখা যায়, যেগুলি মুখটিকে ঘিরে থাকে। মুখটি সম্মুখ পৃষ্ঠ অঞ্চলে লেব্রাম, অঙ্কীয় প্রান্ত অঞ্চলে লেবিয়াম নামক উপাঙ্গ নিয়ে ঊর্ধ্ব ওষ্ঠ ও নিম্ন ওষ্ঠ গঠন করে। লেব্রাম-এর নীচের দুই পাশে

এক জোড়া ম্যান্ডিবল থাকে, যাদের ভিতরের দিক করাতের মত খাঁজ কাটা। এরা খাদ্য কাটায় সাহায্য করে। ম্যান্ডিব্‌ল্‌ দুটির নীচে দুপাশে থাকে দুটি ম্যাক্সিলা, যারা খাদ্য আহরণে আরশোলাকে সাহায্য করে। এরা চোয়ালের কাজ করে। এর মাঝে এদের জিহ্বা বা হাইপোফ্যারিংক্স অবস্থিত (চিত্র 2.20)।

(ii) মস্তকের চুড়ার দুই পাশে বৃক্কাকার দুটি কালো বর্ণের পুঞ্জাক্ষি লক্ষ্য করা যায়।

(iii) চক্ষুর নীচেই দুই দিকে দুটি সরু নলাকৃতি এবং বহু জোড়া যুক্ত অ্যান্টেনা বা শুঙ্গা দেখা যায়।

(iv) শুঙ্গোর নীচেই ম্যাক্সিলা জোড়া অবস্থান করে।

গ্রীবা (Neck) :

আরশোলার গ্রীবা অঞ্চলটি সরু, যা মস্তক ও বক্ষ অংশকে সংযুক্ত করে। গ্রীবা অঞ্চলটি পৃষ্ঠ-তলের দিকে সারভাইকাল স্ক্লেরাইট নামক পাতলা, স্থিতিস্থাপক, বাদামী রঙের কিউটিক্‌ল্‌ দ্বারা আবৃত।

বক্ষ (Thorax) :

আরশোলার বক্ষাঞ্চলটি তিনটি খণ্ডক দিয়ে গঠিত। সামনে থেকে পিছনের দিকে এগুলি হল— প্রোথোরাক্স, মেসোথোরাক্স এবং মেটাথোরাক্স। পৃষ্ঠতলের দিকে টারগাম এবং অঙ্কীয় তলের দিকে স্টারনাম নামক কাইটিন নির্মিত অংশ দ্বারা বক্ষ আবৃত থাকে।

(i) প্রোনোটাম : শিল্ড বা ঢালের আকৃতির শক্ত গঠন প্রোথোরাক্স-এর পৃষ্ঠীয় তলের উপরিভাগে দেখা যায়।

(ii) এর পরের মেসোথোরাক্স অঞ্চলের অগ্রভাগের পার্শ্বদেশের দুই পাশের প্রতি পাশে একটি করে মোট এক জোড়া অস্বচ্ছ, পুরু, বাদামী রঙের এলিট্রা বা অগ্র ডানা সংযুক্ত থাকে।

(iii) পরে মেটাথোরাক্সের টারগাম অঞ্চলের দুইপাশে একটি করে মোট এক জোড়া স্বচ্ছ পাতলা পর্দার মত পশ্চাৎ ডানা সংযুক্ত থাকে।

(iv) প্রতিটি বক্ষাঞ্চলে পাঁচটি খণ্ডাংশযুক্ত এক জোড়া করে মোট তিন জোড়া পদ বক্ষাঞ্চলের অঙ্কদেশে স্টারনাম অংশের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে।

উদর (abdomen) :

উদর অঞ্চল পশ্চাৎ দিকে ক্রমশ সরু হয়ে যায়। উদর অঞ্চলটি দশটি খণ্ডকের সংযোজিত অংশ। প্রতি উদর খণ্ডক পৃষ্ঠীয় দিকে টারগাম ও অঙ্কীয় তলে স্টারনাম দ্বারা আবৃত।

(i) প্রতিটি উদর দেহ খণ্ডক আংশিকভাবে সামনেরটির পশ্চাৎ প্রান্তের সঙ্গে সংযুক্ত।

(ii) নবম ও অষ্টম উদর খন্ডক দুটি সপ্তম উদর খণ্ডক দ্বারা আবৃত।

(iii) পুরুষ আরশোলার ক্ষেত্রে নবম উদর খণ্ডকে স্টারনামের দিকে একজোড়া অ্যানাল স্টাইল দেখা

যায়। যেটি স্ত্রী আরশোলায় অনুপস্থিত।

অ্যানাল স্টাইল দেখে বাহ্যিকভাবে স্ত্রী ও পুরুষ আরশোলা সহজেই পৃথক করা যায়।

(iv) দশম উদর খণ্ডকটির টারগাম পিছনের দিকে সঞ্চরণশীল বা ফ্লেক্সিবল্ প্লেট তৈরি করে এবং মধ্যবর্তী অঞ্চলে একটি গভীর খাঁজ সৃষ্টি করে। এর অঙ্কদেশেই পায়ু ছিদ্র দেখা যায়। পায়ু ছিদ্রের দুই পাশে খণ্ডাংশযুক্ত এক জোড়া অ্যানাল সার্সি দেখা যায়।

(v) জনন ছিদ্রটি পায়ু ছিদ্রের নীচের অঙ্কীয় তলের দিকে অবস্থিত।

(vi) স্টিগমাটা নামক দশ জোড়া শ্বসন ছিদ্র দেখা যায়, যেগুলি আরশোলার বক্ষ ও উদর অঞ্চলের পাশের দিকে অবস্থিত। এই দশ জোড়া শ্বসন ছিদ্রের প্রথম দুই জোড়া বক্ষাঞ্চলের দুই পার্শ্বে এবং বাকী আট জোড়া উদর অঞ্চলের পার্শ্বীয় অংশে অবস্থান করে।

চিত্র 2.20: আরশোলার মুখোপাঙ্গ

2.4.2 শ্বসন তন্ত্র (Respiratory system)

আরশোলার শ্বসন তন্ত্র দশ জোড়া শ্বাসছিদ্র (spiracle), অসংখ্য শ্বাসনালী (trachea) ও শাখা শ্বাসনালী (tracheole) দ্বারা গঠিত।

A. শ্বাসছিদ্র (Spiracle) :

আরশোলার দেহের দুই পাশে মোট দশ জোড়া শ্বাসছিদ্র টারগাম ও স্টারনামের সংযোগস্থলে অবস্থিত। শ্বাসছিদ্রগুলির মধ্যে দুই জোড়া বক্ষে এবং আট জোড়া উদরে অবস্থিত। শ্বাসছিদ্রগুলির মধ্যে রোম থাকে ফলে বাইরে থেকে ধুলো বালি শ্বাসছিদ্রে ঢুকতে পারে না। অন্যদিকে দেহের ভিতরের জলীয় বাষ্প সহজে বার হতে পারে না। এই শ্বাসছিদ্রগুলি ডিম্বাকৃতি, লম্বাভাবে চেরা এবং পেরিট্রিম নামক কাইটিন নির্মিত প্লেট দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে।

(a) বক্ষ শ্বাসছিদ্র (Thoracic spiracles) :

আরশোলার বক্ষের দুই পাশে দুই জোড়া বক্ষ শ্বাসছিদ্র দেখা যায়। অগ্রবক্ষ ও মধ্যবক্ষের সংযোগস্থলে এক জোড়া মধ্যবক্ষ শ্বাসছিদ্র (Mesothoracic spiracle) এবং মধ্যবক্ষ ও পশ্চাৎবক্ষের সংযোগস্থলে অপর এক জোড়া পশ্চাৎবক্ষ শ্বাসছিদ্র (metathoracic spiracle) অবস্থিত। মধ্যবক্ষ শ্বাসছিদ্র দুটির দুটি করে ঢাকনা থাকে। পশ্চাৎ ঢাকনাটি পেশীর সাহায্যে সঞ্চরণশীল এবং শ্বাসছিদ্রকে খুলতে ও বন্ধ করতে সাহায্য করে। পশ্চাৎ বক্ষে শ্বাসছিদ্রের ঢাকনা দুটি প্রায় অর্ধবৃত্তাকার এবং পেশীর সঙ্কোচনের সাহায্যে এরা শ্বাসছিদ্রকে বন্ধ করতে পারে। বক্ষ শ্বাসছিদ্রগুলি সরাসরি ট্রাকিয়া বা শ্বাসনালী দ্বারা উন্মুক্ত হয়।

(b) উদর শ্বাসছিদ্র (Abdominal spiracles) :

আরশোলার দেহের প্রথম উদর খণ্ডক থেকে অষ্টম উদর খণ্ডক পর্যন্ত, প্রতিটি উদর খণ্ডকের প্রতি পাশে একটি করে মোট আট জোড়া উদর শ্বাসছিদ্র দেখা যায়। এই উদর শ্বাসছিদ্রগুলিতে কোনো ঢাকনা থাকে না এবং এগুলি বক্ষ শ্বাসছিদ্রের তুলনায় ছোট। প্রতিটি উদর শ্বাসছিদ্রে পরপর দুটি ছিদ্র থাকে। বাইরের ছিদ্রটি অ্যাট্রিয়াল ছিদ্র নামে পরিচিত। অ্যাট্রিয়াম (atrium) নামক প্রকোষ্ঠে এই অ্যাট্রিয়াল ছিদ্রটি উন্মুক্ত হয়। অ্যাট্রিয়ামের শেষ ভাগে আর একটি ছিদ্র দেখা যায় যেটি শ্বাসনালীর সঙ্গে যুক্ত থাকে। এই ছিদ্রটি দুটি পেশীর সাহায্যে খোলা ও বন্ধ করা যায়।

শ্বাসছিদ্রের বন্ধ ও খোলা আংশিকভাবে স্নায়ু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। খোলা-বন্ধের দ্রুততা ও স্থায়ীত্ব নির্ভর করে রক্তে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণের উপর।

B. শ্বাসনালী (Trachea) ও শাখা শ্বাসনালী (Tracheole)

শ্বাসছিদ্র থেকে যে রূপালী রঙের নলের মতো বায়ুপূর্ণ নালীগুলি উৎপন্ন হয় তাদের শ্বাসনালী বলে (চিত্র 2.21)। বিভিন্ন শ্বাসনালীগুলি শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে এবং পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি জটিল শ্বাসনালী তন্ত্র (tracheal system) গঠন করে। তিন জোড়া অনুদৈর্ঘ্য শ্বাসনালী, অসংখ্য খণ্ডক শ্বাসনালী এবং শাখা শ্বাসনালী দ্বারা আরশোলার শ্বাসনালীতন্ত্র গঠিত হয়। উদর গহ্বরের পৃষ্ঠদেশের মধ্যরেখার দুই পাশে একজোড়া (প্রতি পাশে একটি করে) পৃষ্ঠীয় অনুদৈর্ঘ্য শ্বাসনালী এবং অঙ্কদেশে এক জোড়া অঙ্কীয় অনুদৈর্ঘ্য শ্বাসনালী অবস্থিত। অঙ্কীয় অনুদৈর্ঘ্য শ্বাসনালী দুটি একাধিক

অনুপ্রস্থ উদর যোজক শ্বাসনালী দ্বারা পরস্পর যুক্ত থাকে। উদরের প্রতিপাশে একটি করে মোট দুটি পার্শ্বীয় অনুদৈর্ঘ্য শ্বাসনালী অবস্থিত।

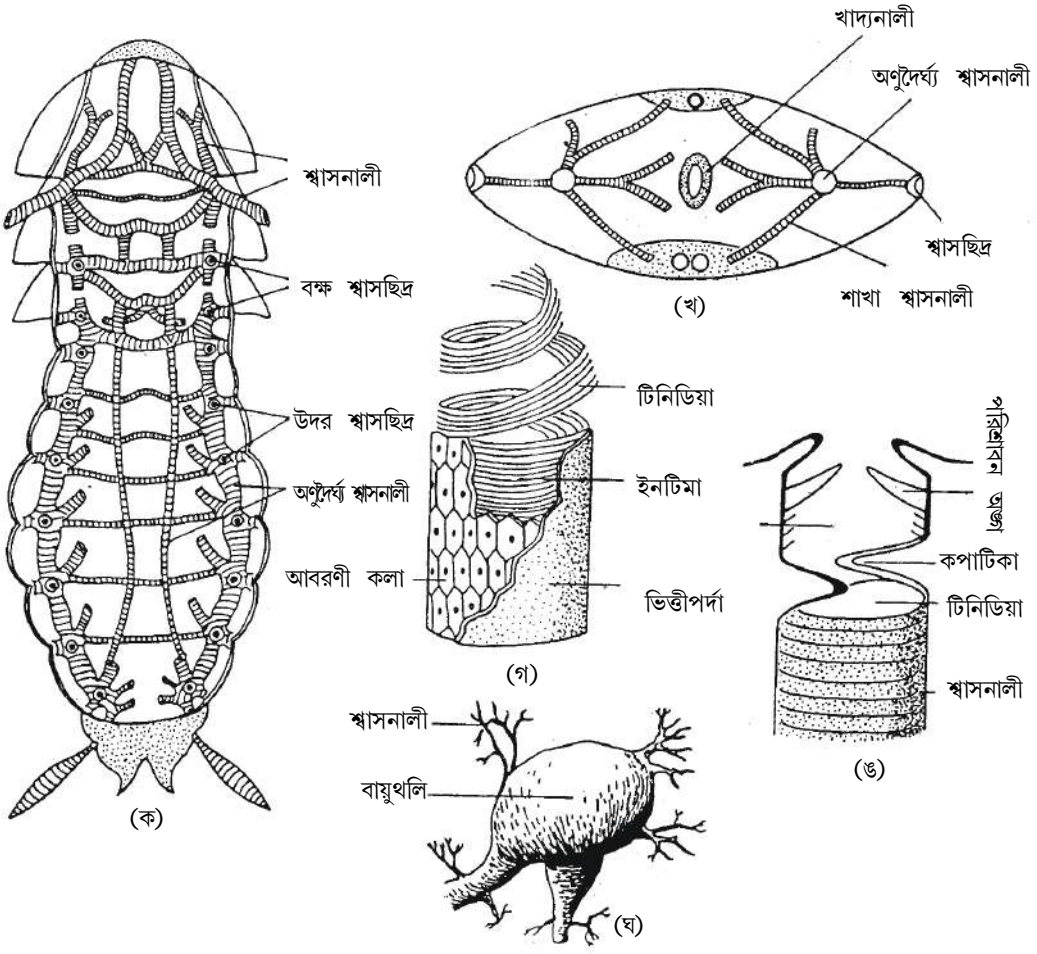

চিত্র 2.21: আরশোলার শ্বসন অঙ্গ
(ক) শ্বাসনালী তন্ত্র, (খ) বক্ষদেশের প্রস্থচ্ছেদ ও শ্বাসনালীর অবস্থান, (গ) শ্বাসনালীর গঠন, (ঘ) একটি বায়ু থলি, (ঙ) শ্বাসছিদ্র ও শ্বাসনালীর প্রথম অংশ

প্রতিটি শ্বাসছিদ্র থেকে যে শ্বাসনালীগুলি উৎপন্ন হয় তাদের খণ্ডক শ্বাসনালী বলে। প্রতিটি মধ্যবক্ষ শ্বাসছিদ্র থেকে দুটি খণ্ডক শ্বাসনালী উৎপন্ন হয়ে মস্তক, অগ্রবক্ষ এবং মধ্যবক্ষে বিস্তৃত হয়। দেহের অন্যান্য শ্বাসছিদ্রগুলির প্রতিটি থেকে তিনটি করে খণ্ডক শ্বাসনালী সৃষ্টি হয়।

শ্বাসনালীগুলি বারবার শাখাযুক্ত হয়ে অনেক সূক্ষ্ম শ্বাসনালিকা সৃষ্টি করে। এদের বলা হয় ট্রাকিওল। ট্রাকিওলগুলি সরাসরি কলায় প্রবেশ করে এবং কলাকোষ ও ট্রাকিওলের বায়ুর মধ্যে

ব্যাপন ক্রিয়ায় গ্যাসের বিনিময় ঘটে। প্রতিটি শ্বাসনালীর শেষ প্রান্তে অবস্থিত ট্রকিওল কোষ থেকে 4-5টি ট্রাকিওল উৎপন্ন হয়। শ্বাসনালীর অন্তঃপ্রাকারের কিউটিকল্‌কে বলা হয় ইন্‌টিমা। ইন্‌টিমাতে টিনিডিয়া নামক কাইটিন নির্মিত আংটির মতো কতকগুলি সর্পিলাকৃতির শক্ত, পুরু অংশ থাকে। এইগুলি শ্বাসনালীর গহ্বরের স্ফীত হওয়া ও চুপসে যাওয়াকে রোধ করে। শ্বাসনালীগুলি যত শাখা-প্রশাখা যুক্ত হয় তাদের প্রাকার ক্রমশ পাত্‌লা হয়। শুরুতে শ্বাসনালীর ব্যাস থাকে 2-5μm এবং ক্রমশ ট্রাকিওলে এই ব্যাস 1μm-এর কম হয়। ট্রাকিওলগুলি একটিমাত্র কোষ দ্বারা গঠিত।

C. বায়ুথলি (Air sac) :

শ্বাসনালীগুলি স্থানে স্থানে স্ফীত হয়ে বায়ুথলি গঠন করে। বায়ুথলিতে কোনো টিনিডিয়া থাকে না। এগুলির সাহায্যে গ্যাসের আদান-প্রদান ঘটে থাকে এবং এরা সঙ্কুচিত (compressed) হতে পারে।

D. শ্বসন পদ্ধতি (Respiration) :

শ্বাসনালীর সঙ্গে যেহেতু সরাসরি কোনো পেশীর যোগ থাকে না, সেই কারণে আরশোলা উদর পেশীর সঙ্কোচন ও প্রসারণ দ্বারা শ্বাস গ্রহণ ও শ্বাস ত্যাগের কাজ সম্পন্ন করে। প্রাণীদের সক্রিয়তা এবং উষ্ণতার উপর সঙ্কোচনের ও শ্বসন প্রক্রিয়ার দ্রুততা নির্ভরশীল। ট্রাকিওলগুলি কোষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে না, তবে কোষের প্লাজমা পর্দার সংলগ্ন হয় এবং পরিবেশের অক্সিজেনকে কোষের মাইটোকড্রিয়ার অত্যন্ত কাছে পৌঁছে দেয়।

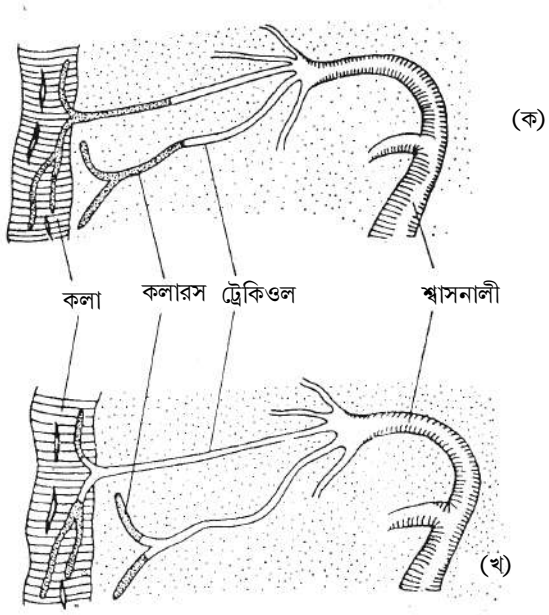

চিত্র 2.2: আরশোলার শ্বসন পদ্ধতি (ক) বিশ্রামকালে শ্বসন, (খ) উড্ডয়ন কালে শ্বসন

শ্বাসগ্রহণ (Inspiration) :

শ্বাস গ্রহণ কালে আরশোলার উদরের পেশীগুলি প্রসারিত হয়। ফলে সামনের চারজোড়া শ্বাসছিদ্র খুলে যায় এবং বাইরের পরিবেশের বাতাস শ্বাসছিদ্রের মাধ্যমে শ্বাসনালীতে প্রবেশ করে এবং ট্রাকিওলের মাধ্যমে আন্তঃকোষীয় স্থানে পৌঁছায়।

শ্বাসত্যাগ (Expiration) :

শ্বাস ত্যাগের সময় আরশোলার উদর পেশীর সঙ্কোচন ঘটে এবং শ্বাসনালীর ভিতরের বায়ু দেহের পিছনের দিকে ছয় জোড়া শ্বাসছিদ্রের মাধ্যমে দেহের বাইরে নির্গত হয়।

বিশ্রামকালে ও ওড়ার সময় আরশোলার শ্বসন প্রক্রিয়ার তারতম্য ঘটে।

E. বিশ্রাম কালে শ্বসন :

বিশ্রামের সময় আরশোলার ট্রাকিওলগুলি কলারসে পূর্ণ থাকে এবং শ্বাসনালী বা ট্রাকিওলের বায়ু থেকে অক্সিজেন (O_2) ব্যাপন প্রক্রিয়ায় কলারসে দ্রবীভূত হয়ে কলাকোষে পৌঁছায়। বিপরীতক্রমে কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) কোষ থেকে শ্বাসনালীতে আসে অথবা দেহত্বকের দ্বারা ব্যাপন প্রক্রিয়ায় বার হয়ে যায়।

F. উড্ডয়নকালে শ্বসন :

ওড়ার সময় আরশোলার দেহের বিপাক ক্রিয়া বৃদ্ধি পায়। এর ফলে দেহকলার অভিস্রবণ চাপ বৃদ্ধি পায়। এই অবস্থায় ট্রাকিওলগুলি থেকে কলারস, কলা-মধ্যবর্তী স্থানে ফিরে আসে এবং শ্বাসনালীর বায়ু সরাসরি কলাকোষে পৌঁছায়। ফলে বায়ু ও কলাকোষের মধ্যে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড-এর আদান-প্রদান ঘটে। অধিক মাত্রায় কার্বন ডাই-অক্সাইড যুক্ত বাতাস শ্বাসনালী ও শ্বাসছিদ্রের মাধ্যমে দেহের বাইরে নির্গত হয়। ওড়ার সময় আরশোলার শ্বসনের হারও বেড়ে যায়।

G. দেহতল দ্বারা শ্বসন :

আরশোলার ক্ষেত্রে 10% অথবা তার বেশি পরিমাণ গ্যাসের (O_2-CO_2) বিনিময় ঘটে দেহতল দ্বারা। সক্রিয় অবস্থায় দেহতল দ্বারা শ্বসনের পরিমাণ 50% পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

2.4.3 আরশোলার রেচনতন্ত্র (Excretory system)

আরশোলা একটি স্থলজ পতঙ্গ শ্রেণির প্রাণী। স্থলজ স্বভাবের জন্য জল সংরক্ষণের বিভিন্ন প্রচেষ্টা করে। এর প্রোটিন বিপাকের প্রধান উপজাত পদার্থ হল ইউরিক অ্যাসিড। এই রেচনবস্তুটি জলে অদ্রাব্য। ফলে প্রায় শুষ্ক রেচন পদার্থ দেহ থেকে বেরিয়ে আসে।

আরশোলার প্রধান রেচন অঙ্গ ম্যালপিজিয়ান নালিকা (Malpighian tubule) (চিত্র)। এছাড়াও কিছু আনুষঙ্গিক রেচন অঙ্গ যথা— রেকটাল গ্রন্থি, মেদ কোষ, নেফ্রোসাইট, ইনোসাইট, কিউটিক্‌ল্‌ মোচন ও ইউরিকোষ গ্রন্থি এর রেচনে সাহায্য করে।

A. প্রধান রেচন অঙ্গ—ম্যালপিজিয়ান (Malpighian) নালিকা

আরশোলার মধ্য পৌষ্টিক নালী এবং পশ্চাৎ পৌষ্টিক নালীর সংযোগস্থলে অল্প হরিদ্রাভ শাখাবিহীন সূত্রবৎ ম্যালপিজিয়ান নালিকাগুলি গুচ্ছাকারে অবস্থান করে। এই নালিকাগুলি বহিঃত্বক (ectoderm) থেকে উৎপন্ন হয়। নালিকাগুলি নিকটবর্তী অংশ পশ্চাৎ পৌষ্টিক নালীর গহ্বরে মুক্ত হয় এবং দূরবর্তী অংশ বন্ধ ও হিমোলিম্ফে নিমজ্জিত। নালিকাগুলি 6-8টি গুচ্ছে সাজানো থাকে এবং প্রতিটি গুচ্ছে 15-20টি নালিকা থাকে। মোট প্রায় 90-120টি নালিকা দেখা যায়। প্রতিটি নালিকা প্রায় 16 মিলিমিটার দীর্ঘ এবং 0.5 মিলিমিটার ব্যাসযুক্ত (চিত্র :2.23)।

ম্যালপিজিয়ান নালিকার অভ্যন্তর ফাঁপা। এর বাইরের প্রাকার বৃত্তীয় অনুদৈর্ঘ্য পেশী দ্বারা গঠিত এবং অভ্যন্তরে গ্রন্থিময় আবরক কোষ বর্তমান। আবরক কোষের বাইরের দিকে ভিত্তি পর্দা বেষ্টিত এবং অন্তর্দেশ ব্রাশ বর্ডারযুক্ত। ব্রাশ বর্ডার আণুবীক্ষণিক মাইক্রোভিলাই দ্বার গঠিত, কোনো সিলিয়া থাকে না (চিত্র : 2.23)।

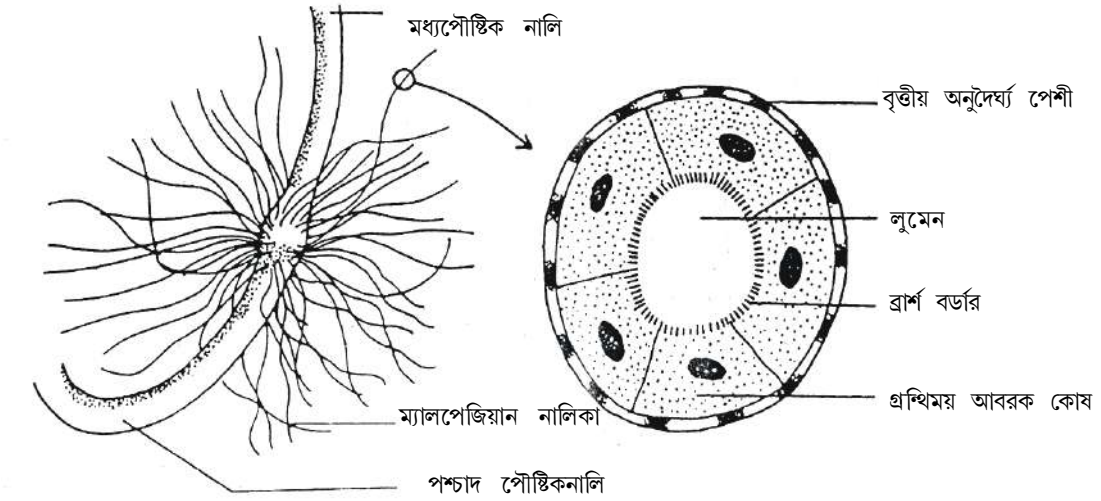

চিত্র 2.23: ম্যালপিজিয়ান নালীকার অবস্থান ও প্রস্থচ্ছেদ

B. আনুষঙ্গিক রেচন অঙ্গ (Accessory excretory organs)

আরশোলার আনুষঙ্গিক রেচন অঙ্গগুলি হল—

(a) রেকটাল গ্রন্থি (Recpal gland):

আরশোলার মলাশয়ের ভিতরের প্রাকারে অবস্থিত প্যাপিলাতে এই গ্রন্থি দেখা যায়। এই গ্রন্থিগুলি মলাশয়ে সঞ্চিত খাদ্যের অপাচ্য অংশ এবং রেচন পদার্থ থেকে অতিরিক্ত জল শোষণ করে এবং দেহে জলের ভারসাম্য বজায় রাখে।

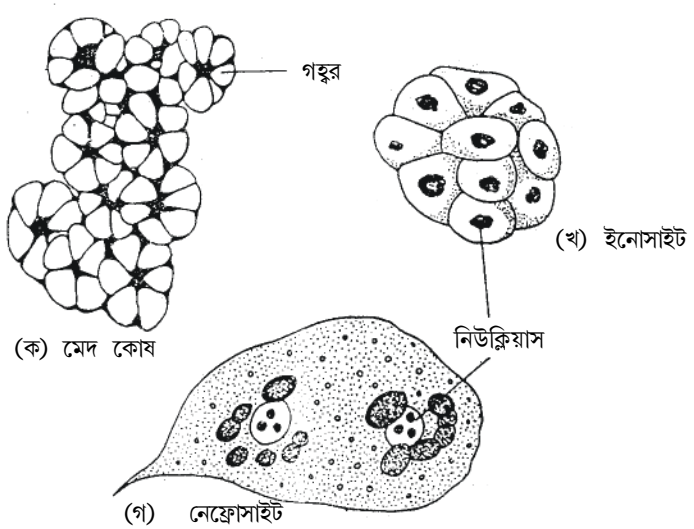

চিত্র 2.24: আরশোলার আনুসাঙ্গিক রেচন অঙ্গ ; (ক) মেদকোষ, (খ) ইনোসাইট, (গ) নেফ্রোসাইট

(b) মেদ কোষ (Fat cell)

দেহগহ্বরে যে মেদপুঞ্জ থাকে, তাদের মেদ কোষগুলিতে খাদ্যবস্তু ও ইউরেট জাতীয় রেচন পদার্থ সঞ্চিত থাকে। সেই কারণে এই মেদ কোষগুলিকে রেচন অঙ্গ হিসাবেও গণ্য করা হয়। (চিত্র : 2.24)

(c) নেফ্রোসাইট বা পেরিকার্ডিয়াল কোষ (Pericardial Cell or Nephrocyle) :

আরশোলার হৃৎপিণ্ডের গাত্রে এই ধরনের কোষগুলি একক অথবা গুচ্ছাকারে অবস্থান করে। এরা হিমোলিম্ফ থেকে রেচন পদার্থ শোষণ ও সঞ্চয় করে রেখে রেচন-এর কাজ করে (চিত্র : 2.24)।

(d) ইনোসাইট (Inocyte) :

আরশোলার উদর শ্বাসছিদ্রের কাছে মেদপুঞ্জের সঙ্গে বা হিমোলিম্ফে হলুদ রঙের ইনোসাইট কোষগুলি অবস্থান করে। এরা মোম কিউটিকিউলিন জাতীয় পদার্থ নিঃসরণ করে। রেচনে এদের সক্রিয় ভূমিকা জানা যায়নি (চিত্র : 2.24)।

(e) কিউটিক্‌লের মোচন বা খোলস ত্যাগ (Moulting) :

জীবন চক্রের নিম্ফ দশায় আরশোলার হিমোলিম্ফে অবস্থিত কিছু অ্যামিবা আকৃতির কোষ রেচন পদার্থ গ্রহণ করতে পারে এবং দেহের কিউটিক্‌লের নীচে সঞ্চিত রাখে। মোল্টিং বা খোলস ত্যাগের সময় এই বর্জ্য পদার্থগুলি দেহ থেকে দূরীভূত হয়।

(f) ইউরিকোষ গ্রন্থি (Uricose gland) :

পুংজননতন্ত্রের মাসরুম গ্রন্থির পরিধির দিকে অবস্থিত ইউট্রিকিউলি মেজরিস বা ইউরিকোষ গ্রন্থিতে ইউরিক অ্যাসিড সঞ্চিত থাকে এবং শুক্রাণু নির্গমনের সময় দেহ থেকে নির্গত হয়।

C. রেচন পদ্ধতি— ম্যালপিজিয়ান নালিকা হিমোলিম্ফের মধ্যে ভাসমান অবস্থায় থেকে নাইট্রোজেন যুক্ত বর্জ্য পদার্থ শোষণ করে। শোষিত রেচন বর্জ্য ইউরিক অ্যাসিড এবং ইউরেট হিসাবে নালিকার গহ্বরে সঞ্চিত হয়। এরপর ম্যালপিজিয়ান নালিকার দূরবর্তী অংশ দ্বারা হিমোসিল থেকে ইউরিক অ্যাসিডের পূর্ববর্তী বস্তুটির দ্রাব্য অবস্থায় সক্রিয় শোষণ ঘটে। নালিকার নিকটবর্তী অংশের আম্লিক তরলে ইউরিক অ্যাসিড অধঃক্ষিপ্ত হয়। এরপর রেচন বস্তু থেকে অধিকাংশ জলীয় অংশ শোষিত হয়। অতঃপর বর্জ্য পদার্থের সঙ্গে রেচন বস্তু খাদ্যনালীর মাধ্যমে মলাশয়ে আসে এবং পরে সেখান থেকে পায়ুছিদ্রের মাধ্যমে দেহের বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়। এইভাবে আরশোলা রেচন কাজ সম্পন্ন করে।

2.4.4 সংবহন তন্ত্র (Circulatory system)

আরশোলার সংবহন তন্ত্র অনুন্নত এবং মুক্ত (চিত্র : 2.25)। হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত কতকগুলি রক্তবাহের মাধ্যমে **দেহগহ্বর বা হিমোসিলে** (Haemocoel) উন্মুক্ত হয়, বিভিন্ন অঙ্গের সংস্পর্শে আসে এবং পুনরায় হৃৎপিণ্ডে ফিরে যায়। সুতরাং রক্ত শুধুমাত্র রক্তবাহের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে সাইনাস নামক দেহগহ্বর বা হিমোসিলেও উন্মুক্ত অবস্থায় থাকে। এই ধরনের সংবহন তন্ত্রকে **মুক্ত রক্ত সংবহন তন্ত্র** বলে। রক্ত **হিমোলিম্ফ, হিমোসিল** এবং **হৃৎপিণ্ড** নিয়ে আরশোলার সংবহন তন্ত্র গঠিত হয়।

A. রক্ত বা হিমোলিম্ফ (Haemolymph)

আরশোলার রক্ত বা হিমোলিম্ফ বর্ণহীন। কারণ এর রক্তে কোনো প্রকার শ্বাসরঞ্জক থাকে না। এর রক্তের আপেক্ষিক গুরুত্ব 7.5-8.0 এবং দেহের ওজনের প্রায় 20% হিমোলিম্ফ। আরশোলার রক্তে প্লাজমা বা রক্তরস এবং হিমোসাইট বা রক্তকণিকা থাকে। হিমোসাইটগুলি মেসোডার্ম থেকে উৎপত্তি লাভ করে এবং এদের সংখ্যা প্রায় নয় মিলিয়ন। হিমোসাইটগুলির আকৃতি বিভিন্ন।

a) রক্তরস বা প্লাজমা (Plasma)— আরশোলার রক্তরসে বিভিন্ন আয়ন এবং সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, স্নেহ পদার্থ, শর্করা, প্রোটিন, অ্যামাইনো অ্যাসিড ও ইউরিক অ্যাসিড ইত্যাদি বিভিন্ন জৈব ও অজৈব যৌগ থাকে।

b) রক্তকণিকা বা হিমোসাইট (Haemocyte)— হিমোসাইটগুলি বিভিন্ন আকৃতির, একটি নিউক্লিয়াসযুক্ত। হিমোসাইট প্রধানত তিন প্রকার। যথা—
(i) প্রোহিমোসাইট (ii) পরিবর্তনশীল হিমোসাইট (iii) বৃহৎ হিমোসাইট। (চিত্র 2.26)

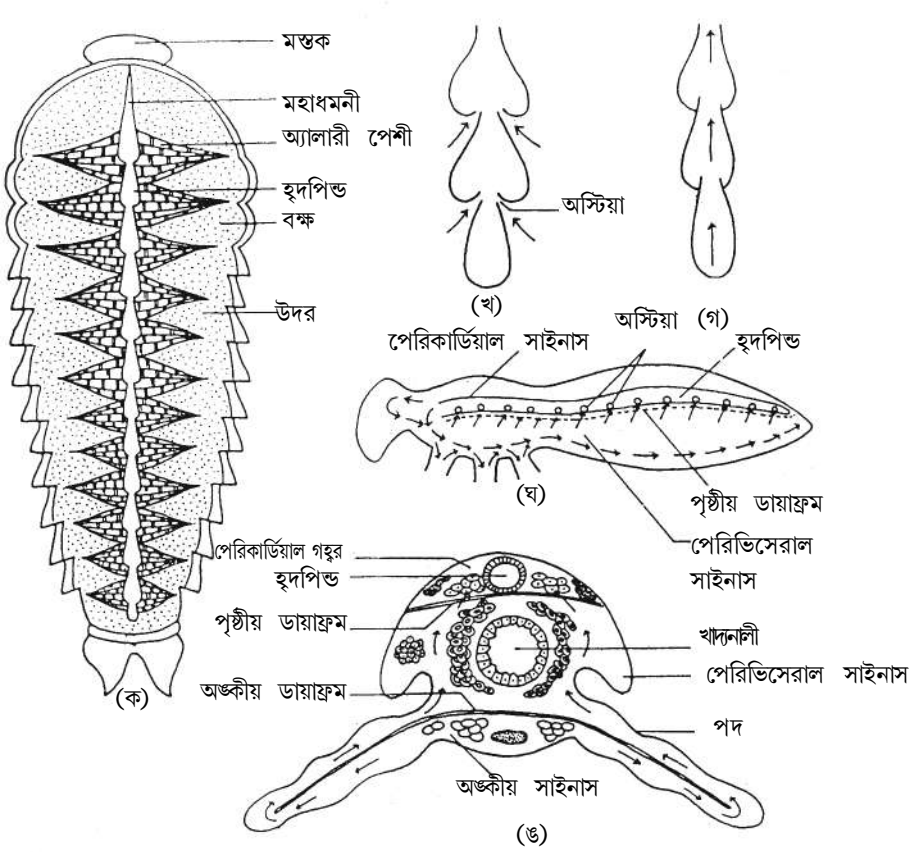

চিত্র 2.25: আরশোলার সংবহন তন্ত্র
(ক) হৃদপিণ্ড ও সংলগ্ন পেশী, (খ) হৃদপিণ্ডের প্রসারণ অবস্থা, (গ) হৃদপিণ্ডের সংকোচন অবস্থা, (ঘ) দেহের লম্বচ্ছেদ ও রক্ত সংবহনের গতিপথ, (ঙ) দেহের প্রস্থচ্ছেদ ও সংবহনের গতিপথ।

(i) প্রোহিমোসাইট (prohaemocyte) : আকারে ছোট এবং এদের গড় ব্যাস প্রায় 6μm-9μm। নিউক্লিয়াসের আকৃতি বড় এবং সাইটোজোম ক্ষারধর্মী। মোট হিমোসাইটের প্রায় 23% প্রোহিমোসাইট।

(ii) পরিবর্তনশীল হিমোসাইট (Transitional haemocyte) : প্রোহিমোসাইট পরিবর্তনশীল হিমোসাইটে পরিবর্তিত হতে পারে। এদের ব্যাস প্রায় 9-18μm এরা বিভাজিত হতে পারে। সক্রিয় এবং ফ্যাগোসাইটিক প্রকৃতির। এরা বৃহৎ হিমাটোসাইটে পরিণত হতে পারে। মোট হিমোসাইটের প্রায় 66% এই প্রকার হিমাটোসাইট।

(iii) বৃহৎ হিমাটোসাইট (Large haematocyte) : এদের ব্যাস 18-23μm, কোষের সাইটোপ্লাজম ক্ষারীয় এবং সুস্পষ্ট নিউক্লিয়াসযুক্ত, ফ্যাগোসাইটিক প্রকৃতির। মোট হিমোসাইটের 11% বৃহৎ হিমাটোসাইট।

B. আরশোলার রক্তের কাজ— শ্বাসরঞ্জক না থাকায় আরশোলার রক্ত গ্যাস পরিবহনে সাহায্য করে না। নিম্নলিখিত কাজগুলি এই রক্তের মাধ্যমে ঘটে—

1. দেহের জলজ চাপ নিয়ন্ত্রণ করা।
2. pH নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করা।
3. রক্তে দ্রবীভূত বিভিন্ন পুষ্টিদ্রব্য, লবণ ও রেচন পদার্থ পরিবহন।
4. ব্যাকটিরিয়া ও আন্যান্য ক্ষতিকারক পরজীবীর আক্রমণ প্রতিরোধে সাহায্য করা।
5. ক্ষত নিরাময়ে ও রক্তপাত রোধে সাহায্য করা।

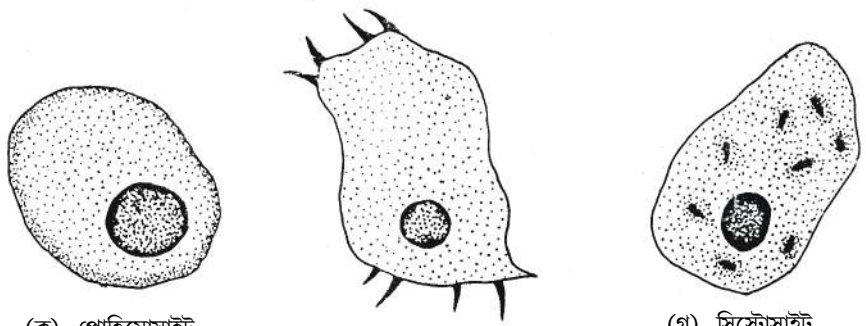

চিত্র 2.26: আরশোলার বিভিন্ন প্রকার রক্তকণিকা ; (ক) প্রোহিমোসাইট, (খ) প্লাজমাটোসাইট, (গ) সিস্টোসাইট

C. হিমোসিল (Haemocoel) :

আরশোলার দেহগহ্বর প্রকৃত সিলোম নয়। ভ্রূণের ব্লাস্টোসিল ও সিলোম একত্রে **মিক্সোসিল** গঠন করে। মিক্সোসিল গহ্বরের মধ্য দিয়ে এর রক্ত প্রবাহিত হয়। এই গহ্বরকে বলা হয় হিমোসিল। হিমোসিল মাধ্যমে প্রবাহিত রক্তকে বলা হয় হিমোলিম্ফ।

হিমোসিল দুটি পেশীময় ডায়াফ্রাম দ্বারা তিনটি সাইনাসে বিভক্ত হয়। হিমোসিলের পৃষ্ঠীয় অংশ পৃষ্ঠ ডায়াফ্রাম দ্বারা পেরিকার্ডিয়াল বা পৃষ্ঠ সাইনাসে বিভক্ত। পেরিকার্ডিয়াল সাইনাসে একটি পৃষ্ঠ রক্তনালী থাকে যা উদর অংশে হৃৎপিণ্ড এবং বক্ষ অংশে অ্যাওর্টা বা মহাধমনী অংশে বিভক্ত। দেহের ভিসেরা বা আন্তর যন্ত্রসমূহ পৃষ্ঠ ডায়াফ্রামের নীচে অবস্থিত বৃহৎ পেরিভিসেরাল সাইনাসের মধ্যে থাকে। এই পেরিভিসেরাল সাইনাসের নীচে অবস্থিত অঙ্কীয় ডায়াফ্রাম হিমোসিলের অঙ্ক দেশে অঙ্কীয় সাইনাসে বিভক্ত করে। অঙ্কীয় সাইনাসে অঙ্কীয় স্নায়ুরজ্জু থাকে। মস্তক অংশে হিমোসিল কয়েকটি ছোট ছোট গহ্বর বা মস্তক সাইনাসে বিভক্ত থাকে।

D. হৃদ্‌পিণ্ড (Heart) :

আরশোলার হৃদ্‌পিণ্ডটি প্রায় 30.5 মিলিমিটার লম্বা, নলাকৃতি, পেশীবহুল এবং স্পন্দনশীল। এটি বক্ষ ও উদর অঞ্চলের পৃষ্ঠতলের মধ্যরেখা বরাবর অবস্থান করে। হৃৎপিণ্ডের প্রাকারের বাইরের

দিকে যোগকলাস্তর এবং মধ্যে পেশীকলাস্তর থাকে। পেশীকলাস্তরের সারকোলেমা তন্তু হৃৎপিণ্ডের গহ্বরকে আবৃত করে রাখে। 13টি ফানেল আকৃতির প্রকোষ্ঠে হৃৎপিণ্ডটি বিভক্ত। প্রকোষ্ঠগুলি পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত এবং সংযোগী ছিদ্রপথে কপাটিকা থাকে। ফলে রক্তপ্রবাহ একমুখী হয় অর্থাৎ রক্ত পিছনের প্রকোষ্ঠ থেকে সামনের প্রকোষ্ঠে ঢুকতে পারে কিন্তু উল্টো দিকে যেতে পারে না। পেরিকার্ডিয়াল সাইনাসের ভিতর হৃৎপিণ্ডটি অবস্থান করে।

13টি হৃদ্ প্রকোষ্ঠের মধ্যে তিনটি থাকে বক্ষে এবং দশটি থাকে উদরে। প্রতিটি প্রকোষ্ঠের পেছনে একজোড়া ছিদ্র অস্টিয়া (ostia) থাকে। অস্টিয়ার সংখ্যা 12 জোড়া। অস্টিয়া ছিদ্রগুলি পেরিকার্ডিয়াল সাইনাসে উন্মুক্ত থাকে। এখানে ছিদ্রমুখে কপাটিকা (valve) থাকায় রক্ত শুধুমাত্র পেরিকার্ডিয়াল সাইনাস থেকে হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করে কিন্তু হৃৎপিণ্ড থেকে পেরিকার্ডিয়াল সাইনাসে যেতে পারে না।

হৃদ্প্রকোষ্ঠগুলির দুপাশের প্রাকারে অ্যালারী পেশী গুচ্ছাকারে সাজানো থাকে। দেহের টারগাম থেকে এরা উৎপত্তি লাভ করে এবং ক্রমশ প্রসারিত হয়ে হৃৎপিণ্ডের সংযোগস্থলে সর্বাধিক বিস্তার লাভ করে। এই অবস্থায় এদের ত্রিকোণাকার দেখায় (চিত্র 2.25)।

প্রতিটি দেহখণ্ডকে হৃদ্পিণ্ড থেকে একজোড়া খণ্ডীয় নালী (segmental vessel) বের হয়, যার মাধ্যমে হৃদ্পিণ্ড থেকে রক্ত বাইরের দিকে যায়। হৃদ্পিণ্ডের শেষ প্রকোষ্ঠটি বন্ধ। প্রথম হৃৎ প্রকোষ্ঠের অগ্রভাগে একটি ক্ষুদ্র, সরু মহাধমনী (aorta) যুক্ত থাকে।

মহাধমনী (aorta) থেকে উৎপন্ন শাখানালীগুলি মস্তক অঞ্চলে রক্ত সরববাহ করে। এই অঞ্চলে দুটি খুব ছোট অ্যাম্পুলি থাকে, যাদের সঙ্কোচন ও প্রসারণ প্রভাবে রক্ত অ্যান্টেনাতে প্রবেশ করে।

মহাধমনী ও খন্ডীয় ধমনীগুলি হিমোসিলে মুক্ত হয় এবং পুনরায় রক্ত হিমোসিল থেকে পেরিকার্ডিয়াল সাইনাসে ফিরে আসে ও সবশেষে অস্টিয়ার মাধ্যমে হৃদ্পিণ্ডে প্রবেশ করে। মধ্যবক্ষ ও পশ্চাৎবক্ষ খণ্ডে থাকে বুস্টার হৃদ্পিণ্ড, যেগুলি ডানায় রক্ত সরবরাহে সাহায্য করে।

E. রক্ত সংবহন পদ্ধতি :

আরশোলার হৃদ্পিণ্ডের পেশীসমৃদ্ধ প্রাকারের সঙ্কোচন ও প্রসারণ প্রভাবে রক্ত সংবহন ঘটে। অ্যালারী পেশীও রক্ত সংবহনে সাহায্য করে। শ্বাসক্রিয়ার সময় উদর পেশীর সঙ্কোচন এবং উড়বার সময় বক্ষ পেশীর সঙ্কোচনও আরশোলার রক্ত সংবহনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। অ্যালারী পেশীর সঙ্কোচনের ফলে পেরিকার্ডিয়াল সাইনাসের আয়তন বৃদ্ধি পায়। ফলে রক্ত পেরিভিসেরাল সাইনাস থেকে পেরিকার্ডিয়াল সাইনাসে প্রবেশ করে। অ্যালারী পেশীর প্রসারণে রক্ত অস্টিয়ার মাধ্যমে হৃদ্পিণ্ডে প্রবেশ করে। হৃৎপিণ্ডের পশ্চাৎভাগ থেকে অগ্রভাগে পর্যায়ক্রমিক সঙ্কোচন ও প্রসারণের ফলে রক্ত দেহের পিছন থেকে সামনে মস্তিষ্কের দিকে প্রবাহিত হয়। অগ্রভাগের মস্তক অংশের হিমোসিল থেকে রক্ত পশ্চাৎভাগে বক্ষ ও উদর অঞ্চলে যায় এবং আবার পেরিকার্ডিয়াল সাইনাসে প্রবেশ করে ও সেখান থেকে অস্টিয়ার মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে।

বুস্টার হৃদ্পিণ্ডের মাধ্যমে আরশোলার ডানায় রক্তপ্রবাহ সঞ্চালিত হয়।

2.4.5 আরশোলার জননতন্ত্র ও জনন (Reproductive system & reproduction)

আরশোলা একলিঙ্গা পতঙ্গা শ্রেণির প্রাণী অর্থাৎ একটি প্রাণীর দেহে কেবলমাত্র একপ্রকার (পুরুষ অথবা স্ত্রী) জনন অঙ্গ থাকে। দেহের অভ্যন্তরীণ জনন অঙ্গের গঠন ও বহিরাকৃতির ভিত্তিতে পুরুষ ও স্ত্রী আরশোলাকে সহজেই আলাদা করা সম্ভব। এই অবস্থাকে যৌন দ্বিরূপতা (dimorphism) বলা হয়।

বহিরাকৃতিগতভাবে পুরুষ ও স্ত্রী আরশোলার পার্থক্যগুলি নিম্নরূপ—

পুরুষ আরশোলা	স্ত্রী আরশোলা
১. উদর অপেক্ষাকৃত সরু।	১. উদর অপেক্ষাকৃত চওড়া।
২. শুঙ্গা (antennae) তুলনামূলকভাবে লম্বা।	২. শুঙ্গা তুলনামূলকভাবে ছোট।
৩. নবম উদর খন্ডকে অ্যানাল স্টাইল নামক উপাঙ্গা দেখা যায়।	৩. অ্যানাল স্টাইল থাকে না।
৪. ডানা পৃষ্ঠদেশে উদর অংশকে ছাড়িয়ে দেহের বাইরে বর্ধিত থাকে।	৪. ডানা পৃষ্ঠদেশে উদর অংশের শেষ সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে।

A. পুং জনন তন্ত্র (Male genital orgon)

আরশোলার পুং জনন তন্ত্রের বিভিন্ন অঙ্গাগুলি নিম্নরূপ—

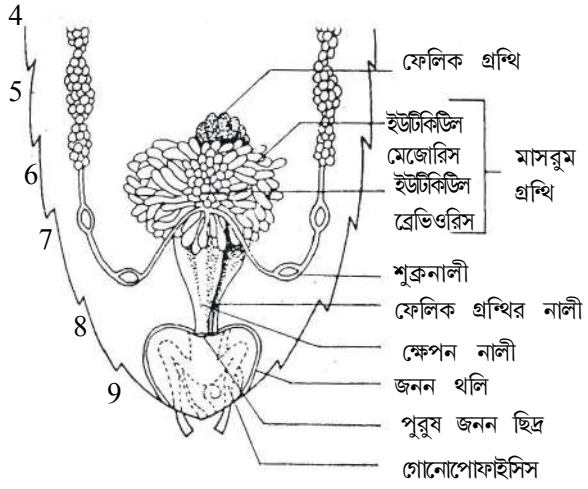

চিত্র 2.27: আরশোলার পুংজনন তন্ত্র

1. শুক্রাশয় (Testis) :

আরশোলার উদর গহ্বরের চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ খণ্ডকের ভিতরের পৃষ্ঠীয় অঞ্চলে মেদপুঞ্জে আবৃত অবস্থায় দুটি লম্বাটে সাদা রঙের শুক্রাশয় অবস্থিত। প্রতিটি শুক্রাশয় দৈর্ঘ্য বরাবর দুটি অথবা তিনটি খণ্ডকে বিভক্ত। প্রতিটি খণ্ডকে (lobe) 30-80টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানার মত ফলিক্‌ল গুচ্ছাকারে সজ্জিত থাকে। ফলিক্‌লগুলি পেরিটোনিয়াল আবরণী দ্বারা ঢাকা থাকে।

2. শুক্রনালী (Vas deferens) :

প্রতিটি শুক্রাশয়ের পশ্চাৎ প্রান্ত থেকে একটি করে সরু শুক্রনালী উৎপন্ন হয়। দুই দিকের দুটি শুক্রনালী উদর গহ্বরের দুই পাশ বরাবর পশ্চাদ দিকে অগ্রসর হয়ে থলির আকৃতির শুক্রথলির সঙ্গে যুক্ত হয়। শুক্রনালীর মাঝে লুপের ন্যায় অংশ থাকে।

3. মাশরুম বা ছত্রাক গ্রন্থি (Mushroom gland)

দুটি শুক্রনালী ও ক্ষেপননালীর সংযোগস্থলে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন্ধনালীযুক্ত অংশ দেখা যায়। এই নালীগুলি ছত্রাকের মত মাশরুম গ্রন্থি বা ইউট্রিকুলার গ্রন্থি (utricular gland) গঠন করে। এই মাশরুম গ্রন্থির নালিকাগুলি দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত—অগ্রভাগ থেকে উৎপন্ন লম্বা সরু নালিকা (utriculi majores) এবং মধ্যভাগের ক্ষুদ্র নালিকা (utriculi breviores)। এই দ্বিতীয় নালিকাগুলিই গ্রন্থির বেশির ভাগ অংশ গঠন করে। এদের ক্ষরিত রস স্পার্মাটোফোর গঠনে সাহায্য করে।

4. শুক্রথলি :

ক্ষেপণ নালীর অঙ্কীয় তলের অগ্রভাগে দুইগুচ্ছ ছোট ছোট থলিকা থাকে যেগুলি শুক্রথলি গঠন করে। এইস্থানে শুক্রাণু সঞ্চিত থাকে।

5. ক্ষেপণ নালী (Ejaculatory duct) :

দুইপাশের শুক্রনালী দুটি একটি পেশীবহুল সাধারণ নালীতে যুক্ত হয়। একে বলে ক্ষেপণ নালী। ক্ষেপণ নালীর গোড়ার অংশ কিছুটা স্ফীত। এই নালীর সঙ্কোচনের ফলে স্পার্মাটোফোরগুলি দেহের বাইরে নির্গত হয়। ক্ষেপণ নালীটি নবম ও দশম উদর খণ্ডকের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত জনন থলিতে (genital pouch) বিস্তৃত এবং পুং জনন ছিদ্রের মাধ্যমে দেহের বাইরে উন্মুক্ত হয়। পুং জনন ছিদ্রটি **গোনাপোফাইসিস** নামক কাইটিন নির্মিত প্লেট দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। এই প্লেটগুলিকে বলে **ফ্যালোমিয়ার**। ক্ষেপণ নালীর অন্তর্গাত্রের ক্ষরণ পদার্থ স্পার্মাটোফোরের মধ্য আবরণ গঠন করে।

6. কনগ্লোবেট গ্রন্থি (conglobate gland) :

এটি একটি লম্বাটে, চ্যাপ্টা থলির মত গ্রন্থি। কনগ্লোবেট গ্রন্থিটি ক্ষেপণনালীর অঙ্কদেশে

অবস্থিত। এই গ্রন্থিটি পুরুষ জনন ছিদ্রে উন্মুক্ত হয়। এই গ্রন্থির ক্ষরণরস স্পার্মাটোফোরের বহিরাবরণ গঠন করে।

7. বহিঃজনন অঙ্গ (External genitalia) :

নবম ও দশম উদর খণ্ডকের পৃষ্ঠীয় আবরণের নিচে অবস্থিত পায়ুছিদ্রের নিচে বহিঃজনন অঙ্গটি উন্মুক্ত হয়।

B. স্ত্রী জনন তন্ত্র (Female reproductive organ) :

নিম্নলিখিত অঙ্গগুলি আরশোলার স্ত্রী জনন তন্ত্রে দেখা যায়।

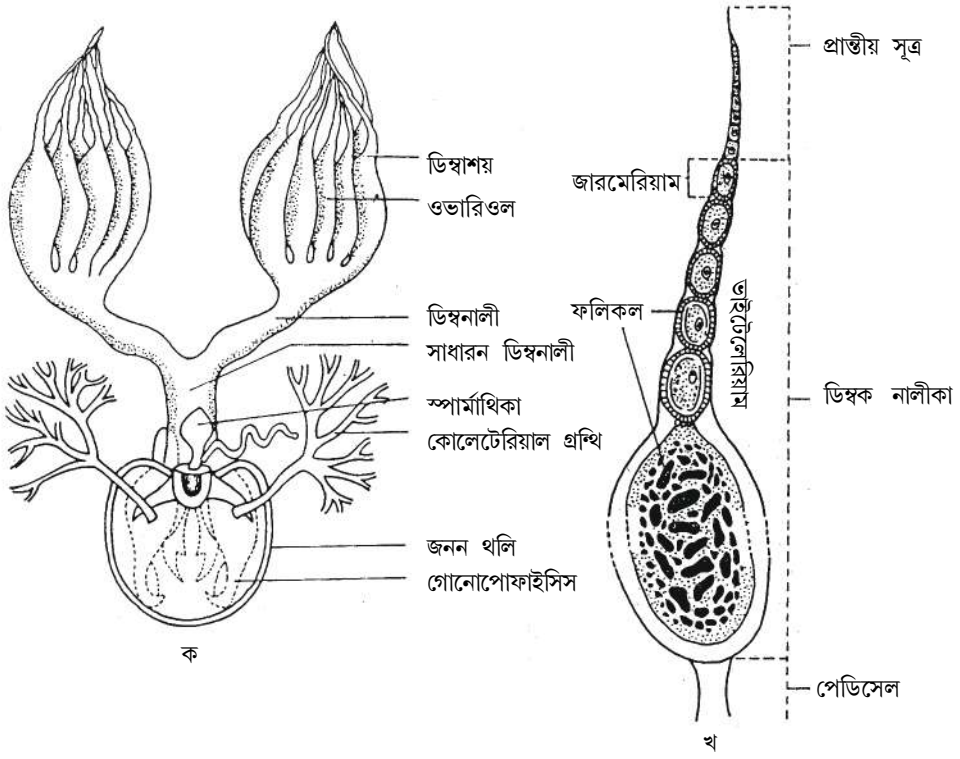

চিত্র 2.28: আরশোলার স্ত্রী জনন তন্ত্র, একটি ওভারিওলের গঠন এবং ডিম্বাণু পরিস্ফুরণের বিভিন্ন পর্যায়

1. ডিম্বাশয় (Ovaries) :

আরশোলার উদর গহ্বরের দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ খণ্ডকের পৃষ্ঠ পার্শ্বীয় দিকের প্রতি পাশে একটি করে মোট এক জোড়া ডিম্বাশয় ফ্যাটবডি আবৃত অবস্থায় দেখা যায়। প্রতিটি ডিম্বাশয় আটটি

ওভারিওল নিয়ে গঠিত। প্রতিটি ওভারিওল লম্বা সূত্রাকার পুঁতির মালার মত যার অগ্রাংশ ক্রমশ সরু ও পশ্চাৎ অংশ মোটা। ওভারিওলগুলির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ডিম্বাণু পরিস্ফুরণের বিভিন্ন দশা থাকে। প্রতি পাশের ওভারিওলের অগ্রপ্রান্ত পরস্পরের সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে সূত্রাকার আকৃতি গঠন করে ও সাস্পেনসারি লিগামেন্টে আবদ্ধ থাকে।

প্রতিটি ওভারিওল অগ্র-পশ্চাতে ছয়টি নিম্নলিখিত অঞ্চলে বিভক্ত।

প্রথম অঞ্চল—সর্বাপেক্ষা দূরবর্তী (distal) অংশ। লিগামেন্টের সাহায্যে অন্যান্য ওভারিওলের ফিলামেন্টের সঙ্গে যুক্ত থাকে।

দ্বিতীয় অঞ্চল—এটি কুঁড়ি উৎপাদক (budding) অঞ্চল। এই অংশে উসাইট গঠিত হয়।

তৃতীয় অঞ্চল—এই অঞ্চলে উসাইটের বৃদ্ধি ঘটে। উসাইটগুলি এক সারিতে সজ্জিত থাকে না।

চতুর্থ অঞ্চল—সর্বাপেক্ষা বৃহৎ অঞ্চল এবং উসাইট এই অঞ্চলে একটি সারিতে সজ্জিত থাকে। ক্ষুদ্র উসাইটগুলি দূরবর্তী অংশে এবং বৃহদাকার উসাইটগুলি নিকটবর্তী অংশে (proximal end) সজ্জিত থাকে।

পঞ্চম অঞ্চল — অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত অঞ্চল। এখানে কুসুমপূর্ণ উসাইটগুলি অবস্থান করে।

ষষ্ঠ অঞ্চল — সবচেয়ে নিকবর্তী অংশ। এর মাধ্যমে ওভারিওল ডিম্বনালীতে মুক্ত হয়।

2. ডিম্বনালী (Oviduct) :

প্রতি পার্শ্বের আটটি ওভারিওল পশ্চাতে একটি ছোট মোটা নালীর সঙ্গে যুক্ত হয়। একে বলা হয় ডিম্বনালী। ডিম্বাণু পরিবহন করা এর কাজ।

3. যোনি (Vagina) :

উভয় পাশের ডিম্বনালী দুটি পরে মিলিত হয়ে একটি ক্ষুদ্রাকার যোনি গঠন করে। এটিকে স্ত্রী আরশোলার সপ্তম উদর খণ্ডকে দেখা যায়।

4. স্ত্রী জনন ছিদ্র (Genital opening) :

যোনি পশ্চাৎভাগে একটি অনুদৈর্ঘ্য ছিদ্রের মাধ্যমে জনন প্রকোষ্ঠে (genital pouch) উন্মুক্ত হয়। ইহা স্ত্রী জনন ছিদ্র নামে অভিহিত। স্ত্রী জনন ছিদ্রটিকে বলা হয় ভাল্ভা (vulva)। এটি অষ্টম স্টারনামে অবস্থিত।

5. জনন থলি (Genital pouch) :

সপ্তম স্টারনাম পশ্চাৎ অংশে বর্ধিত হয়ে নৌকা আকৃতির জনন থলি গঠন করে।

6. গোনাপোফাইসিস (Gonapophysis) :

স্ত্রী জনন ছিদ্রটি ছয়টি প্লেটের মত অংশ দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। এদের গোনাপোফাইসিস বলে। এগুলি ঊথিকা গঠনে ও ডিম্বাণু নির্গমনে সাহায্য করে।

7. শুক্রধানী (spermatheca) :

যোনির মধ্যাংশে এক জোড়া অসম আকৃতির শুক্রধানী বর্তমান। বাঁদিকের শুক্রধানীটি বড়, থলির আকারের। ডানদিকেরটি সরু এবং প্যাঁচানো নলের মত। শুক্রধানী দুটি জনন থলিতে যুক্ত হয়। সঙ্গামের সময় পুরুষ আরশোলার থেকে আগত শুক্রাণুগুলি অস্থায়ীভাবে শুক্রধানীতে সঞ্চিত থাকে।

8. কোলেটেরিয়াল গ্রন্থি (Colleterial gland) :

ডিম্বাশয়ের পিছনে ও উপরে এক জোড়া শাখান্বিত কোলেটেরিয়াল গ্রন্থি অবস্থিত। গ্রন্থি দুটি পৃথক পৃথকভাবে জনন থলিতে উন্মুক্ত হয়। এই গ্রন্থির ক্ষরণ ডিম্বাণুগুচ্ছকে শক্ত কালো রঙের ডিম্বাধার বা ঊথিকা গঠনে সাহায্য করে।

C. সঙ্গাম, নিষেক ও ঊথিকার গঠন (copulation, fertilization & formation of Ootheca) :

সঙ্গাম : আরশোলা সাধারণত মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে সঙ্গাম সম্পন্ন করে। সঙ্গামের পূর্বে স্ত্রী আরশোলা পুরুষ আরশোলাকে আকৃষ্ট করার জন্য ফেরোমোন নিঃসৃত করে। সঙ্গামকালে পুরুষ ও স্ত্রী আরশোলা তাদের পশ্চাৎ অংশের গোনাপোফাইসিসে দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন হয় এবং এই অবস্থায় তারা চলাফেরা করতে পারে। সঙ্গাম প্রায় এক ঘণ্টা বা তার বেশি সময় স্থায়ী হয়। পুরুষ আরশোলা থেকে শুক্রাণুগুলি দলবদ্ধভাবে, পর্দাবৃত অবস্থায় স্পার্মাটোফোর গঠন করে এবং স্ত্রী আরশোলার দেহের স্পার্মাথিকার ভিতরে প্রবিষ্ট হয় এবং সঞ্চিত থাকে।

নিষেক : দুই পাশের আটটি করে মোট ষোলটি ওভারিওল থেকে ষোলটি ডিম্বাণু স্ত্রী জনন থলিতে আসে এবং স্পার্মাথিকা থেকে নিক্ষিপ্ত শুক্রাণু দ্বারা নিষিক্ত হয়।

ঊথিকার গঠন : নিষিক্ত ডিম্বাণুগুলিকে ঘিরে কোলেটেরিয়াল গ্রন্থির ক্ষরণ সঞ্চিত হয় এবং ক্রমশ শক্ত হয়ে ডিম্বাধার বা ঊথিকা গঠন করে। ঊথিকার অভ্যন্তরে 16টি নিষিক্ত ডিম্বক দুটি সারিতে সজ্জিত অবস্থায় থাকে। ঊথিকা প্রথমে সাদা থাকে এবং পরে ক্রমশ বাদামী বর্ণ ধারণ করে। সম্পূর্ণ ঊথিকা গঠিত হতে প্রায় তিন-চার ঘণ্টা সময় লাগে।

ঊথিকা লম্বাটে এবং এর বাইরের পৃষ্ঠীয় অঞ্চল কিছুটা উঁচু। একে বলে কীল্ (keel)। কীলের প্রতি পাশে আটটি খাঁজযুক্ত উঁচু অংশ থাকে। স্ত্রী আরশোলা ঊথিকাকে জনন প্রকোষ্ঠের শেষ প্রান্তে আটকিয়ে রাখে এবং এরা পছন্দমত উপযুক্ত পরিবেশে অর্থাৎ উষ্ণ ও অন্ধকার স্থানে স্থাপন না করা পর্যন্ত এই অবস্থাতেই বেশ কয়েকদিন চলাফেরা করে। স্ত্রী আরশোলা ডিম্ব ছেড়ে দেওয়ার পর ডিমের প্রতি যত্ন নেয় না। প্রতিটি নিষিক্ত ডিমে বেশি পরিমাণে কুসুম পদার্থ থাকায়

ভ্রূণের বৃদ্ধিকালে খাদ্যের অভাব হয় না। সঙ্গমের দশ-পনের দিন পর ডিমের প্রতিস্থাপন শুরু হয়।

পরিস্ফুরণ ও বৃদ্ধি (Development and hatching) : আরশোলার ভ্রূণের বৃদ্ধি ঊথিকার মধ্যেই শুরু হয়ে যায়। কিছু সময় পর ঊথিকার কীল্ (keel) অঞ্চল ফেটে শাবক আরশোলা বের হয়ে আসে। ভ্রূণের বৃদ্ধি তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল। ভ্রূণের বৃদ্ধি ঘটতে মোটামুটি 34-99 দিন পর্যন্ত সময় লেগে যায়। ঊথিকা থেকে বের হওয়া শাবক আরশোলাদের নিম্ফ (Nymph) বলে। নিম্ফ নরম, অর্ধস্বচ্ছ, প্রায় বর্ণহীন হয় এবং এর দুটি কালো রঙের চোখ থাকে। এর মধ্যে ডানা ছাড়া পরিণত আরশোলার সব বৈশিষ্ট্যই থাকে এবং আকৃতিতে ছোট হয়। এদের যৌনাঙ্গ সম্পূর্ণ গঠিত হয় না। ঊথিকা থেকে নিম্ফ বের হয়ে ডিম্ব-পর্দা খেতে থাকে। নিম্ফগুলি ছয়-সাতবার খোলস ত্যাগ করার পর এদের ডানার উৎপত্তি ও গঠন দেখা যায়। নিম্ফ থেকে পূর্ণাঙ্গ আরশোলা তৈরি হতে প্রায় 6 থেকে 13 মাস সময় লাগে। শেষবার খোলস ত্যাগের পর পরিণত আরশোলার সব বৈশিষ্ট্যই দেখতে পাওয়া যায়। আরশোলার জীবনচক্র অত্যন্ত সরল প্রকৃতির। আরশোলার বৃদ্ধি সরাসরি এবং অত্যন্ত সরল রূপান্তর প্রক্রিয়া জীবনচক্রে দেখা যায় বলে একে অসম্পূর্ণ রূপান্তর (Incomplete metamorphosis) বলা হয়।

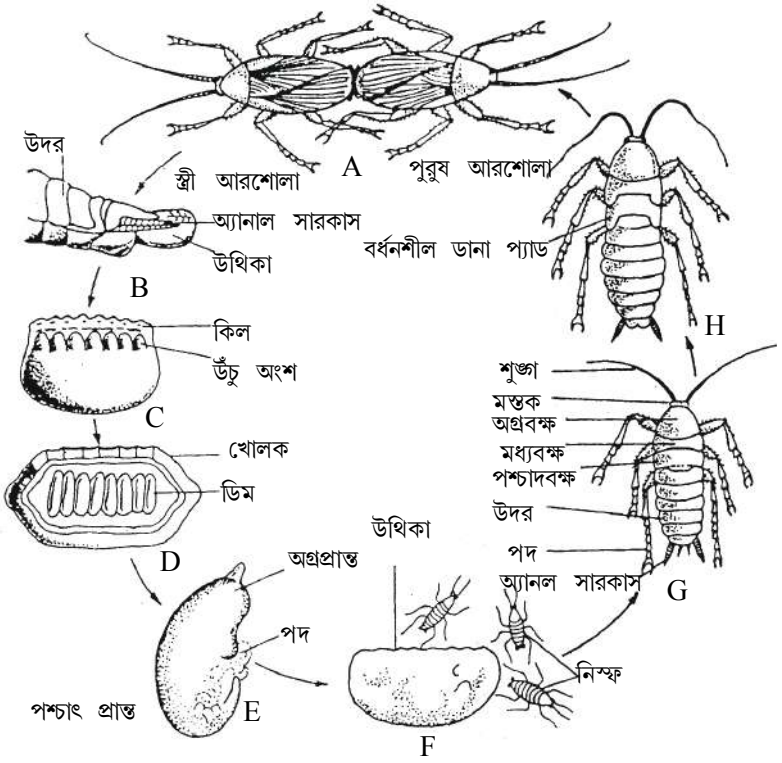

চিত্র 2.299: আরশোলার জীবনচক্র : পরিস্ফুরণ ও বৃদ্ধি

2.4.6 আরশোলার স্নায়ুতন্ত্র (Nervous system)

আরশোলার স্নায়ুতন্ত্র বেশ উন্নত (চিত্র 2.30)। এর স্নায়ুতন্ত্র তিনটি ভাগে বিভক্ত। (a) কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র, (b) প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র এবং (c) সিমপ্যাথেটিক বা স্টোমাটোগ্যাস্ট্রিক স্নায়ুতন্ত্র

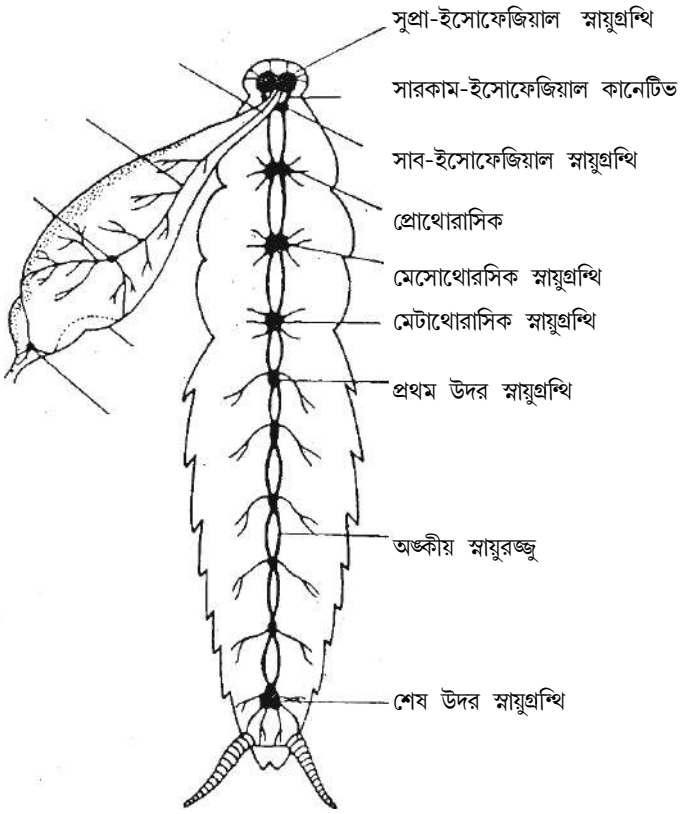

চিত্র 2.30: আরশোলার স্নায়ুতন্ত্র

(a) কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র (Central nervous system) :

আরশোলার কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র মস্তিষ্ক, সাব-ইসোফেজিয়াল গ্রন্থি, সারকাম ইসোফেজিয়াল কানেকটিভ ও অঙ্কীয় স্নায়ুরজ্জু নিয়ে গঠিত।

(i) মস্তিষ্ক বা সুপ্রা ইসোফেজিয়াল স্নায়ুগ্রন্থি বা সেরিব্রাল স্নায়ুগ্রন্থি (Brain or supra-oesophageal or cerebral ganglia)—মস্তকের পশ্চাৎ অংশে, গ্রাসনালীর পৃষ্ঠদেশে দুটি বৃহদাকার গোলাকৃতি মস্তিষ্ক বা সুপ্রা- ইসোফেজিয়াল স্নায়ুগ্রন্থি ঘন-সংলগ্ন অবস্থায় থাকে। প্রতিটি স্নায়ুগ্রন্থি—প্রোটোসেরিব্রাম, ডয়টেরোসেরিব্রাম ও ট্রাইটোসেরিব্রাম নামক তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত।

(ii) সাব-ইসোফেজিয়াল স্নায়ুগ্রন্থি (sub-oesophageal ganglia)—মস্তিষ্কের পশ্চাৎভাগে গ্রাসনালীর নিম্নদেশে এই স্নায়ুগ্রন্থি অবস্থিত এবং তিনটি স্নায়ুগ্রন্থির সমন্বয়ে গঠিত।

(iii) সারকাম ইসোফেজিয়াল কানেকটিভ (Circum-oesophageal connective)—মস্তিষ্ক ও সাব-ইসোফেজিয়াল স্নায়ুগ্রন্থি গ্রাসনালীর উভয় পাশে পরস্পরের সঙ্গে একটি করে মোট এক জোড়া স্নায়ু যোজক বা রজ্জু দ্বারা যুক্ত থাকে। যাদের সারকাম-ইসোফেজিয়াল কানেকটিভ বলে।

(iv) অঙ্কীয় স্নায়ুরজ্জু (ventral nerve cord)—সাব-ইসোফেজিয়াল স্নায়ুগ্রন্থির পশ্চাৎ প্রান্ত থেকে দুটি নিরেট স্নায়ুরজ্জু উৎপন্ন হয়ে দেহের অঙ্কদেশের মধ্যরেখা বরাবর উদরের প্রায় পশ্চাৎ প্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত হয়। একত্রে এদের বলা হয় অঙ্কীয় স্নায়ুরজ্জু। অঙ্কীয় স্নায়ুরজ্জুতে মোট নয়টি স্নায়ুগ্রন্থি অবস্থিত। এই নয়টির প্রথম তিনটি বক্ষদেশে এবং পরের ছয়টি উদর অংশে অবস্থিত। বক্ষদেশে অবস্থিত স্নায়ুগ্রন্থিগুলির একটি অগ্রবক্ষে, একটি মধ্যবক্ষে এবং একটি পশ্চাৎ বক্ষে অবস্থিত। এদের যথাক্রমে প্রোথোরাসিক, মেসোথোরাসিক এবং মেটাথোরাসিক স্নায়ুগ্রন্থি বলা হয়।

উদরে অবস্থিত ছয়টি উদর স্নায়ুগ্রন্থির প্রথম চারটি উদর স্নায়ুগ্রন্থি প্রথম চারটি উদর খণ্ডকের প্রতিটি খণ্ডকে একটি করে অবস্থিত। পঞ্চম উদর স্নায়ুগ্রন্থিটি পঞ্চম ও ষষ্ঠ উদর খণ্ডকের সংযোগ-স্থলে অবস্থিত। ষষ্ঠ উদর স্নায়ুগ্রন্থিটি অষ্টম উদর খণ্ডকে অবস্থিত এবং আকারে যথেষ্ট বড় এবং শেষ চারটি উদর খণ্ডকের স্নায়ুগ্রন্থি একত্রিত হয়ে গঠিত হয়। অঙ্কীয় স্নায়ুরজ্জু, ষষ্ঠ উদর স্নায়ুগ্রন্থিতে সমাপ্ত হয়।

(b) প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র (Peripheral nervous system) :

কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র থেকে উৎপন্ন যে স্নায়ুগুলি দেহের বিভিন্ন প্রান্তীয় অর্থাৎ দূরবর্তী অংশে প্রসারিত হয় এবং বিভিন্ন অঙ্গের কার্যকারিতার সমন্বয় সাধন করে, তারা সমবেতভাবে প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র গঠন করে। প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্রের স্নায়ুগুলির নীচে বর্ণনা দেওয়া হল—

(i) সুপ্রা-ইসোফেজিয়াল স্নায়ুগ্রন্থি থেকে উৎপন্ন স্নায়ুসমূহ—

1. অপটিক স্নায়ু— প্রোটোসেরিব্রাম থেকে এক জোড়া অপটিক স্নায়ু উৎপন্ন হয়ে চোখ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

2. অ্যান্টেনারী স্নায়ু— ডয়টেরোসেরিব্রাম থেকে এক জোড়া আন্টেনারী স্নায়ু উৎপন্ন হয়ে শুঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে।

3. ল্যাব্রাল স্নায়ু— এক জোড়া স্নায়ু ট্রাইটোসেরিব্রাম থেকে উৎপন্ন হয়ে ল্যাব্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে।

(ii) **সাব-ইসোফেজিয়াল স্নায়ুগ্রন্থি থেকে উৎপন্ন স্নায়ুসমূহ**—সাব-ইসোফেজিয়াল স্নায়ুগ্রন্থি থেকে উৎপন্ন ম্যান্ডিবুলার, মাক্সিলারি এবং লেবিয়াল স্নায়ুগুলি জোড়া হিসাবে যথাক্রমে ম্যান্ডিব্‌ল্‌, ম্যাক্সিলা ও লেবিয়াম পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

(iii) **বক্ষ স্নায়ুগ্রন্থি থেকে উৎপন্ন স্নায়ুসমূহ**—প্রতিটি বক্ষ স্নায়ুগ্রন্থি থেকে অনেকগুলি করে স্নায়ু উৎপন্ন হয় এবং বক্ষ পেশী এবং পায়ে স্নায়ু সরবরাহ করে। মেসোথোরাসিক ও মেটাথোরাসিক স্নায়ুগ্রন্থির স্নায়ুগুলি ডানা পর্যন্ত প্রসারিত হয়। এছাড়াও মেটাথোরাসিক স্নায়ুগ্রন্থি থেকে প্রথম উদর খণ্ডকেও স্নায়ু বিস্তৃত হয়।

(iv) **উদর স্নায়ুগ্রন্থি থেকে উৎপন্ন স্নায়ুসমূহ**—প্রথম পাঁচটি উদর স্নায়ুগ্রন্থি থেকে উৎপন্ন স্নায়ুগুলি দেহ প্রাকারের পৃষ্ঠীয় এবং অঙ্কীয় পেশী, শ্বাসছিদ্র, হৃৎপিণ্ড প্রভৃতি অঙ্গে গমন করে। ষষ্ঠ উদর স্নায়ুগ্রন্থি থেকে উৎপন্ন স্নায়ুগুলি দেহের সপ্তম থেকে দশম উদরখণ্ডকে, জননাঙ্গে, মলাশয়ে, অ্যানাল সারসি ও পুরুষ আরশোলার ক্ষেত্রে অ্যানাল স্টাইল ইত্যাদি অঞ্চলে বিস্তৃত হয়।

(c) সিমপ্যাথেটিক বা স্টোমাটোগ্যাস্টিক স্নায়ুতন্ত্র (Sympathetic or stomatogastric nervous system) :

এই স্নায়ুতন্ত্র চারটি প্রধান স্নায়ুগ্রন্থি যথা— ফ্রন্টাল, হাইপোসেরিব্রাল, ইনগ্লুভিয়াল এবং প্রোভেন্ট্রিকুলার নিয়ে গঠিত। এদের পারস্পরিক বিভিন্ন যোজক স্নায়ু এবং রেট্‌রোসেরিব্রাল কমপ্লেক্স নামক স্নায়ু জালক সমন্বয়ে গঠিত হয়।

ফ্রন্টাল স্নায়ুগ্রন্থি— গলবিলের উপরে, মস্তিষ্কের সামনে অবস্থিত এবং মস্তিষ্কের সঙ্গে স্নায়ু দ্বারা যুক্ত থাকে। **হাইপোসেরিব্রাল স্নায়ুগ্রন্থি,** রেকারেন্ট স্নায়ু দ্বারা হাইপোসেরিব্রাল স্নায়ুগ্রন্থির সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। **ইনগ্লুভিয়াল স্নায়ুগ্রন্থি** থেকে দুটি স্নায়ু উৎপন্ন হয়। যার একটি ক্রপের পৃষ্ঠদিকে ও অপরটি ক্রপের অঙ্কদিক বরাবর পশ্চাতে গমন করে এবং প্রোভেন্ট্রিকুলাস বা গিজার্ডের উপর অবস্থিত প্রোভেন্ট্রিকুলার স্নায়ুগ্রন্থির সঙ্গে সংযুক্ত হয়।

হাইপোসেরিব্রাল স্নায়ুগ্রন্থির উপরের দিকে রেট্‌রোসেরিব্রাল কমপ্লেক্স থাকে ও কর্পোরা কার্ডিয়াকা ও কর্পোরা অ্যালাটা নামক গ্রন্থি ও বিভিন্ন স্নায়ু যোজক দ্বারা গঠিত। কর্পোরা কার্ডিয়াকা ও কর্পোরা অ্যালেটায় নিউরোসিক্রিটারী কোষ থাকে। করপোরা কার্ডিয়াকা, স্নায়ু সংবেদী অঙ্গ হিসাবে কাজ করে এবং হৃৎস্পন্দন ও অগ্র পৌষ্টিকনালীর ক্রমসঙ্কোচন নিয়ন্ত্রণ করে। করপোরা অ্যালাটা থেকে হর্মোন ক্ষরিত হয়, যা প্রজনন ও রূপান্তরে আরশোলাকে সাহায্য করে।

সিমপ্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্রের স্নায়ুগুলি প্রধানত অগ্র ও মধ্য পৌষ্টিক নালী, লালাগ্রন্থি ও হৃৎপিণ্ড প্রভৃতি অংশে বিস্তার লাভ করে এবং ঐ সব অঙ্গের কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ করে।

2.5 অনুশীলনী

1. সংক্ষেপে প্যারামেসিয়ামের গমন পদ্ধতি বর্ননা করুন।
2. প্যারামেসিয়ামের জনন পদ্ধতি কত প্রকার? সংশ্লেষ পদ্ধতিতে ইহার জনন প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা দিন।
3. স্কাইফার ঘঠনের সচিত্র বর্ননা দিন।
4. স্কাইফার জল সংবহন পথ বিবৃত করুন।
5. স্পিকিউল কি? ইহার প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করুন।
6. স্কাইফার যৌন জনন ও পরিসউরণ-এর বর্ননা দিন।
7. কেঁচোর গমন অঙ্গ ও গমন পদ্ধতি সম্পর্কে লিখুন।
8. কেঁচোর রক্তবাহ কত প্রকারের? ইহার অনুদৈর্ঘ্য রক্তবাহগুলির বর্ননা দিন।
9. কেঁচোর সংবহন গতিপথের চিত্ররূপ লিখুন।
10. a) কেঁচোর রেচন অঙ্গ-এর নাম কি? ইহা কত প্রকার?
    b) কেঁচোর ব্যবধায়ক (Septal) নেফ্রিডিয়ার সচিত্র বর্ননা দিন।
11. কেঁচোর জনন তন্ত্রের চিত্র অঙ্গাক করুন।
12. কেঁচোর স্ত্রীজনন তন্ত্রের বিভিন্ন অংশ কি কি? ইহাদের ব্যাখ্যা দিন।
13. আরশোলার শ্বাসছিদ্র কত প্রকার ও কি কি? ব্যাখ্যা দিন।
14. আরশোলার শ্বসন পদ্ধতির বর্ননা দিন।
15. আরশোলার প্রধান রেচন অঙ্গ কি? ইহার বর্ননা দিন।
16. আরশোলার রক্ত কণিকা কত প্রকার? চিত্রসহ ঐ রক্ত কণিকাগুলির ব্যাখ্যা করুন।
17. আরশোলার রক্ত সংবহন পদ্ধতির বর্ননা দিন।
18. বহিরাকৃতিগতভাবে স্ত্রী ও পুরুষ আরশোলার পার্থক্যগুলি লিখুন।
19. কি কি অঙ্গ নিয়ে আরশোলার পুং জনন তন্ত্র গঠিত। চিত্রসহ বর্ননা করুন।
20. a) আরশোলার স্নায়ুতন্ত্র কয়টি ভাগে বিভক্ত ও কি কি?
    b) আরশোলার কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের ব্যাখ্যা দিন।

21 টীকা লিখুন—
a) সিলিয়াম, b) প্যারামেসিয়ামের পুষ্টি, c) স্পঞ্জোসিল, d) স্কাইফার কোষের প্রকারভেদ, e) মেটামেরিজম, f) কেঁচোর ত্বকীয় নেফ্রিডিয়া, g) শুক্রধানী, h) শ্বাসছিদ্র, i) হিমোসিপ, j) কনগ্লোবেট গ্রন্থি, k) কোলেটেরিয়াল গ্রন্থি।

2.6 উত্তরমালা

1. পৃষ্ঠা :- 2-3
2. পৃষ্ঠা :- 6-8
3. পৃষ্ঠা :- 9-10

4. পৃষ্ঠা :- 13-14
5. পৃষ্ঠা :- 16-17
7. পৃষ্ঠা :- 21-22
8. পৃষ্ঠা :- 22-24
9. পৃষ্ঠা :- 25
10. পৃষ্ঠা :- 26-27
11. পৃষ্ঠা :- 29
12. পৃষ্ঠা :- 30
13. পৃষ্ঠা :- 35
14. পৃষ্ঠা :- 37-38
15. পৃষ্ঠা :- 39
16. পৃষ্ঠা :- 41-42
17. পৃষ্ঠা :- 44
18. পৃষ্ঠা :- 45
19. পৃষ্ঠা :- 45-47
20. a) পৃষ্ঠা :- 50
21. a) পৃষ্ঠা :- 2-3

b) পৃষ্ঠা :- 5-6
c) পৃষ্ঠা :- 11
d) পৃষ্ঠা :- 14-15
e) পৃষ্ঠা :- 21
f) পৃষ্ঠা :- 28
g) পৃষ্ঠা :- 30
h) পৃষ্ঠা :- 35
i) পৃষ্ঠা :- 43
j) পৃষ্ঠা :- 46-47
k) পৃষ্ঠা :- 49

একক 3 ? পাইলা, তারামাছ ও ব্যালানোগ্লসাসের অঙ্গসংস্থান ও বিবরণ [Morphology and description of *Pila*, Starfish and *Balanoglossus*]

গঠন

3.1 পর্ব : মোলাস্কা

- **3.1.1** সাধারণ গঠন
- **3.1.2** শ্বসনতন্ত্র
- **3.1.3** রেচনতন্ত্র
- **3.1.4** স্নায়ুতন্ত্র
- **3.1.5** পাইলার পরিস্ফুরণ
- **3.1.6** অনুশীলনী
- **3.1.7** উত্তরমালা

3.2 পর্ব : একাইনোডারমাটা

- **3.2.1** অ্যাস্টেরিয়াসের সাধারণ গঠন
- **3.2.2** অ্যাস্টেরিয়াসের জলসংবহনতন্ত্র
- **3.2.3** অ্যাস্টেরিয়াসের লার্ভা দশা
- **3.2.4** অনুশীলনী
- **3.2.5** উত্তরমালা

3.3 পর্ব : হেমিকর্ডাটা

- **3.3.1** ব্যালানোগ্লোসাসের সাধারণ গঠন
- **3.3.2** ব্যালানোগ্লাসাসের গলবিলের গঠন
- **3.3.3** জননতন্ত্র এবং লার্ভার গঠন
- **3.3.4** লার্ভা দশা ও তার রূপান্তর
- **3.3.5** অনুশীলনী
- **3.2.6** উত্তরমালা

3.1 পর্ব : মোলাস্কা

3.1.1 সাধারণ গঠন (General organisation)

পাইলা গ্লোবোসা (Pila globosa) অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে মোলাস্কা পর্বের অন্তর্ভুক্ত একটি উভচরপ্রাণী। এরা সাধারণত আপেল শামুক নামে পরিচিত এবং গ্যাস্ট্রোপোডা শ্রেণির অন্তর্গত প্রাণী। পাইলা প্রজাতিটি ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে এবং ইথিওপিয়ান অঞ্চলে পাওয়া যায়। এদের পুষ্করিণী ও ঝিলের মিঠা জলে, যেখানে প্রচুর জলজ রসালো উদ্ভিদ জন্মায় সেই সকল পরিবেশে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এরা জলে ও স্থলে সুষ্ঠুভাবে বাস করতে সক্ষম বলে এদের উভচর শামুক বলা হয়।

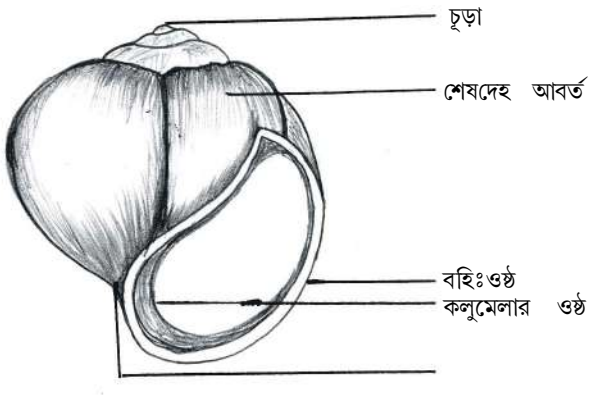

চিত্র 3.1 পাইলার খোলকের অঙ্কীয় দৃশ্য।

পাইলার দেহটি একটি ক্যালকেরিয়াস খোলকের মধ্যে আবদ্ধ থাকে। খোলকটি শাঁখ আকৃতির এবং একটি অক্ষকে কেন্দ্র করে সর্পিলভাবে আবর্তিত থাকে। খোলকের শীর্ষ আবর্তটিকে চূড়া বলে এবং এই অংশটি সর্বপ্রথম তৈরি হয় (চিত্র 3.1)। শেষ আবর্তটি সর্বাপেক্ষা চওড়া এবং দেহের অধিকাংশ অঙ্গ ধারণ করে থাকে বলে একে দেহ আবর্ত বলে। দেহ আবর্তটি একটি বৃহৎ ছিদ্রে শেষ হয় এবং একটি ঢাকনা দ্বারা সুরক্ষিত থাকে। ঢাকনাটির নাম **অপারকিউলাম** এবং এটা পাইলার পদের পশ্চাদতলে সংযুক্ত থাকে। অপারকিউলামের গাত্রের একটি সুনির্দিষ্ট কেন্দ্রবিন্দুকে বেষ্টন করে চক্রাকারে সজ্জিত অসংখ্য বৃদ্ধি রেখা বর্তমান। অপারকিউলামের অন্তর্গাত্রের মধ্যভাগে একটি সুস্পষ্ট ডিম্বাকৃতি অংশ থাকে। একে বস্ বলে এবং এই অঞ্চলটিতে অপারকিউলার পেশী প্রোথিত থাকে। খোলকের বৃহৎ ছিদ্রটির কিনারা মসৃণ এবং একে পেরিষ্টোম বলে। খোলকের কেন্দ্রস্থল থেকে উত্থিত

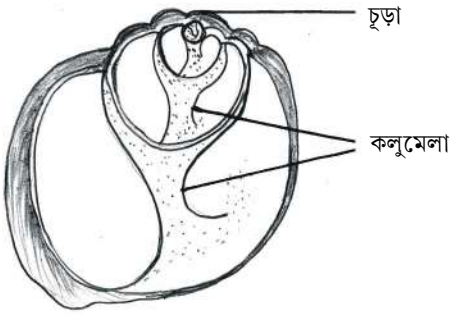

চিত্র 3.2 পাইলার খোলকের লম্বচ্ছেদে পৃষ্ঠ দৃশ্য

একটি সর্পিলাকার স্তম্ভ খোলকের ভিতরের দিকে অবস্থিত, একে **কলুমেলা** (columella) বলে। কলুমেলাটি ফাঁপা এবং আম্বিলিকাস ছিদ্রপথে বাইরে উন্মুক্ত হয়। পাইলার খোলকের আবর্তন কুণ্ডলী ডানদিকে আবর্তিত হলে সেই প্রকার কুণ্ডলীকে **দক্ষিণাবর্ত কুণ্ডলী** এবং ক্ষেত্রবিশেষে আবর্তন কুণ্ডলী, বামদিকে আবর্তিত হলে একে **বামাবর্ত কুণ্ডলী** বলে। খোলকের গাত্রে সমান্তরালভাবে সজ্জিত বৃদ্ধিরেখা পরিলক্ষিত হয় এবং এদের মধ্যে কয়েকটি রেখা খাঁজ রচনা করে। প্রতিটি খাঁজকে **ভেরিক্স** বলে।

চিত্র নং 3.3 অপারকুলামের বহির্গাত্রের দৃশ্য।

পাইলার খোলকটি অপসারণ করলে দেহ তিনটি অংশে বিভেদিত দেখা যায়, যথা মস্তক, ফুট বা পদ, এবং আন্তরপিন্ড। পাইলার মস্তকটি সুগঠিত এবং দুইজোড়া কর্ষিকা সংযুক্ত থাকে। কর্ষিকার পশ্চাতে একজোড়া ক্ষুদ্রবৃন্ত **ওমাটোফোরের** (omatophore) শীর্ষে চক্ষু অবস্থান করে। মস্তকের উভয়পার্শ্বে দুটি মাংসল উপবৃদ্ধি দৃষ্ট হয় এদের নূকাল (nuchal) লোব বলে। পাইলার ফুট বা পদটি পেশীবহুল এবং এতে অসংখ্য পেডালগ্রন্থি থাকে। ফুটের দ্বারা পাইলা ক্রিপিং বা হামাগুড়ি গমনে অভিযোজিত। পাইলার আন্তরপিন্ডের আবরণটিকে পেলিয়াম বা ম্যান্টল বলে এবং এটা মস্তক ও আন্তরপিণ্ডকে রক্ষা করে। পাইলার আন্তরযন্ত্র হিমোসিল নামক রক্তপূর্ণ গহ্বর দ্বারা আবৃত থাকে। প্রকৃত দেহগহ্বরটি পেরিকার্ডিয়াল গহ্বর, বৃক্ক এবং জনন অঙ্গ পরিবৃত।

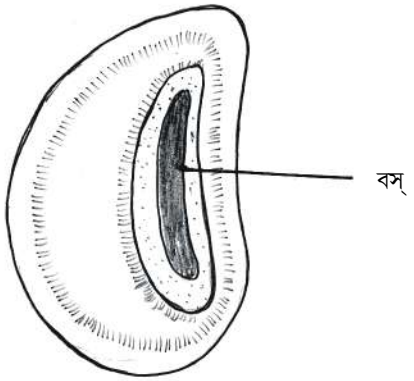

চিত্র 3.4 অপারকুলামের অন্তর্গাত্রের দৃশ্য

3.1.2 শ্বসনতন্ত্র (Respiratory system)

পাইলা জল ও স্থল উভয় পরিবেশে বসবাস করতে সক্ষম হওয়ায় ওরা জলীয় এবং বায়বীয় উভয় প্রকার শ্বসনে অভিযোজিত। ফলস্বরূপ উক্ত প্রাণীটিকে দ্বৈত শ্বসনক্ষম উভচর বলা হয়। এরা টিনিডিয়াম বা ফুলকার সহায়তার জলীয় এবং পালমোনারী থলি বা ফুসফুসের সহায়তায় বায়বীয় শ্বসনক্রিয়া সম্পন্ন করে।

A. টিনিডিয়াম বা ফুলকার গঠন ও কার্য :

(a) অবস্থান— পাইলার ম্যান্টল গহ্বরটি এপিটিনিয়া দ্বারা দুটি অসম্পূর্ণ প্রকোষ্ঠে বিভেদিত। দক্ষিণ প্রকোষ্ঠটিকে ব্রাঙ্কিয়াল প্রকোষ্ঠ এবং বামপ্রকোষ্ঠটিকে পালমোনারী প্রকোষ্ঠ বলে। টিনিডিয়ামটি দক্ষিণ প্রকোষ্ঠের পৃষ্ঠতলের পার্শ্ব প্রাকারে অবস্থিত।

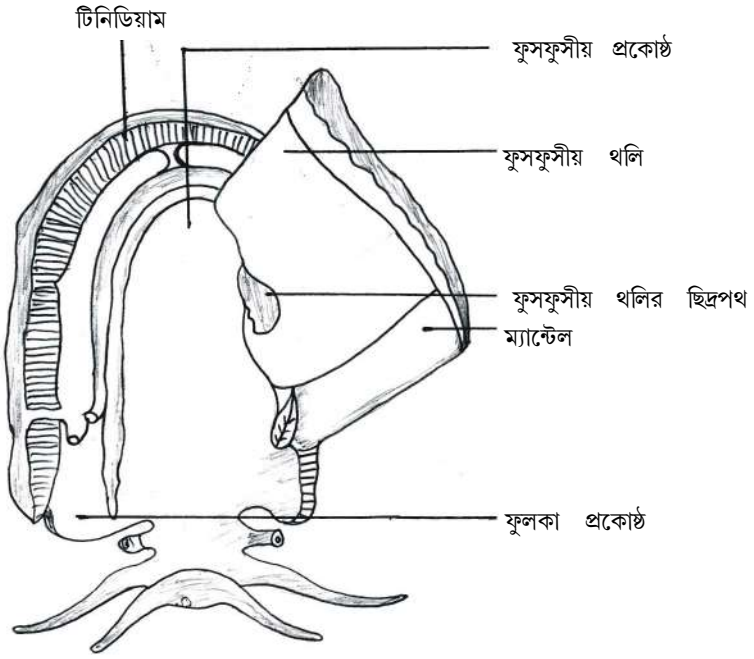

চিত্র 3.5 পাইলার দেহে টিনিডিয়াম ও ফুসফুস থলির অবস্থান

(b) গঠন— টিনিডিয়ামটি সারিবদ্ধভাবে সজ্জিত অসংখ্য ত্রিকোণাকৃতি ল্যামেলার সমন্বয়ে গঠিত। ল্যামেলাগুলি একটি সারিতে একটি অক্ষবরাবর সমান্তরালভাবে ম্যান্টল প্রাকারের সাথে প্রশস্ত অংশদ্বারা সংযুক্ত থাকে এবং অপর প্রান্তটি মুক্ত। এই ধরনের টিনিডিয়ামকে **মনোপেকটিনেট টিনিডিয়াম (monopectinate tenidium)** বলে। টিনিডয়ামের ব্রাঙ্কিয়াল ল্যামেলাগুলির আকার

সমান নয়। টিনিডিয়ামের মধ্যাংশের ল্যামেলাগুলি আকারে অপেক্ষাকৃত বড় কিন্তু প্রান্তেরদিকের ল্যামেলাগুলি ক্রমশ ক্ষুদ্রাকার হয়। প্রতিটি ল্যামেলার গাত্রে রক্তবাহ সমৃদ্ধ কয়েকটি অণুপ্রস্থ ভাঁজ থাকে। ল্যামেলার দক্ষিণ পার্শ্বে **অ্যাফারেন্ট** এবং বাম পার্শ্বে **ইফারেন্ট** রক্তবাহ অবস্থিত। প্রস্থচ্ছেদে প্রতিটি ব্রাঙ্কিয়াল ল্যামেলা দুটি আবরক কলাস্তর দ্বারা আবৃত। আবরক কলাস্তরে তিন প্রকার— (১) সিলিয়াযুক্ত স্তম্ভাকার কোষ (২) সিলিয়াবিহীন স্তম্ভাকৃতি এবং (৩) কয়েকটি গ্রন্থিময় কোষস্তর দৃষ্ট হয়।

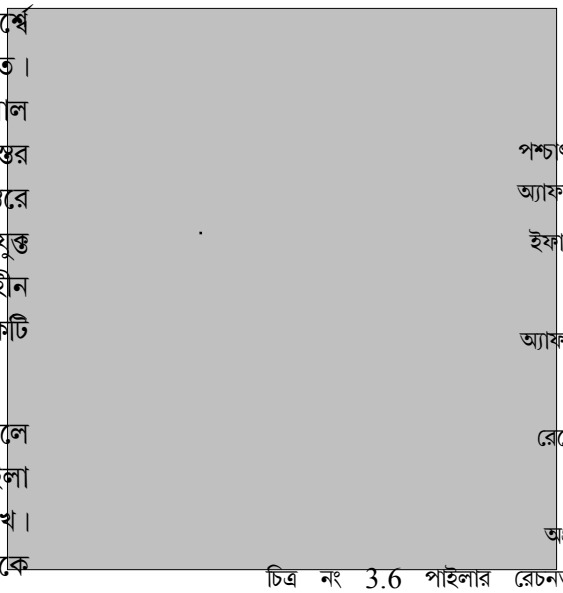

চিত্র নং 3.6 পাইলার রেচনতন্ত্র

(c) শ্বসন পদ্ধতি-জলে নিমজ্জিত থাকাকালীন পাইলা মস্তক ও পদটি প্রসারিত রাখে। শ্বসনের সময় বাইরে থেকে জলস্রোত বাম ন্যুকাল খন্ডের মধ্য দিয়ে ম্যান্টল গহ্বরে প্রবেশ করে এবং পরিশেষে এপিটিনিয়ার জল দক্ষিণ প্রকোষ্ঠে চলে আসে। দক্ষিণ প্রকোষ্ঠে টিনিডিয়ামের ল্যামেলাগুলি জল পরিবৃত হয় এবং জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন গ্রহণ করে। গ্যাসীয় বিনিময়ের পর ম্যান্টল গহ্বর থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড সমৃদ্ধ জল দক্ষিণ সাইফনের মাধ্যমে নিষ্কাশিত হয়।

B. পালমোনারী থলির (ফুসফুস) গঠন ও কার্য :

(a) অবস্থান ও গঠন— পালমোনারী থলি বা ফুসফুসটি একটি রুদ্ধ থলির ন্যায় ম্যান্টল গহ্বরের পালমোনারী প্রকোষ্ঠের পৃষ্ঠ প্রাকার থেকে সৃষ্ট হয়। এটি পাইলার এক বিশেষ অভিযোজন এবং বায়বীয় শ্বসন অঙ্গরূপে পরিগণিত। পালমোনারী থলি নিউমোস্টোম ছিদ্রপথে পালমোনারী প্রকোষ্ঠে উন্মুক্ত হয়। এই ছিদ্রটি দুটি কপাটিকা দ্বারা সুরক্ষিত। থলিটির পৃষ্ঠপ্রাকার রক্তবাহ সমৃদ্ধ। প্রস্থচ্ছেদে পালমোনারী থলিটি বহিঃস্থ এপিথেলিয়াম স্তর, বেসমেন্ট পর্দা, পেশীস্তর, রক্তজালকসমৃদ্ধ সংযোজক কলাস্তর এবং এন্ডোথেলিয়াম স্তর দ্বারা গঠিত।

(b) শ্বসন পদ্ধতি— ডাঙায় অবস্থান কালে পালমোনারী থলি বায়ুমন্ডলের বায়ু দ্বারা পরিপূর্ণ হয় এবং শ্বসনকার্য সম্পাদন করে। জলে অবস্থানরত অবস্থায় পাইলা মাঝে মাঝে জলপৃষ্ঠে এসে জলের উপরিতল বাম নুকাল খণ্ডটি প্রসারিত করে বায়ুমণ্ডলের বায়ু গ্রহণ করে। বাম নুকাল খন্ডটি

দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে প্রসারিত হয়ে একটি প্রলম্বিত শ্বসন নলে পরিণত হয়। শ্বসন নলের মুক্ত প্রান্তটি জলপৃষ্ঠের উপরে প্রসারিত হয়ে বায়ুমণ্ডলের বায়ু গ্রহণ করে এবং অপর প্রান্তটি পালমোনারী থলির ছিদ্রের সংস্পর্শে আসে। পালমোনারী থলি ও ম্যান্টল গহ্বর প্রাকারের সংকোচন ও প্রসারণের দ্বারা গ্যাসীয় বিনিময় সাধিত হয়। গ্যাসীয় বিনিময়ের পর একই পথে পালমোনারী প্রকোষ্ঠ থেকে বায়ু নিষ্কাশিত হয়। পালমোনারী থলির রক্তবাহগুলিতে গ্যাসীয় পদার্থের বিনিময় ঘটে।

স্থলে অবস্থান কালে পালমোনারী থলি সরাসরি বায়ুমন্ডলের বায়ু দ্বারা পূর্ণ হয় এবং শ্বসনক্রিয়া সম্পন্ন করে। পালমোনারী থলি দ্বারা শ্বসনকার্যের সময় ম্যান্টল গহ্বরের ব্র্যাঙ্কিয়াল প্রকোষ্ঠটি পালমোনারী প্রকোষ্ঠ থেকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক থাকে। কারণ এপিটিনিয়া প্রসারিত হয়ে ম্যান্টল গহ্বরের পৃষ্ঠতল স্পর্শ করে।

3.1.3 রেচনতন্ত্র (Excretory system)

A. রেচন অঙ্গ ও তার গঠন :

পাইলার রেচনক্রিয়া বৃক্ক দ্বারা সম্পাদিত হয় এবং একে **বোজেনাস-অঙ্গ** বলে (Organ of Bojanus)। বৃক্ক একজোড়া বৃক্কীয় প্রকোষ্ঠ, অগ্র ও পশ্চাৎ বৃক্ক প্রকোষ্ঠ নিয়ে গঠিত।

(a) অগ্রবৃক্কীয় প্রকোষ্ঠ— অগ্র বৃক্কীয় প্রকোষ্ঠটি ক্ষুদ্রাকৃতি, রক্তাভ ডিম্বাকার থলির ন্যায় এবং এটি পেরিকার্ডিয়ামের সম্মুখে অবস্থিত। অগ্রবৃক্কীয় প্রকোষ্ঠটির একপ্রান্ত পশ্চাৎবৃক্কীয় প্রকোষ্ঠে উন্মুক্ত হয় এবং অপর প্রান্তটি দক্ষিণ ম্যান্টল গহ্বরে এপিটিনিয়াল খাঁজের নিকটে একটি ছিদ্রপথে উন্মুক্ত হয়। অগ্র ও পশ্চাৎ বৃক্কীয় প্রকোষ্ঠের ছিদ্র পথে একটি কপাটিকা বর্তমান। অগ্রবৃক্কীয় প্রকোষ্ঠের অন্তর্গাত্র ভাঁজ হয়ে অসংখ্য ল্যামেলি উৎপন্ন করে। বৃক্কীয় প্রকোষ্ঠের পৃষ্ঠদেশে মধ্যঅক্ষ বরাবর বহির্বাহী রেনাল সাইনাসের দুই পার্শ্বে এবং অঙ্কীয়দেশে অন্তর্বাহীর রেনাল সাইনাসের দুই পার্শ্বে ল্যামেলাগুলি বিশেষ রীতিতে সজ্জিত থাকে (চিত্র নং 3.6)।

(b) পশ্চাৎ বৃক্কীয় প্রকোষ্ঠ— এই বৃক্কীয় প্রকোষ্ঠটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ এবং বাদামী বা ধূসর বর্ণের হয়। এটি অগ্রবৃক্ক প্রকোষ্ঠের পশ্চাতে ও মলাশয়ের বামপার্শ্বে এবং পেরিকাডিয়াম ও পৌষ্টিক গ্রন্থির নিকটে অবস্থিত। এই প্রকোষ্ঠটি পেরিকার্ডিয়াম থেকে উত্থিত রেনোপেরিকার্ডিয়াল প্রাকার দ্বারা বিভেদিত। এটি একটি লম্বাটে রেনোপেরিকার্ডিয়াল ছিদ্রপথে পেরিকার্ডিয়াল গহ্বরে উন্মুক্ত থাকে। প্রকোষ্ঠটি বহির্বাহী ও অন্তর্বাহী রেনাল শিরাদ্বয় সমৃদ্ধ (চিত্র নং 3.6)।

B. রেচন পদ্ধতি :

রক্তবাহসমৃদ্ধ বৃক্কের উভয় প্রকোষ্ঠে রক্ত থেকে নাইট্রোজেন ঘটিত বর্জ্য পদার্থ শোষিত হয়।

পশ্চাৎ প্রকোষ্ঠ থেকে শোষিত রেচনপদার্থ অগ্রপ্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে এবং ঐ স্থান হতে শোষিত রেচন পদার্থ রেচন নালীর মাধ্যমে ম্যান্টল গহ্বরে পরিত্যক্ত হয়। পরিশেষে বহিঃপ্রবাহী জলধারার মাধ্যমে রেচন পদার্থসমূহ সাইফন দ্বারা বহিঃপরিবেশে বিমুক্ত হয়। পাইলা মুখ্যতঃ অ্যামোনিয়া, অ্যামোনিয়া যৌগ এবং ইউরিয়া রেচন পদার্থরূপে পরিত্যাগ করে। স্থলে বসবাস কালে এটি জলে অদ্রাব্য ইউরিক অ্যাসিড রেচন পদার্থ উৎপন্ন করে এবং তা জল সংরক্ষণের একটি প্রকৃষ্ট উপায়।

3.1.4 স্নায়ুতন্ত্র (Nervous system)

পাইলার স্নায়ুতন্ত্র কয়েকটি গ্যাংগ্লিয়া, কমিশিওর (commissure), কানেকটিভ (cannective), ও নার্ভ লইয়া গঠিত।

A. গ্যাংগ্লিয়া (Ganglia)

(i) সেরিব্রাল গ্যাংগ্লিয়া (Cerebral ganglia) : একজোড়া, মুখপিন্ডের পৃষ্ঠতলের উভয়পার্শ্বে অবস্থিত। প্রতিটি সেরিব্রাল গ্যাংগ্লিয়ার অগ্র ও পশ্চাৎ অংশ থেকে বহু সূক্ষ্ম স্নায়ু বাহির হয় এবং তুন্ড, কর্ষিকা, চক্ষু ইত্যাদি অঙ্গো স্নায়ু সরবরাহ করে।

(ii) বাক্কাল গ্যাংগ্লিয়া (Buccal ganglia) : একজোড়া বাক্কাল গ্যাংগ্লিয়া বাক্কাল পিন্ডের উপরে অগ্রনালীর প্রতিপার্শ্বে পেশী দ্বারা আবৃত অবস্থায় থাকে। বাক্কাল গ্যাংগ্লিয়া থেকে উৎপন্ন স্নায়ু মুখপিন্ড, লালাগ্রন্থি, গ্রাসনালীতে বিস্তার লাভ করে।

(iii) প্লুরোপেডাল গ্যাংগ্লিয়া (Pluropedal ganglia) : মুখপিন্ডের অঙ্কীয়তলের পার্শ্বদিকে একটি করে প্লুরোপেডাল গ্যাংগ্লিয়া অবস্থিত। প্রতিটি গ্যাংগ্লিয়ন আয়তাকার এবং একটি বহিঃপার্শ্বস্থ প্লুরাল গ্যাংগ্লিয়ন এবং একটি অন্তঃপার্শ্বস্থ পেডাল গ্যাংগ্লিয়নের সংযুক্তির ফলে সৃষ্টি হয়েছে। দক্ষিণ প্লুরোপেডাল গ্যাংগ্লিয়ানের সাথে ইনফ্রাইনটেসটিনাল গ্যাংগ্লিয়ন মিলিত হয়।

এই গ্যাংগ্লিয়া থেকে উৎপন্ন স্নায়ুসমূহ মাংসলপদ, এপিটিনিয়া, ম্যান্টল পর্দা, ন্যূকাল লোব, অসফ্রাডিয়াম ও টিনিডিয়ামে বিস্তৃত হয়েছে।

(iv) ভিসেরাল গ্যাংগ্লিয়া (Visceral ganglia) : প্রকৃতপক্ষে দুটি মাকুর ন্যায় গ্যাংগ্লিয়া একত্রিত হয়ে ভিসারাল গ্যাংগ্লিয়াটি হৃৎপিন্ডের সন্নিকটে এবং দেহের পশ্চাৎ দিকে অবস্থিত। এই গ্যাংগ্লিয়া থেকে উৎপন্ন স্নায়ুসমূহ পৌষ্টিক গ্রন্থি বৃক্ক ও জনন অংশে বিস্তার লাভ করে।

(v) সুপ্রাইনটেসটিনাল গ্যাংলিয়ন (Supraintestinal ganglia) : একটি সুপ্রাইনটেসটিনাল গ্যাংগ্লিয়ন বামপার্শ্বস্থ প্লুরোভিসেরাল কানেক্টিভের উপর এবং বাম প্লুরোপেডাল গ্যাংগ্লিয়নের সন্নিকটে অবস্থিত। এই গ্যাংগ্লিয়ন থেকে উৎপন্ন স্নায়ু ম্যান্টল পর্দা ও টিনিডিয়ামে বিস্তার লাভ করেছে।

B. কমিশিওর :

দুইটি একই প্রকার গ্যাংগ্লিয়া একটি নার্ভ দ্বারা যুক্ত হইলে উক্ত নার্ভটিকে **কমিশিওর (Commissure)** বলে। পাইলার সেরিব্রাল কমিশিওর দুইটি সেরিব্রাল গ্যাংগ্লিয়া, বাক্কাল কমিশিওর, দুটি বাক্কাল গ্যাংগ্লিয়া এবং পেডাল কমিশিওর দুটি প্লুরোপেডাল গ্যাংগ্লিয়ার সংযোজক স্নায়ু তন্তু।

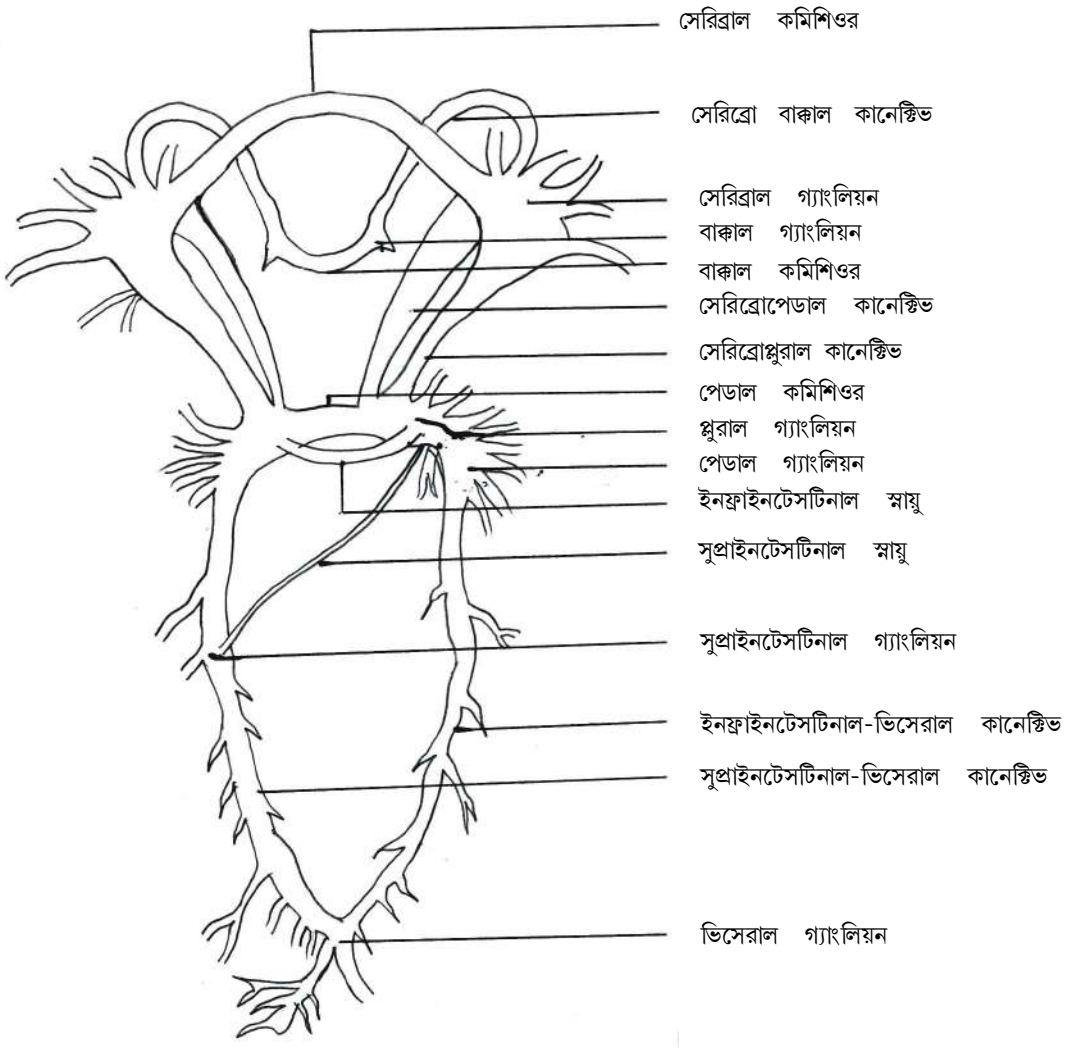

চিত্র 3.6 পাইলার স্নায়ুতন্ত্রের চিত্ররূপ

*গ্যাংগ্লিয়া=বহুবচন ; একবচন=গ্যাংগ্লিয়ন

C. কানেকটিভ্ :

দুটি ভিন্নধর্মী গ্যাংগ্লিয়াকে কোনো নার্ভ যুক্ত করলে সংযোগকারী নার্ভটিকে কানেক্টিভ (Connective) বলে।

(i) সেরিব্রোবাক্কাল কানেক্টিভ (Cerebrobuccal Connective) : এটি দুইটি এবং সেরিব্রাল গ্যাংগ্লিয়ন ও বাক্কাল গ্যাংগ্লিয়নকে যুক্ত করে।

(ii) সেরিব্রোপেডাল ও সেরিব্রোপ্লুরাল কানেক্টিভ (Cerebropedal and Cerebroplural Connective) : প্রতিটি প্লুরোপেডাল গ্যাংগ্লিয়ন দুটি নার্ভ দ্বারা সেই পাশের সেরিব্রাল গ্যাংগ্লিয়নের সঙ্গে যুক্ত। এদের একটিকে **সেরিব্রোপেডাল** এবং অন্যটিকে **সেরিব্রোপ্লুরাল** কানেক্টিভ বলে।

(iii) প্লুরোভিসেরাল কানেক্টিভ (Pleurovisceral Connective) : প্লুরোপেডাল গ্যাংগ্লিয়ার প্লুরাল গ্যাংগ্লিয়ন ও ভিসেরাল গ্যাংগ্লিয়নের সংযোগকারী নার্ভদুটিকে **প্লুরোভিসেরাল কানেক্টিভ** বলে। দক্ষিণ পার্শ্বস্থ প্লুরোভিসেরাল কানেক্টিভকে **ইনফ্রাইনটেসটিনাল ভিসেরাল কানেক্টিভ** এবং বামপার্শ্বস্থ প্লুরোভিসেরাল কানেক্টিভকে **সুপ্রাইনটেসটিনাল কানেক্টিভ** বলে।

সুপ্রাইনটেসটিনাল গ্যাংগ্লিয়নের দক্ষিণ পাশ থেকে উৎপন্ন হয়ে এবং অন্ননালীর পৃষ্ঠদেশ বরাবর তির্যকভাবে বিস্তারিত হয়ে প্লুরোপেডাল গ্যাংগ্লিয়নের সাথে যুক্ত নার্ভটিকে **সুপ্রাইনটেসটিনাল** নার্ভ বলে। একটি সূক্ষ্ম **ইনফ্রাইনটেসটিনাল** নার্ভ বিপরীত দিকে অবস্থিত দুটি প্লুরালগ্যাংগ্লিয়াকে যুক্ত করে।

3.1.5 পাইলার পরিস্ফুরণ

পাইলার জীবনচক্রে কোনো অন্তর্বর্তী লার্ভা দশা পরিলক্ষিত হয় না। এদের পরিস্ফুরণ প্রত্যক্ষ ধরনের, অর্থাৎ নিষিক্ত ডিম্বক সরাসরি শিশু পাইলায় পরিণত হয়। সিক্ত পরিবেশে স্ত্রী পাইলা প্রায় ২০০-৮০০টি নিষিক্ত ডিম্বাণু অগভীর গর্তে রেখে দেয়। পরিস্ফুটনের সময় আন্তরপিন্ড ও খোলকটি কুন্ডলী গঠন করে এবং **ঘূর্ণন বা টর্সণ** প্রক্রিয়ার দ্বারা দেহটি অপ্রতিসম হয়ে পড়ে।

3.1.6 অনুশীলনী

1. পাইলার শ্বসন অঙ্গের নাম কি? টিনিডয়ামের গঠন ও কাজ লিখুন।
2. পাইলার শ্বসন পদ্ধতির ব্যাখ্যা দিন।
3. পাইলার রেচন অঙ্গ কি কি? ইহাদের গঠনের বর্ননা দিন।
4. পাইলার স্নায়ুতন্ত্রের সচিত্র বর্ননা দিন।
5. সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন—
   (a) পালমোনারী থলি, (b) বোজেনাস অঙ্গ, (c) কানেক্টিভ, (d) কমিশিওর, (e) পাইলার পরিস্ফুরণ।

3.1.7 উত্তরমালা

1. পৃষ্ঠা – 90-91 দেখুন
2. পৃষ্ঠা – 92 দেখুন
3. পৃষ্ঠা – 92 দেখুন
4. পৃষ্ঠা – 93-94
5. a) পৃষ্ঠা – 91
   b) পৃষ্ঠা – 92
   c) পৃষ্ঠা – 94
   d) পৃষ্ঠা – 95
   e) পৃষ্ঠা – 95

3.2 পর্ব : একাইনোডারমাটা (Echinodermata)

3.2.1 অ্যাস্টেরিয়াসের সাধারণ (General organisation of Asterias)

অ্যাস্টেরিয়াস বা তারামাছ (star fish) একাইনোডার্মাটা পর্বভুক্ত এবং পৃথিবীব্যাপী বিস্তারিত সামুদ্রিক প্রাণী। এরা মাংসাশী এবং প্রস্তর সমন্বিত সমুদ্রতলে বসবাসে অভিযোজিত।

এদের দেহ অরীয়ভাবে প্রতিসম এবং আকৃতি পঞ্চবাহু তারার ন্যায়। দেহের কেন্দ্রীয় অংশটিকে সেন্ট্রাল ডিস্ক বলে। এর সাথে পাঁচটি সমদূরবর্তী প্রতিসম বাহু যুক্ত থাকে। সেন্ট্রাল ডিস্কের সংযোগস্থলে বাহুর মূল বেশ প্রশস্ত এবং বাহুর অগ্রাংশ ক্রমশ সংকীর্ণ হয়ে শাঙ্কব আকার ধারণ করে।

এদের দেহ দুটি তলে বিভক্ত। উপরের তলটি উত্তল এবং গাঢ় ধূসর বর্ণ যুক্ত হয়, একে অ্যাবোরাল তল বলে। অপরপক্ষে নিম্নতলটি সমতল এবং বর্ণহীন হয়, একে সম্মুখ বা মৌখিক বা ওরাল তল বলে। দেহের বহিরাবরণটি সুদৃঢ় এবং অসংখ্য অসিক্‌ল্‌ সমন্বিত হয়। দেহের ওরাল তলে এবং সেন্ট্রাল ডিস্কের কেন্দ্রস্থলে একটি পাঁচভাগে বিভক্ত ছিদ্র থাকে, একে মুখছিদ্র বলে। মুখছিদ্রটি একটি ঝিল্লীময় পেরিস্টোম দ্বারা পরিবৃত থাকে এবং পেরিস্টোমে পাঁচগুচ্ছ পিড়কা (papilla) সজ্জিত থাকে, একে **ওরাল প্যাপিলি** বলে (চিত্র নং 3.8, 3.9)।

প্রতিটি বাহুর ওরাল তলে মুখছিদ্র হতে উৎপন্ন হয়ে অগ্রাংশ পর্যন্ত প্রসারিত একটি করে সংকীর্ণ খাঁজ বর্তমান, একে অ্যাম্বুলাক্রাল গ্রুভ বলে। প্রতিটি অ্যাম্বুলাক্রাল গ্রুভের পাশে দুই বা ততোধিক সারির সঞ্চালন ক্ষমতাযুক্ত কন্টক সজ্জিত থাকে, এই কন্টকসমূহকে অ্যাম্বুলাক্রাল স্পাইন বলে। দেহের অ্যাবোরাল তলে অসিক্‌ল্‌ দ্বারা সুরক্ষিত কন্টকসমূহের অন্তর্বর্তী অঞ্চলে অসংখ্য ছিদ্র পরিলক্ষিত হয়। ছিদ্রগুলিকে ডারমাল পোর বা ত্বক ছিদ্র বলে।

অ্যাস্টেরিয়াসের অ্যাবোরাল তলের কেন্দ্রস্থলে একটি সূক্ষ্ম ছিদ্র বর্তমান, এটি পায়ুছিদ্র। দেহের উক্ত তলে পাঁচটি বাহুর মধ্যে দুটি বাহুর মধ্যবর্তী স্থানে **ম্যাড্রিপোরাইট (madreporite)** পরিলক্ষিত হয় যা আকৃতিতে চ্যাপ্টা চক্রাকার প্লেটের ন্যায় এবং এতে অসংখ্য খাঁজ থাকে। এই খাঁজগুলিতে অসংক্ষ্ম সূক্ষ্ম রন্ধ্র বর্তমান। দেহের সর্বত্র অসংখ্য আণুবীক্ষণিক উপাঙ্গ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকে, এদের **পেডিসিলারি** বলে। এরা অ্যাস্টেরিয়াসের রক্ষণ অঙ্গ। অ্যাস্টেরিয়াসের দেহে অসংখ্য ফাঁপা উপবৃদ্ধি শ্বসন অঙ্গরূপে কাজ করে, এদের **প্যাপুলা*** বলে (চিত্র নং 3.10)।

অ্যাস্টেরিয়াসের প্রতিটি অ্যাম্বুলাক্রাল গ্রুভে দুই সারি কোমল নলাকার চলন অঙ্গ আছে। এদের **টিউব-ফিট** বা নালী পদ বা **পোডিয়া** বলে। প্রতিটি টিউবফুটের অগ্রে একটি সাকার বা চোষক থাকে।

অ্যাম্বুলাক্রাল গ্রুভের শীর্ষে একটি করে ক্ষুদ্রাকার লোহিত বর্ণবিশিষ্ট চক্ষু থাকে। কয়েকটি অসিলাই দ্বারা চক্ষু গঠিত। চক্ষুর সামান্য উপরে একটি অযুগ্ম কর্ষিকা ঘ্রাণেন্দ্রিয়রূপে কাজ করে, একে টারমিনাল টেনটাক্‌ল্‌ বলে।

P* একবচন Papulla, বহুবচন Papullae,

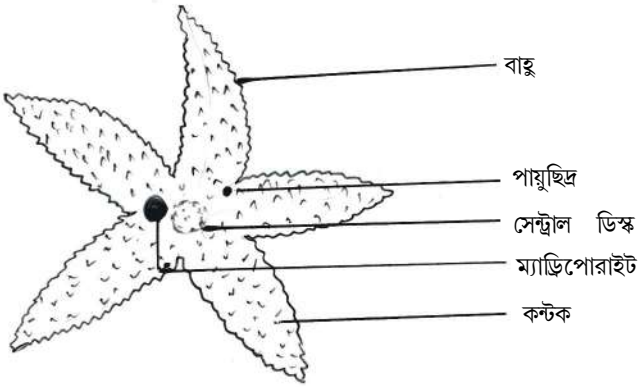

চিত্র নং 3.8 : অ্যাস্টেরিয়াসের অ্যাবোরাল তল

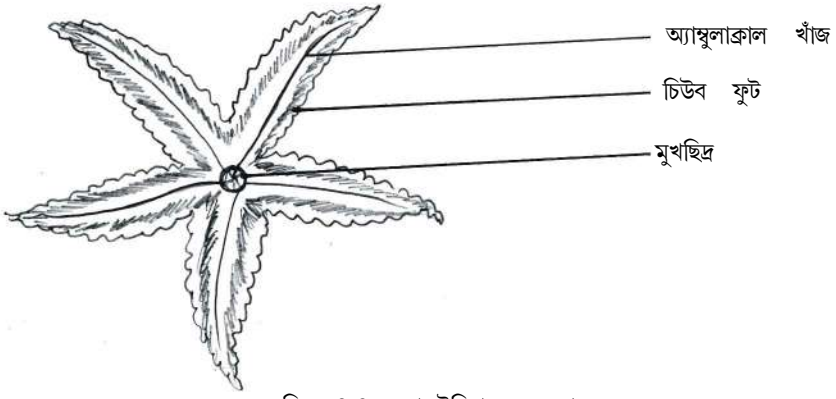

চিত্র 3.9 অ্যাস্টেরিয়াসের ওরাল তল।

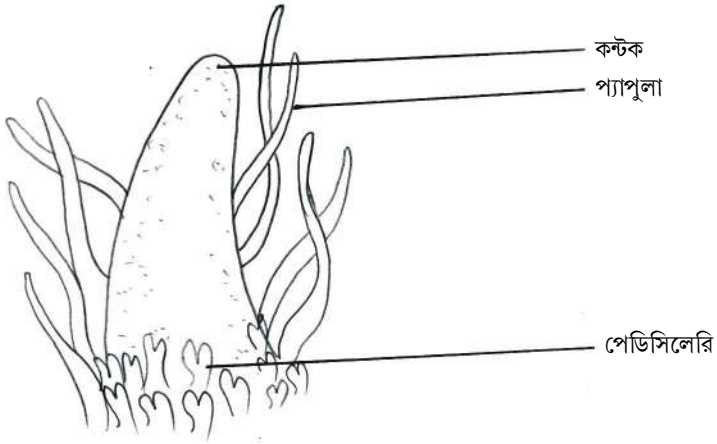

চিত্র 3.10 অ্যাস্টেরিয়াসের কন্টক, প্যাপুলি ও পেডিসিলেরি

3.2.2 অ্যাস্টেরিয়াসের জলসংবহনতন্ত্র (Water Vascular System)

জলসংবহনতন্ত্র একাইনোডার্মাটা বা কন্টকত্বক প্রাণীদের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অ্যাস্টেরিয়াসের জীবনচক্রে জলসংবহনতন্ত্র বিশেষ ভূমিকা গঠন করে। এবং এই তন্ত্র অন্য কোন প্রাণীকূলে অনুপস্থিত। বিভিন্ন প্রকার নালী এবং নালীপদ সিলোম থেকে উৎপন্ন হয়ে এই বিশেষতন্ত্রটি গঠিত হয়েছে (চিত্র 3.11)। নিম্নলিখিত অংশগুলি নিয়ে অ্যাস্টেরিয়াসের জলসংবহনতন্ত্রটি গঠিত—

(a) ম্যাড্রিপোরাইট (Madreporite) : প্রাণীটির অ্যাবোরাল তলে অবস্থিত গোলাকার চাকতির ন্যায় অঙ্গটিকে বলে ম্যাড্রিপোরাইট। এতে অসংখ্য অরীয়ভাবে প্রসারিত খাঁজ বা নালিকা বিদ্যমান এবং খাঁজগুলিতে অসংখ্য রন্ধ্র থাকে। প্রতিটি রন্ধ্র থেকে একটি করে নালী উৎপন্ন হয়ে পোর ক্যানাল (pore canal) গঠন করে। পোরক্যানালগুলি পরস্পর যুক্ত হয়ে সংগ্রাহক নালী গঠন করে এবং ম্যাড্রিপোরাইট অ্যাম্পুলায় উন্মুক্ত হয়। অ্যাম্পুলাটি নিম্নগামী হয়ে **স্টোন ক্যানাল** (stone canal) গঠন করে।

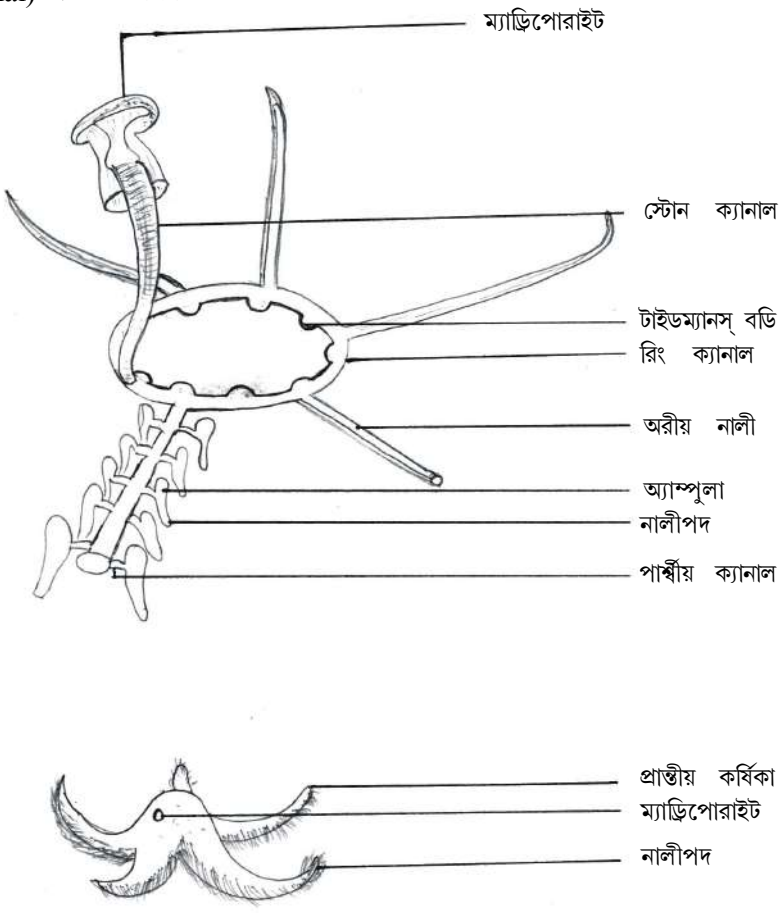

চিত্র 3.11 অ্যাস্টেরিয়াসের জলসংবহনতন্ত্রের অঙ্গসমূহের চিত্ররূপ

(b) স্টোন ক্যানাল (Stone Canal) : এটি 'S' অক্ষরের ন্যায় একটি উল্লম্ব নালী। এর গাত্রে বলয়াকার চূনজাতীয় পদার্থের আস্তরণের জন্য এর নাম স্টোন ক্যানাল হয়েছে। স্টোন ক্যানালের অন্তর্গাত্র থেকে একটি ভাঁজ উত্থিত হয়ে স্টোন ক্যানালের গহ্বরে প্রসারিত থাকে। এই ভাঁজটির অগ্রভাগ দুইভাগে বিভক্ত হয়ে দুটি ল্যামেলি গঠন করে। অ্যাক্সিয়াল সাইনাস নামক সংবহনতন্ত্র নালিকা স্টোন ক্যানালকে পরিবৃত করে রাখে। অ্যাক্সিয়াল সাইনাস স্টোন ক্যানালের উপরিভাগে একটি ছিদ্র দ্বারা উন্মুক্ত হয়। স্টোন ক্যানালটি একটি প্রশস্ত পঞ্চভুজাকার রিংক্যানালে উন্মুক্ত হয়।

(c) রিং ক্যানাল (Ring Canal) : রিং ক্যানালটি অ্যাস্টেরিয়াসের সম্মুখ তলে অবস্থিত এবং মুখগহ্বরকে বেষ্টিত করে থাকে। এটা পঞ্চভুজাকৃতির হয়। রিং ক্যানালে নিম্নলিখিত উপবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়—

(i) টাইডম্যানস বডি (Teidman's body) : এটি রিং ক্যানালের অন্তঃপ্রাকারে আন্তঃঅরীয় অঞ্চলে যুক্ত থাকে। এরা সংখ্যায় নয়টি এবং স্ফীতকায় বস্তুবিশেষ। টাইডম্যানস্ বডির শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়া সম্বন্ধে কোনো সঠিক ধারণা নেই। অধিকাংশ প্রাণীবিদ এদের লসিকা গ্রন্থিরূপে বর্ণনা করেন। এই বস্তুগুলি থেকে সিলোমোসাইট বা অ্যামিবোসাইট কোষ উৎপন্ন হয় এবং এরা জলসংবহনতন্ত্রের তরলে ছড়িয়ে পড়ে।

(d) রেডিয়াল ক্যানাল (Radial Canal) : রিং ক্যানাল থেকে পাঁচটি অরীয় নালী বা রিং ক্যানাল উৎপন্ন হয়ে প্রতিটি বাহুতে বিস্তৃত থাকে। প্রতিটি রেডিয়াল ক্যানাল অ্যাম্বুলাক্রাল খাঁজ বরাবর বাহুর প্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত এবং টারমিন্যাল টেনট্যাক্যলের গহ্বররূপে পরিসমাপ্ত হয়।

(e) ল্যাটারাল ক্যানাল (Lateral Canal) বা পার্শ্বীয় নালিকা বা পোডিয়াল ক্যানাল (Podial Canal) : রেডিয়াল ক্যানালের পার্শ্ব থেকে ক্ষুদ্র শাখা নালী উৎপন্ন হয়—এদের ল্যাটারাল বা পার্শ্বীয় বা পোডিয়াল ক্যানাল বলে। প্রতিটি ল্যাটারাল ক্যানাল অ্যাম্বুলাক্রাল ছিদ্রে প্রসারিত হয়।

(f) নালীপদ বা টিউব ফুট (Tube Foot) : প্রতিটি পার্শ্বীয় নালিকা দুটি শাখায় বিভক্ত হয়—একটি শাখা নালীপদ বা টিউবফুট গহ্বর সৃষ্টি করে এবং অন্যটি অ্যাম্পুলা অংশে উন্মুক্ত হয়। অ্যাম্পুলাগুলি গোলাকার থলির ন্যায় এবং প্রতিটি অ্যাম্বুলাক্রাল খাঁজের পাশে এক বা দুই সারিতে সজ্জিত থাকে। সাধারণত প্রতিটি নালীপদের সাথে একটি করে অ্যাম্পুলা যুক্ত থাকে। নালীপদের দূরবর্তী প্রান্তে চোষক বর্তমান।

ম্যাড্রিপোরাইট → স্টোন ক্যানাল → রিং ক্যানাল → রেডিয়াল ক্যানাল → পার্শ্বীয় নালীকা → নালীপদ

জলসংবহনতন্ত্রে জলপ্রবাহ :

ম্যাড্রিপোরাইট থেকে জল স্টোন ক্যানালের মধ্য দিয়ে রিং ক্যানালে প্রবেশ করে। সেখান থেকে জল রেডিয়াল ক্যানাল ও পার্শ্বীয় নালিকা দিয়ে নালীপদে পৌঁছায়।

জলসংবহনতন্ত্রের কাজ :

1. গমন— জলসংবহনতন্ত্র প্রধানত গমন প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। গমনক্রিয়ায় অ্যাস্টেরিয়াসের জল সংবহনতন্ত্র হাইড্রলিক প্রেসের ন্যায় কাজ করে। প্রতিটি অ্যাম্বুলাক্রাল গ্রুভে দুই সারিতে সজ্জিত নলাকার টিউবফিটের অগ্রে চোষকযন্ত্র প্রসারণক্ষম এবং প্রাণীটি যে দিকে অগ্রসর হয় সেইদিকে এরা প্রসারিত হয়। টিউবফিটের ক্রমাগত সংকোচন ও প্রসারণের ফলে অ্যাস্টেরিয়াস সমুদ্রতলে গমনে সক্ষম হয়। যখন প্রাণীটি কোনো বিশেষ দিকে অগ্রসর হয় তখন সেই পার্শ্বের বাহু সমুদ্র তল থেকে উত্তোলিত ও প্রসারিত হয়। অ্যাম্পুলার পেশীর সংকোচনের ফলে নালীপদ প্রসারিত হয় এবং জল নালীপদে প্রবেশ করে। পার্শ্বীয় নালীর উৎসস্থলে কপাটিকার উপস্থিতির ফলে জল রেডিয়াল ক্যানালে প্রবেশ করতে পারে না। তরলের (জলের) চাপে নালীপদ প্রসারিত হয় এবং নালীপদের অগ্রে অবস্থিত চোষক সমুদ্রতলের সাথে নিজেদের আটকে রাখে, ফলে চোষকযন্ত্রের কেন্দ্রে শূন্যতা সৃষ্টি হয়। অতঃপর নালীপদের পেশীর সংকোচনের ফলে নালীপদটি সংকুচিত হয়, ফলে নালীপদ থেকে জল পুনরায় অ্যামপুলাতে প্রবেশ করে এবং দেহটিকে সম্মুখদিকে এগিয়ে দেয়। নালীপদ শিথিল হয় এবং বাহুটিকে সমুদ্রতল থেকে নিজেদের মুক্ত করে। এইভাবে পুনরায় নালীপদগুলি প্রসারিত হয় এবং চোষকযন্ত্রগুলি নতুনস্থানে প্রতিস্থাপিত হয়। এইভাবে ক্রমসংকোচন ও প্রসারণের ফলে সমুদ্রতলে গমনক্রিয়া সংঘটিত হয়।

2. খাদ্যসংগ্রহ— জলসংবহনতন্ত্রের সাহায্যে প্রতিটি নালীপদ প্রভূত বলপ্রয়োগ করে ঝিনুকের খোলকদ্বয়কে উন্মুক্ত করে এবং মাংসল অংশ খাদ্যরূপে গ্রহণ করে। এছাড়া এই তন্ত্র শ্বসনে ও সম্ভবত রেচন ক্রিয়ায়ও সাহায্য করে।

3.2.3 অ্যাস্টেরিয়াসের লার্ভা দশা (Larval stages of Asterias)

অ্যাস্টেরিয়াসের জীবনচক্রে **বাইপিনেরিয়া (Bipinneria)** লার্ভা এবং ব্রাকিওলেরিয়া (Brachiolaria) লার্ভা দশা দেখা যায়। অ্যাস্টেরিয়াস একলিংগ প্রাণী কিন্তু কোনো যৌনদ্বিরূপতা পরিলক্ষিত হয় না। শুক্রাশয় ও ডিম্বাশয়ের আকার প্রায় একই রকমের হয় এবং একটি পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে পাঁচজোড়া শুক্রাশয় বা ডিম্বাশয় থাকে। জনন গ্রন্থিগুলি ক্ষুদ্র জননানালী দিয়ে দুটি বাহুর সন্নিহিত জনন ছিদ্র দিয়ে অ্যাবোরাল পৃষ্ঠে উন্মুক্ত থাকে। এরা মূলত যৌন জনন প্রক্রিয়ায় বংশবিস্তার করে। প্রজনন ঋতুতে পরিণত স্ত্রী ও পুরুষ প্রাণী জননছিদ্রের মাধ্যমে জননকোষ সমুদ্রের জলে নিষ্কাশিত করে এবং বহিঃনিষেক সম্পন্ন হয়। নিষিক্ত ডিম অর্থাৎ জাইগোট গোলাকার এবং সামান্য কুসুম সমন্বিত হয়।

হলোব্লাস্টিক ক্লিভেজ পদ্ধতিতে জাইগোটটি বারংবার বিভাজিত হয়। প্রথমে মরুলা এবং পরে ব্লাস্টুলা গঠন করে। ব্লাস্টুলার কোনো একপ্রান্ত ইন্‌ভ্যাজিনেশন পদ্ধতিতে ভিতরের দিকে প্রবেশ করে গ্যাস্ট্রুলা গঠন করে। এরপর গ্যাস্ট্রুলাটি মুক্ত সন্তরণশীল বাইপিনেরিয়া লার্ভায় রূপান্তরিতহয় (চিত্র 3.12)।

1. বাইপিনেরিয়া লার্ভা (Bipinneria)— জাইগোট গঠন থেকে প্রায় একসপ্তাহ পরে বাইপিনেরিয়া লার্ভা গঠিত হয়। এই লার্ভা দ্বিপার্শ্বীয়ভাবে প্রতিসম। এর একটি প্রি-ওরাল ও একটি পোস্ট-ওরাল ব্যান্ড থাকে। লার্ভার প্রি-ওরাল খন্ডক খুব উন্নত এবং এই প্রি-ওরাল খন্ডককে বেষ্টন করে প্রি-ওরাল সিলিয়েটেড ব্যান্ড অবস্থিত। পোস্টওরাল সিলিয়েটেড ব্যান্ডটি দীর্ঘ অক্ষে বিস্তৃত এবং মুখছিদ্র ও পায়ুছিদ্রের মধ্যে একটি সম্পূর্ণ রিং গঠন করে। প্রাণীটির দেহাভ্যন্তরে সিলোম ও পাচন নালী দেখা যায়। এই লার্ভা খাদ্য হিসেবে ডায়াটম ভক্ষণ করে। কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর লার্ভার দেহে ক্রমশ তিনটি উপবৃদ্ধি উৎপন্ন হয় এবং ক্রমে **ব্রাকিওলেরিয়া** লার্ভায় পরিণত হয় (চিত্র 3.12)।

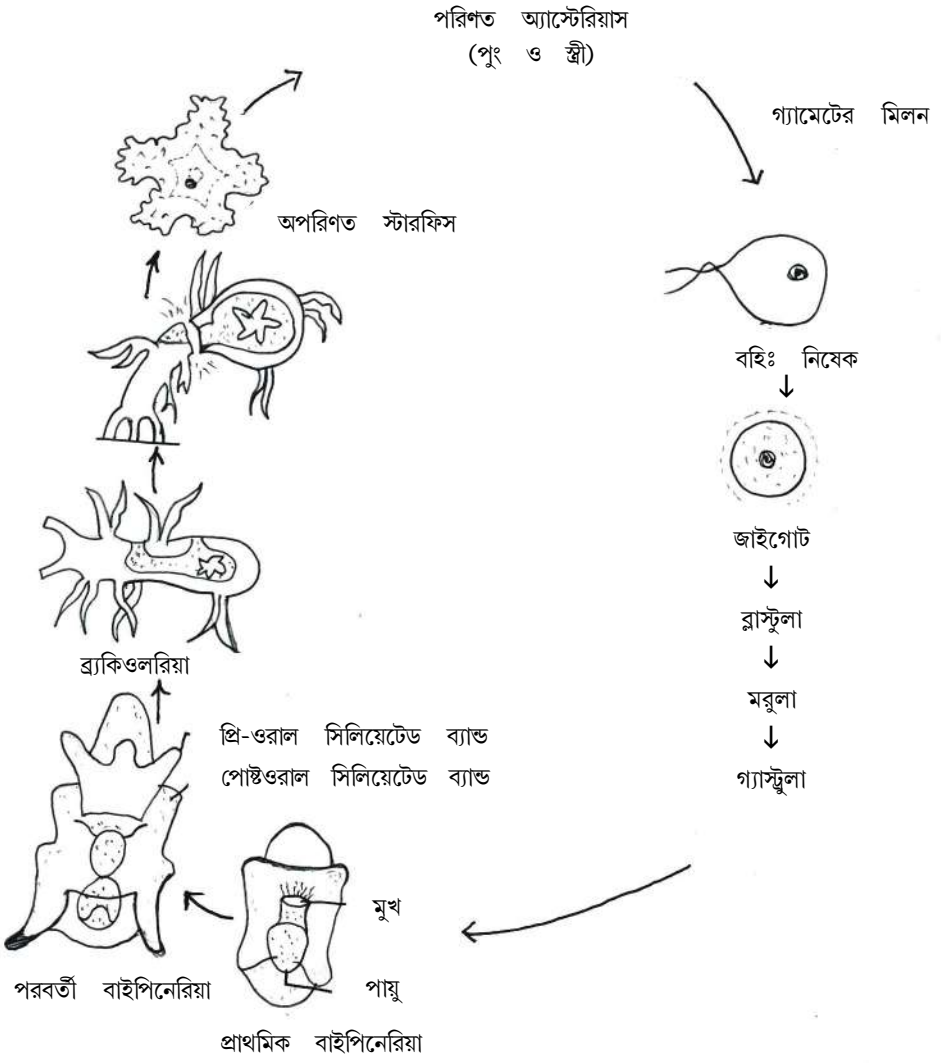

চিত্র 3.12 : অ্যাস্টেরিয়াসের জীবনচক্রে লার্ভা দশার রূপান্তর

(২) **ব্রাকিওলেরিয়া লার্ভা (Brachiolaria)—** বাইপিনেরিয়া লার্ভার দেহ-পার্শ্বস্থ খন্ডকগুলি প্রবর্ধিত হয়ে সিলিয়াযুক্ত বাহুতে রূপান্তরিত হয়। প্রি-ওরাল বাহু থেকে প্রবর্ধিত অংশের নাম ব্রাকিওলার বাহু। এই বাহুর গোড়ার অ্যাডহেসিভ্ কোষ থাকায় এরা বাহুর সাহায্যে কোনো বস্তুর সঙ্গে সংলগ্ন হয়।

সাধারণত ছয় থেকে সাত সপ্তাহের মধ্যে ব্রাকিওলেরিয়া লার্ভা কোনো বস্তুর সঙ্গে সংলগ্ন হয় এবং দ্বি-পার্শ্বীয়ভাবে প্রতিসম লার্ভা ক্রমে অরীয়ভাবে প্রতিসম এবং পরিণত তারামাছে পরিবর্তিত হয়। লার্ভার মুখ ও পায়ুছিদ্র বন্ধ হয় এবং বাম দিকে নতুন মুখছিদ্র ও ডান দিকে নতুন পায়ুছিদ্র সৃষ্টি হয়। লার্ভার বাম ও ডান পাশ যথাক্রমে ওরাল ও অ্যাবোরাল পৃষ্ঠে পরিবর্তিত হয়। রেডিয়াল ক্যানাল ধীরে ধীরে প্রবর্ধিত হয়, কন্টকময়ত্বক গঠিত হয় এবং ধীরে ধীরে ক্ষুদ্র অ্যাস্টেরিয়াস বা তারামাছে পরিণত হয়।

3.2.4 অনুশীলনী

1. অ্যাস্টেরিয়াসের জল সংবহন তন্ত্র কি কি অংশ নিয়ে গঠিত। অঙ্গাগুলির ব্যাখ্যা দিন।
2. জল সংবহনতন্ত্র অ্যাস্টেরিয়াসের কি কি কাজে সাহায্য করে? ব্যাখ্যা করুন।
3. ব্রাকিওলেরিয়া লার্ভার ব্যাখ্যা দিন।
4. ব্রাকিওলেরিয়া লার্ভা কোথায় দেখা যায়? ব্যাখ্যা করুন।
5. সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখুন—
   ম্যাড্রিপোরাইট, টাইডম্যানস বডি, টিউব- ফুট বা নালী পদ।

3.2.4 উত্তরমালা

1. পৃষ্ঠা — 99-100
2. পৃষ্ঠা — 101
3. পৃষ্ঠা — 102
4. পৃষ্ঠা — 102
5. a) পৃষ্ঠা — 97 এবং 99
   b) পৃষ্ঠা — 100
   c) পৃষ্ঠা — 100

3.3 পর্ব : হেমিকর্ডাটা (Hemichordata)

3.3.1 ব্যালানোগ্লোসাসের সাধারণ গঠন (General organisation of Balanoglossus)

ব্যালানোগ্লোসাস হেমিকর্ডাটা পর্বের অন্তর্গত একটি সামুদ্রিক প্রাণী। এরা সমুদ্র তীরবর্তী জলমগ্ন বালুকাময় তলে বসবাসে সক্ষম। বালিতে অবস্থিত আণুবীক্ষণিক জীব, ডায়াটম ও আদ্যপ্রাণী ইহাদের প্রধান খাদ্য। আকৃতিতে এরা কেঁচোর ন্যায় এবং 10-15cm পর্যন্ত লম্বা হয় (চিত্র 3.13।

সমগ্র প্রাণীটি তিনটি প্রধান দেহাংশে বিভেদিত, যথা প্রোবোসিস বা প্রোটোসোম, কোলার বা মেসোসোম এবং ট্রাঙ্ক বা মেটাসোম। ক্ষুদ্র, ভোঁতা প্রোবোসিসটি কোলারের অগ্রভাগে অবস্থিত এবং প্রোবোসিস বৃন্ত দ্বারা দৃঢ়তা প্রাপ্ত। প্রোবোসিসটি ফাঁপা এবং বহিঃ পরিবেশের একটি ছিদ্রের মাধ্যমে সংযোগ রক্ষা করে। একে প্রোবোসিস পোর বলে। প্রোবোসিস স্টক ও প্রোবোসিসের পশ্চাৎ অংশ কোলার অংশ দ্বারা আবৃত থাকে। এদের কোলার অঙ্গুরীর ন্যায়। কোলার গহ্বর দুটি এবং বহিঃ পরিবেশের সঙ্গে দুটি ছিদ্রের মাধ্যমে সংযোগরক্ষা করে। মুখ অংশটি কোলারের গহ্বরে অঙ্কীয় তলে অবস্থিত। ব্যালানোগ্লোসাসের ধড় বা ট্রাঙ্ক বা মেটাসোম লম্বাকৃতির হয়। এটি পুনরায় অগ্র ব্রাঙ্কিওজেনিটাল, মধ্য হেপাটিক ও পুচ্ছ বা পশ্চাৎ হেপাটিক অংশে বিভেদিত। ব্রাঙ্কিওজেনিটাল অংশটিতে একজোড়া জেনিটাল রিজ অবস্থিত যার মধ্যে জনন কোষ থাকে। ধড়ের পৃষ্ঠীয় তলে দুইসারির ফুলকা ছিদ্র দেখা যায়। প্রাণীটি যত লম্বা হয় ফুলকা ছিদ্রের সংখ্যা তত বৃদ্ধি পায়। হেপাটিক অংশটি বাইরে থেকে থলির ন্যায় অন্ত্র দ্বারা চিহ্নিত করা যায়। ধড় অঞ্চলে একটি মধ্য অঙ্কীয় ও একটি মধ্য পৃষ্ঠ রিজ বা ভাঁজ দেখা যায়। এতে রক্তবাহ ও স্নায়ু বিস্তৃত।

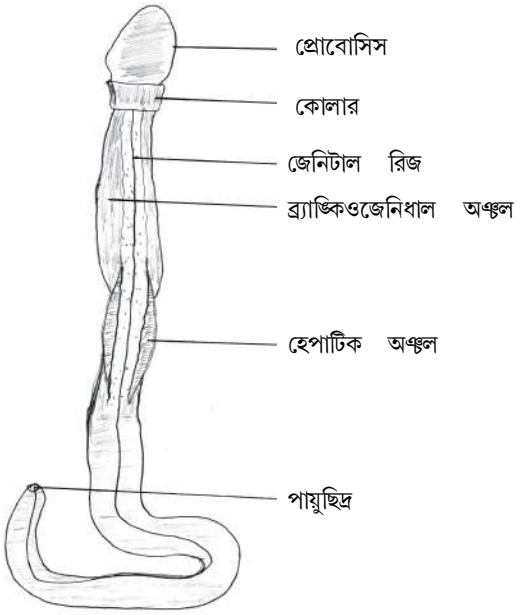

চিত্র 3.13 ব্যালানোগ্লোসাসের বহিরাকৃতি

ব্যালানোগ্লোসাসের বাক্কাল গহ্বরে অবস্থিত অগ্র-পশ্চাৎভাবে বিস্তৃত ফাঁপা অথচ দৃঢ় নলের মতো

অংশকে **নোটোকর্ড বা স্টোমোকর্ড** বলে। এটা প্রোবেসিস গহ্বর পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে এবং বেসমেন্ট পর্দা দ্বারা আবৃত। আল্ট্রা আণুবীক্ষণিক পরীক্ষায় এটি যে নোটোকর্ড নয় তা প্রমাণিত। এটিকে বর্তমানে বাক্কাল ডাইভার্টিকুলাম বলে।

3.3.2 ব্যালানোগ্লাসাসের গলবিলের গঠন (Phaynx of Balanoglossus)

ব্যালানোগ্লসাসের গলবিল অংশটি ধড়ের অগ্রভাগে অবস্থিত লম্বা নলাকার অংশ। গলবিলটি প্যারাব্রাঙ্কিয়াল খাঁজ দ্বারা একটি পৃষ্ঠীয় ও একটি অঙ্কীয় প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। পৃষ্ঠীয় প্রকোষ্ঠে 'U' আকৃতির অসংখ্য ফুলকাছিদ্র বর্তমান, তাই এই অংশটি প্রাণীর শ্বসন কাজের সঙ্গে জড়িত। অঙ্কীয় প্রকোষ্ঠটি খাদ্যগ্রহণ ও খাদ্যঘনীভবনের সঙ্গে জড়িত। এই অঞ্চলের অন্তঃপ্রাকার অসংখ্য সিলিয়াযুক্ত ও গ্রন্থিকোষ সমৃদ্ধ হয়।

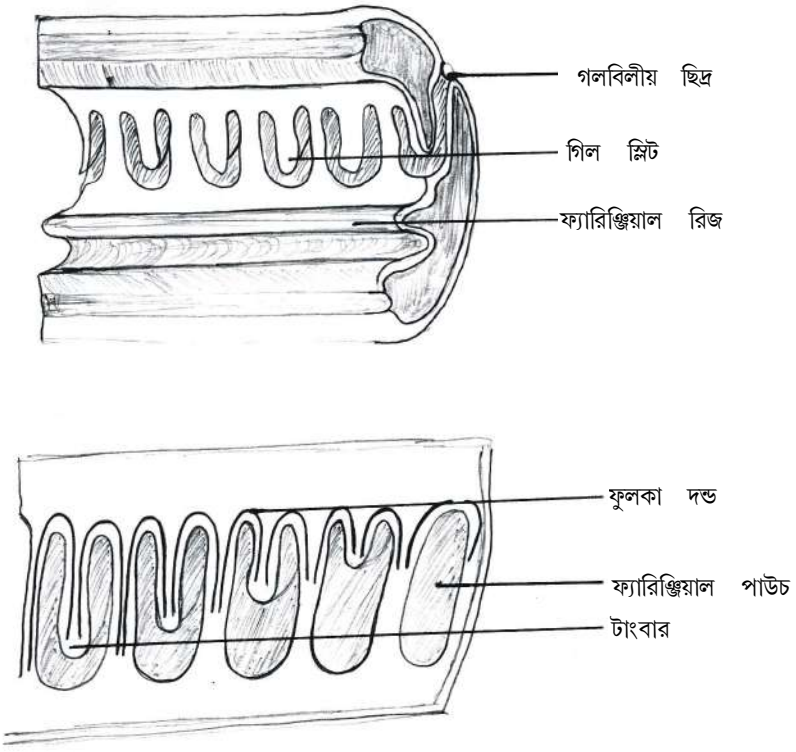

চিত্র 3.14 ব্যালানোগ্লাসাসের গলবিলের গঠনের চিত্র

গলবিলের ফুলকা-ছিদ্রের সংখ্যা প্রাণীর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে বৃদ্ধি পায়। ফুলকা ছিদ্রগুলি সরাসরি বাইরে উন্মুক্ত হয় না। প্রতিটি ফুলকাছিদ্র থলির ন্যায় অংশে উন্মুক্ত হয়, এদের **ব্রাঙ্কিয়াল থলি** বলে। ব্রাঙ্কিয়াল থলি ফুলকা ছিদ্রের মাধ্যমে বাইরে উন্মুক্ত হয়। ব্যালানোগ্লসাসের প্রত্যেকটি প্রজাতির ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক সংখ্যায় ফুলকা ছিদ্র বর্তমান। অনেকের ক্ষেত্রে প্রথম চারটি ব্রাঙ্কিয়াল থলি যুক্ত হয়ে একটি ছিদ্রের মাধ্যমে বাইরে উন্মুক্ত হয়।

দুটি ফুলকা ছিদ্রের অন্তবর্তী অঞ্চলকে সেপ্টা বলে। প্রতিটি সেপ্টা দৃঢ় এবং গলবিল প্রাকার ও দেহ প্রাকারের অংশ দ্বারা গঠিত হয়। ফুলকা ছিদ্রের পৃষ্ঠতল থেকে জিহ্বার মতো উপবৃদ্ধির

সৃষ্টি হয়, একে জিহ্বা বার (tongue bar) বলে। এই বারগুলি সঞ্চালনশীল নয় এবং ফুলকা ছিদ্রের অঙ্কতলকে স্পর্শ করে না। ফুলকাছিদ্রগুলি ফুলকা দন্ড নামক একপ্রকার অন্তঃকঙ্কাল দ্বারা দৃঢ়তাপ্রাপ্ত হয়।

3.3.3 জননতন্ত্র এবং লার্ভার গঠন (Reproduction and larva)

ব্যালানোগ্লোসাস সাধারণত যৌনজনন প্রক্রিয়ায় জননকার্য সমাধা করে। কিছু কিছু প্রজাতির ক্ষেত্রে অযৌন জনন পরিলক্ষিত হয়।

A. যৌন জনন প্রক্রিয়া

ব্যালানোগ্লোসাস একলিঙ্গা প্রাণী। কিন্তু পুরুষ ও স্ত্রী প্রাণীটিকে বহিরাকৃতি দেখে চেনা যায় না, অর্থাৎ যৌন দ্বিরূপতা অনুপস্থিত। ডিম্বাশয় এবং শুক্রাশয় পৃথকভাবে বহিরাকৃতি দ্বারা চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। থলির ন্যায় জননাঙ্গাগুলি দেহের গলবিলের পার্শ্বদেশে ব্র্যাঙ্কিওজেনিটাল অংশে তির্যকভাবে সজ্জিত থাকে। প্রাথমিক বা মুখ্য জননাঙ্গা থেকে প্রচুর পরিমাণে গৌণ জননাঙ্গের সৃষ্টি হয়। প্রতিটি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং দেহগহ্বরে প্রবেশ করে। প্রতিটি জননাঙ্গা সোমাটোপ্লুরা দ্বারা আবৃত এবং একটি নলাকার গ্রীবা সমন্বিত হয়। জননাঙ্গা হতে সৃষ্ট জননকোষগুলি ব্রাঙ্কিওজেনিটালগ্রুভে অবস্থিত গোনোপোরের মাধ্যমে উন্মুক্ত হয় এবং নিষেক ক্রিয়া দেহের বাইরে সমুদ্র জলে সংঘটিত হয়। ব্যালানোগ্লোসাসের ডিম্বাণুগুলি ক্ষুদ্র এবং এতে কুসুমের পরিমাণ স্বল্প।

3.3.4 লার্ভা দশা ও তার রূপান্তর (Larva and its metamorphosis)

নিষিক্ত ডিম্বাণুটি লার্ভা দশার মাধ্যমে রূপান্তরিত হয়।

(i) প্রাক্ লার্ভা দশা— নিষিক্ত ডিম্বাণুটি বিভাজনের দ্বারা অসংখ্য ব্লাস্টোমিয়ার গঠন করে। এই বিভাজন পদ্ধতিকে ক্লিভেজ বলে। এদের ক্লিভেজ প্রক্রিয়াটি হলোব্লাস্টিক ধরনের এবং অরীয়তলে ঘটে। উৎপাদিত ব্লাস্টোমিয়ারগুলি প্রায় সমআকৃতি সম্পন্ন হয়। 32টি ব্লাস্টোমিয়ারযুক্ত অবস্থা থেকে ভ্রূণটি মরুলা দশারূপে চিহ্নিত হয়। মরুলা ক্রমাগত বিভাজনের ফলে ব্লাস্টুলা গঠন করে। ব্লাস্টুলার মধ্যের গহ্বরটিকে ব্লাস্টোসিল বলে এবং এটি সিলোব্লাস্টুলা (Coeloblastula) নামে পরিচিত। ক্রমে ব্লাস্টুলাটি দ্বিস্তর বিশিষ্ট গ্যাস্ট্রুলাতে পরিণত হয়। এই পদ্ধতিকে গ্যাস্ট্রুলেশন (Gastrocoel) বলে। ব্লাস্টোমিয়ারের অন্তঃচলনের ফলে সৃষ্ট নতুন গহ্বরটিকে গ্যাস্ট্রোসিল বা আরকেনটেরন (Archenteron) বলে। পরবর্তীকালে এপিবলি এবং অভিসারী চলনের দ্বারা গ্যাস্ট্রুলার কোষবিন্যাস ঘটে। আরকেনটেরনের মুক্ত প্রান্তটি ব্লাস্টোপোর গঠন করে এবং ভবিষ্যতে এটি পায়ুছিদ্রে পরিণত হয় (চিত্র 3.15)।

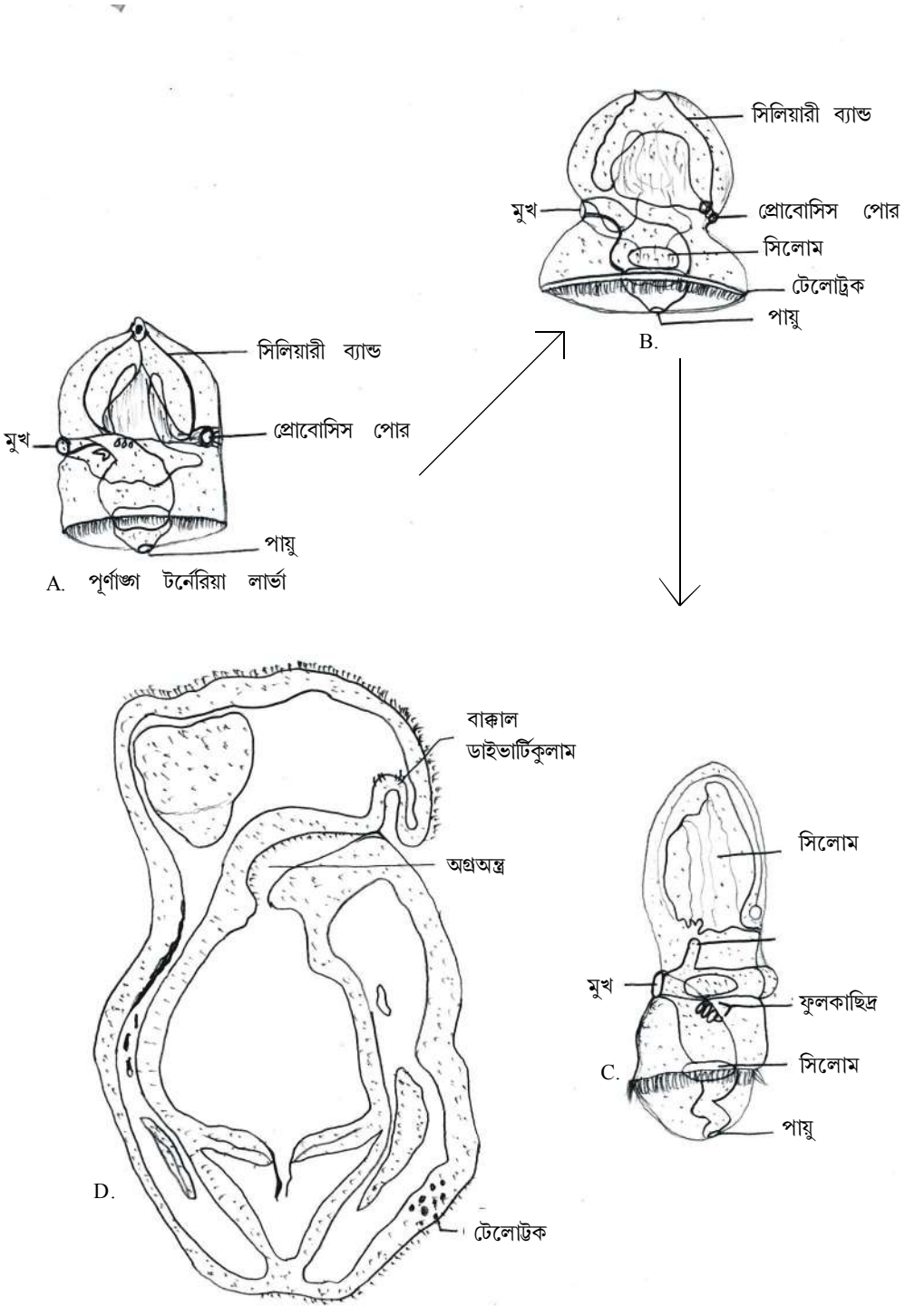

চিত্র 3.15 টর্নেরিয়া লার্ভার রূপান্তর (A-C); D-টর্নেরিয়া লার্ভার লম্বচ্ছেদ

ক্রমে দ্বিস্তর বিশিষ্ট ভ্রূণটি প্রলম্বিত হয়। ব্যালানোগ্লোসাসের সিলোম এন্টেরোসিলোম অর্থাৎ মেসোডার্ম থলি থেকে সিলোম উৎপন্ন হয়। গ্যাস্ট্রুলার এক্টোডার্মে সিলিয়ার উৎপত্তি হয় এবং চলনক্ষম হয়। মুখ ও পায়ুর সৃষ্টি হয়। 24-36 ঘন্টা পরে ভাইটেলাইন পর্দার বিদারণ ঘটে এবং ভ্রূণটি সমুদ্রের জলে সাঁতার দেয়। ভ্রূণ পরিস্ফুটনের ফলে ক্রমে লার্ভা দানায় পরিণত হয়। Johannes Muller (1850) প্রথম এর ঘূর্ণন স্বভাবের জন্য এই লার্ভার নামকরণ করেন টর্নেরিয়া লার্ভা।

(ii) টর্নেরিয়া লার্ভাদশার রূপান্তর ও গঠন— টর্নেরিয়া লার্ভাটি উপবৃত্তাকার এবং দ্বিপার্শ্বীয়ভাবে প্রতিসম। এটি আকৃতিতে 1-3mm। এর অঙ্কীয় মধ্য রেখা বরাবর মুখছিদ্র গঠিত হয়। দেহের সম্মুখ ভাগ অর্থাৎ মুখ ছিদ্রের অগ্রভাগটি লম্বা হয়ে প্রি-ওরাল লোব গঠন করে। প্রিওরাল লোবের সম্মুখপ্রান্তে এপিক্যাল প্লেট দেখা যায় এবং এতে নার্ভ তন্তু, নার্ভ কোষ, নার্ভগ্রন্থি, একজোড়া আই স্পট এবং কতকগুলি সঞ্চালনহীন সিলিয়া দেখা যায়। লার্ভার দেহে তিনটি স্পষ্ট সিলিয়ারি ব্যান্ড পরিলক্ষিত হয় এবং অবস্থান অনুযায়ী ওদের নাম প্রিওরাল, পোষ্টওরাল ও সারকামঅ্যানাল বা টেলোট্রক। প্রিওরাল ও পোষ্টওরাল সিলিয়ারি ব্যান্ড যুক্ত হয়ে এপিক্যাল প্লেটের নিকট অবস্থিত এবং টেলোট্রক পায়ুছিদ্রকে বেষ্টন করে। টেলোট্রকের সিলিয়াগুলি লম্বাকৃতির সঞ্চলন ক্ষমতাসম্পন্ন এবং টর্নেরিয়া লার্ভার প্রধান গমন অঙ্গ। লার্ভার পায়ুছিদ্রটি দেহের পশ্চাৎ ভাগে মধ্যঅক্ষরেখা বরাবর অবস্থিত। পৌষ্টিক নালীটি ইসোফেগাস, পাকস্থলী ও অন্ত্রে বিভেদিত।

টর্নেরিয়া লার্ভার একজোড়া ফুলকাছিদ্র, পাঁচটি সিলোম গহ্বর দেখা যায়। টর্নেরিয়া লার্ভা অতঃপর সমুদ্রের তলদেশে প্রোথিত হয় এবং প্রায় প্রতিসম পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে পরিণত হয় (চিত্র 3.15)।

3.3.5 অনুশীলনী

1. চিত্রসহ ব্যালানো গ্লোসাসের বহিরাকৃতি বর্ননা করুন।
2. ব্যালানো গ্লোসাসের গলবিলের গঠন ব্যাখ্যা করুন।
3. ব্যালানো গ্লোসাসের যৌন জনন প্রক্রিয়া বিবৃত করুন।
4. টর্নেরিয়া লার্ভাদশার রুপান্তর ও গঠন ব্যাখ্যা করুন।

3.3.6 উত্তরমালা

1. পৃষ্ঠা – 106-107
2. পৃষ্ঠা – 107-108
3. পৃষ্ঠা – 108
4. পৃষ্ঠা – 110

একক 4? পরজীবিতা ও অনাক্রম্যতা

গঠন

4.1 পোষক—পরজীবী সম্পর্ক

4.1.1 প্রস্তাবনা

4.1.2 উদ্দেশ্য

4.1.3 পরজীবিতা

4.1.4 মিথোজীবিতা বা সিমবায়োসিস

4.1.5 ব্যতিহারজীবিতা বা কমেন্‌স্যালিজম

4.1.6 অন্যোন্যজীবিতা বা মিউচুয়ালিজম্‌

4.1.7 সারাংশ

4.1.8 অনুশীলনী

4.1.9 উত্তরমালা

4.2 কয়েকটি পরজীবী প্রাণীর জীবন ইতিহাস এবং রোগজনিত লক্ষণ

4.2.1 প্রস্তাবনা

4.2.2 উদ্দেশ্য

4.2.3 এন্টামিবা হিস্টোলাইটিকা

4.2.4 প্লাজমোডিয়াম ভাইভ্যাক্স

4.2.5 অ্যাসকারিস লুম্‌ব্রিকয়ডিস

4.2.6 অ্যাঙ্কাইলোস্টোমা ডুওডিনেল

4.2.7 ফ্যাসিওলা হেপাটিকা

4.2.8 একাইনোকক্কাস গ্রানুলোসাস

4.2.9 সারাংশ

4.2.10 অনুশীলনী

4.2.11 উত্তরমালা

4.3 অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিবডি

4.3.1 প্রস্তাবনা

4.3.2 উদ্দেশ্য

4.3.3 অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিবডি : গঠন, বিশেষত্ব, শ্রেণীবিভাগ

4.3.4 অ্যান্টিজেন—অ্যান্টিবডি বিক্রিয়া

4.3.5 সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় ইমিউনাইজেশন

4.3.6 সারাংশ

4.3.7 প্রশ্নাবলী

একক 4.1 পোষক - পরজীবি সম্পর্ক (Host-parasite Interaction)

4.1.1 প্রস্তাবনা

প্রাণীজগতে অধিকাংশ প্রাণী প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে খাদ্য সংগ্রহের মাধ্যমে স্বাধীনভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। কিন্তু কিছু সংখ্যক প্রাণী প্রজাতি জীবন ধারণের জন্য সম বা বিষম প্রজাতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করে। এই সম্পর্ককে বলা হয় **আন্তঃপ্রজাতি** সম্পর্ক।

প্রকৃতিতে আন্তঃপ্রজাতি সম্পর্কের মধ্যে নানা প্রকার বৈচিত্র্য দেখা যায় এবং তাদের জৈব গুরুত্ব এতটাই ভিন্ন যে এটি ব্যাখ্যা করার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট শ্রেণিবিভাজন ও নামকরণ পদ্ধতির প্রয়োজন। এই বৈচিত্র্যের জন্য পরজীবীবিদ্যাকে বাস্তুবিদ্যার একটি বিশেষ শাখারূপে গণ্য করা হয়।

আন্তঃসম্পর্কের গুণগত মান অনুযায়ী কমেন্‌স্যালিজমের ক্ষেত্রে আন্তঃসম্পর্ক খুবই শিথিল কিন্তু সিমবায়োসিস, মিউচুয়ালিজম্ এবং পরজীবিতা ইত্যাদির ক্ষেত্রে আন্তঃসম্পর্ক খুবই নিবিড়।

এই আন্তঃপ্রজাতি সম্পর্কগুলির প্রতিটি প্রকারভেদ বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনে কোনো স্তরে কোনো-না-কোনোভাবে সম্পর্কিত।

4.1.2 উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন :

পরজীবিতার সংক্ষিপ্ত ধারণা।

পরজীবিতার প্রকারভেদ।

পরজীবিতার বৈশিষ্ট্য।

মিথোজীবিতা বা সিমবায়োসিসের সংক্ষিপ্ত ধারণা।

মিথোজীবিতার প্রকারভেদ।

কমেন্‌স্যালিজম্ বা ব্যতিহারজীবিতার সংক্ষিপ্ত ধারণা।

কমেন্‌স্যালিজমের প্রকারভেদ।

মিউচুয়ালিজম্ বা অন্যোন্যজীবিতার সংক্ষিপ্ত ধারণা।

মিউচুয়ালিজমের তাৎপর্য।

মিউচুয়ালিজমের প্রকারভেদ।

4.1.3 পরজীবিতা (Parasitism)

পরজীবিতা হল একটি বিশেষ আন্তঃপ্রজাতিক সম্বন্ধ। দুটি ভিন্ন প্রজাতির মধ্যে এমন একটি নিবিড় অনুষঙ্গ যেখানে একটি প্রজাতি খাদ্য ও আশ্রয়ের জন্য অন্য প্রজাতির উপর বিপাকীয়ভাবে নির্ভরশীল হয়। ফলে পরজীবী উপকৃত হয় এবং পোষক সাধারণত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এক্ষেত্রে যে আশ্রয় দেয় তাকে বলে **পোষক বা হোস্ট** (Host) এবং যে আশ্রয় ও খাদ্য পায় তাকে বলে **পরজীবী বা প্যারাসাইট** (Parasite)। স্মিথ (Smyth, 1996 সালে) পরজীবিতা সম্পর্কে পোষক ও পরজীবীর মধ্যে শারীরবৃত্তীয় ও বিপাকীয় নির্ভরশীলতার কথা বলেন। দুটি প্রজাতির মধ্যে পরজীবী সাধারণত পোষক প্রাণী থেকে ছোটো

আকৃতির হয়। পরজীবিতার সম্পর্ক স্থায়ী হতে পারে (মানুষের অন্ত্রে ফিতাকৃমির সংক্রমণ) অথবা অস্থায়ী (মশকী, জোঁক ও টিক বা এঁটুলি আশ্রয়দাতার রক্ত পান করার সময়) হতে পারে।

1. পরজীবিতার প্রকারভেদ

(A) পোষক দেহে নির্ভরশীলতার ভিত্তিতে পরজীবী তিন প্রকার

(ক) ঐচ্ছিক/অনৈচ্ছিক/স্বেচ্ছামূলক পরজীবী (Facultative parasite)— এরা সাধারণত পরজীবী হয় না, তবে বিশেষ পরিস্থিতিতে পরজীবিতা প্রদর্শন করে। জীবনের কোনো সময় তারা স্বাধীনভাবে জীবনযাপনে সক্ষম। উদাহরণ—Pinnotheres কাঁকড়া ঝিনুকের ম্যান্টল গহ্বরের মধ্যে পরজীবীরূপে জীবন যাপন করে কিন্তু স্বাধীনভাবেও তারা বাঁচতে পারে।

(খ) বাধ্যতামূলক পরজীবী (Obligatory Parasitism)— যে সকল জীব কোনো অবস্থাতেই স্বাধীনভাবে বসবাসে সক্ষম হয় না, জীবনের সব দশাতেই পরজীবীরূপে পোষকের উপর নির্ভরশীল হয় তাদের বাধ্যতামূলক পরজীবী বলে। উদাহরণ— প্লাজমোডিয়াম, এন্টামিবা, অ্যাসকারিস ইত্যাদি পরজীবী প্রাণীরা পোষক ব্যতীত জীবনযাপন করতে পারে না।

(গ) আকস্মিক পরজীবী (Incidental parasite)— যখন কোনো জীব আকস্মিকভাবে অচেনা কোনো পোষকের দেহে প্রবেশ করে উপযুক্ত পরিবেশের প্রভাবে জীবনযাপন করে, তাদের আকস্মিক পরজীবী বলে। জলে বসবাসকারী স্বাধীনজীবী প্রোটোজোয়া ও নিমাটোড প্রাণীরা এভাবেই হঠাৎ কোনো অস্বাভাবিক পোষকের দেহে প্রবেশ করে পরজীবী হিসাবে বসবাস করতে পারে।

(B) পোষক দেহে অবস্থান অনুযায়ী পরজীবী দু-প্রকার :

(ক) বহিঃপরজীবী (External Parasite)— পোষক দেহের বাইরে দেহত্বকে বা কোনো অঙ্গে যখন পরজীবী বাস করে তখন তাদের বহিঃপরজীবী বলে। যেমন উকুন, এঁটুলি, ছারপোকা ফ্লি ইত্যাদি।

(খ) অন্তঃপরজীবী (Endoparasite)— এই প্রকার পরজীবী পোষক দেহের অভ্যন্তরে পৌষ্টিক নালি, ফুসফুস, রক্ত যকৃৎ, মূত্রথলি ইত্যাদি স্থানে বসবাস করে। যেমন ট্রাইপ্যানোসোমা, উচেরেরিয়া, এন্টারোবিয়াস, টিনিয়া ইত্যাদি।

অন্তঃপরজীবী তন্ত্রে অবস্থান অনুযায়ী আবার বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে—

চিত্র :4.1 হিমোপ্যারাসাইট ; মানুষের রক্তে প্রাপ্ত Trypanosoma পরজীবী

(i) হিমোপ্যারাসাইট (Haemoparasite) : এক্ষেত্রে পরজীবী পোষকের রক্তে বসবাস করে এবং পুষ্টিবস্তু সংগ্রহ করে। মানুষের রক্তে প্রাপ্ত প্লাজমোডিয়াম, ট্রাইপ্যানোজোমা এই প্রকার পরজীবিতার উদাহরণ (চিত্র 4.1)।

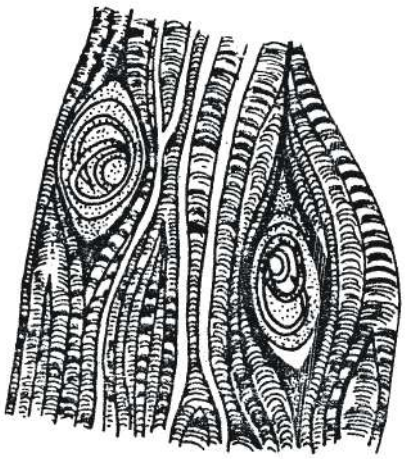

চিত্র 4.2 : হিস্টোপ্যারাসাইট ; পেশিতে প্রাপ্ত Trichinella পরজীবী

(ii) হিস্টোপ্যারাসাইট (Histoparasite) : এক্ষেত্রে পরজীবী পোষক দেহের কলাতে বসবাস করে এবং পুষ্টিবস্তু সংগ্রহ করে। (চিত্র 4.20) উদাহরণ— ট্রিকিনেল্লা, গিনিওয়ার্ম ইত্যাদি।

(iii) সিলোপ্যারাসাইট (Coeloparasite) : এক্ষেত্রে পরজীবী পোষক দেহের দেহগহ্বর বা সিলোমে বসবাস করে এবং পুষ্টি পদার্থ গ্রহণ করে। উদাহরণ— কেঁচোর সেমিনাল ভেসিক্‌ল এর গহ্বরে বসবাসকারী **মোনোসিস্টিস,** নামক প্রোটোজোয়া।

(C) পরজীবী প্রাণীর আকার অনুযায়ী—

(i) ম্যাক্রোপরজীবিতা : যদি পোষকের দেহে বসবাসকারী পরজীবী প্রাণী অপেক্ষাকৃত বড় আকারের হয়, ঐ স্থানে বৃদ্ধি পায় এবং অগণিত লার্ভা উৎপাদন করে যেগুলি পোষক প্রাণী থেকে নির্গত হয়ে নতুন পোষককে সংক্রামিত করে, এই ঘটনাকে ম্যাক্রোপরজীবিতা বলে। উদাহরণ— মানুষের অন্ত্রে বসবাসকারী অ্যাসকারিস প্রায়, ২,০০,০০০ ডিম উৎপাদন করে। ডিমগুলি পরিবেশে পরিত্যক্ত হয় এবং খাদ্য ও পানীয় জলের মাধ্যমে আবার সুস্থ মানুষের দেহে প্রবেশ করে। (চিত্র 4.3)

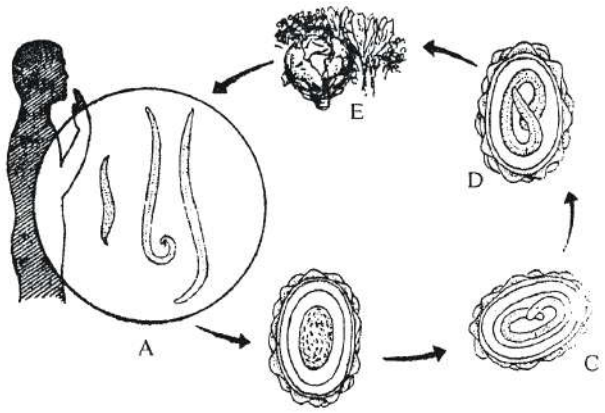

চিত্র 4.3 : ম্যাক্রোপরজীবিতা : অ্যাসকারিসের জীবনচক্র ;
A-মানুষের অভ্যন্তরে লার্ভা ও পরিণত অ্যাসকারিস, B-মানুষের মলের সঙ্গে ডিমের নির্গমন,
C-প্রথম দশার লার্ভা, D-সংক্রমণ দশার লার্ভা, E-শাকসব্জির মধ্যে সংক্রমণ দশা

(ii) মাইক্রোপরজীবিতা : যদি পোষকের কলাকোষে বসবাসকারী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আকারের পরজীবী প্রাণী পোষকের মধ্যেই সংখ্যাবৃদ্ধি করতে সক্ষম হয় তবে ঘটনাটিকে মাইক্রোপরজীবিতা বলে। যেমন— মানুষের অন্ত্রে বসবাসকারী এন্টামিবা হিস্টোলাইটিকা পরজীবীর চারটি নিউক্লিয়াসযুক্ত সিস্ট পরিবেশে নির্গত হওয়ার পর পানীয় জলের সঙ্গে সরাসরি মানুষের দেহে প্রবেশ করে অ্যামিবিয়েসিস রোগের সংক্রমণ ঘটায়।

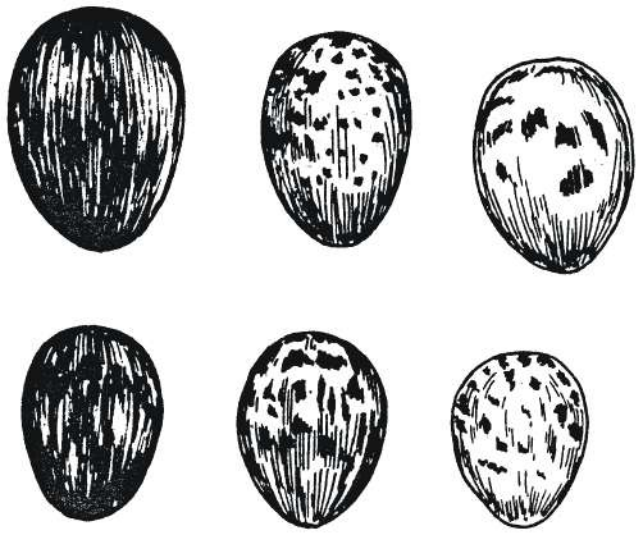

চিত্র 4.4 : ব্রুড পরজীবিতা ; একটি প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য হল পরজীবী ও পোষকের ডিমের সাদৃশ্য ; ওপরের তিনটি ডিমের চিত্র হল তিনটি কাকের প্রজাতির এবং নীচের ডিমের চিত্র তিনটি হল পরজীবী কোকিলের।

(D) ব্রুড পরজীবিতা (Brood parasitism) :

কয়েকটি প্রজাতির ক্ষেত্রে স্ত্রী প্রাণীর পাড়া ডিম যদি ভিন্ন জনিতা বা অন্য প্রজাতির জনিতা দ্বারা প্রতিপালিত হয় তবে ঘটনাটিকে ব্রুড পরজীবিতা বলে। (চিত্র 4.4)। ব্রুড পরজীবিতা সাধারণত পাখিতেই বেশি দেখা যায়। কোকিল কাকের বাসায় ডিম পাড়লে কাক নিজের ডিম ভেবে লালিতপালিত করে, অর্থাৎ পোষকের জনিতৃ স্নেহের ওপর ভাগ বসায়। এর ফলে পোষকের প্রজননঘটিত বিনিয়োগের একটি অংশের ক্ষতি করে। ব্রুড পরজীবিতা আবার দুপ্রকারের হয়—

(ক) আন্তঃপ্রজাতি ব্রুড পরজীবিতা (Interspecific brood parasitism)— কোকিল একটি ব্রুড পরজীবী পাখি। এদের ডিম পোষক পাখি কাকের ডিমের সদৃশ হয়। এরা সাধারণত কাকের বাসায় ডিম পাড়ে এবং অনেক সময় পরজীবী কোকিল কাকের ডিমগুলি থেকে একটি ডিম অপসারণ করে। ফলে পোষকের ডিমের সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকে। অনেক সময় পরজীবীর বর্ধিষ্ণু শাবক পোষকের সদ্যোজাত শাবককে নষ্ট করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে।

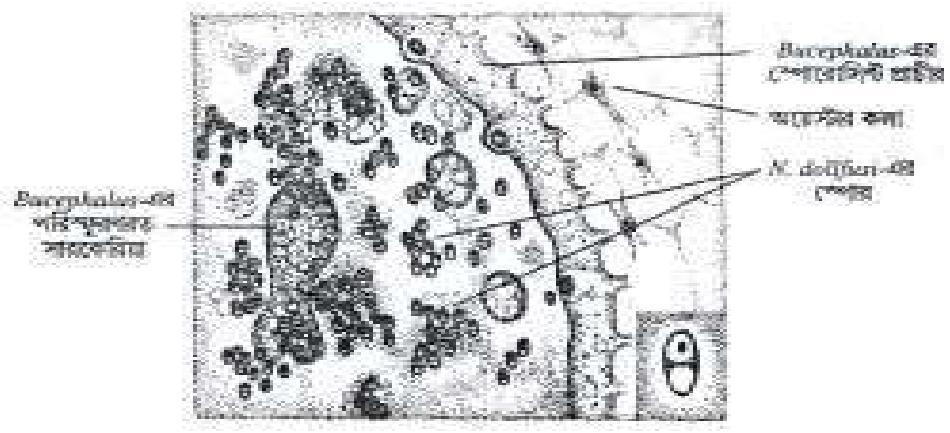

চিত্র 4.5 : অতিপরজীবিতা : Bucephalus sp. (ট্রিমাটোডা)-এর স্পোরোসিস্টের আংশিক চিত্ররূপ ; ব্রুড প্রকোষ্ঠ Nosema dollfusi-এর স্পোর ও কোষীয় আবর্জনায় পূর্ণ ; Bucephalus আমেরিকান অয়েস্টার Crassostrea sp.-এর পরজীবী

(খ) অন্তঃপ্রজাতি ব্রুড পরজীবিতা (Intraspecific brood parasitism)— স্ত্রী হাঁস কাছাকাছি ওই প্রজাতির অন্য স্ত্রী হাঁসের লালিত ডিমের মধ্যে নিজের ডিম প্রসব করে। ফলে পোষক স্ত্রী হাঁসের জনিতৃ স্নেহের কিছু অংশ পরজীবী হাঁসের ডিমের তদারকিতে ব্যয়িত হয়।

(E) হাইপারপ্যারাসিটিজম্ (Hyperparasitism) বা অতিপরজীবিতা :

যখন একটি পরজীবীর উপর অন্য একটি প্রাণীও পরজীবীরূপে জীবনযাপন করে, তখন সেই ধরনের পরজীবিতাকে অতিপরজীবিতা বা Hyperparasitism বলে। উদাহরণ— **নোসেমা ডলফুসি** (Nosema dollfusi) নামক একপ্রকার প্রোটোজোয়া অতিপরজীবীরূপে বুসেফ্যালাস কুকুলাস (Bucephalus cuculus) নামক চ্যাপ্টা কৃমির লার্ভার দেহে বসবাস করে (চিত্র 4.5)।

2. পরজীবিতার বৈশিষ্ট্য :

পোষক পরজীবির জটিল অনুষঙ্গো পরজীবিতার যে সকল আদর্শ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় সেগুলি হল—

(1) পরজীবী পোষক অপেক্ষা সর্বদাই ক্ষুদ্র হয়।
(2) পরজীবী পোষক প্রাণীর উপর বিপাকীয় ও শারীরবৃত্তীয়ভাবে নির্ভরশীল।
(3) পোষকের অনুষঙ্গো পরজীবী সর্বদাই উপকৃত হয় কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পোষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
(4) পরজীবির আয়ুষ্কাল পোষকের তুলনায় কম কিন্তু প্রজনন হার খুব বেশি।
(5) পরজীবিতা পূর্ণ বা আংশিক সময়ের জন্য হতে পারে।
(6) কোনো কোনো সময় একটি পরজীবীর একাধিক পোষক প্রজাতি থাকতে পারে।
(7) পোষকের দেহাভ্যন্তরে ভৌত ও রাসায়নিক অবস্থার সঙ্গো পরজীবীর অভিযোজন ক্ষমতা উল্লেখের দাবি রাখে।

(8) পোষকের দেহের বহির্ভাগে এবং দেহের ভিতরে পরজীবী অবস্থান করলে যথাক্রমে বহিঃপরজীবিতা ও অন্তঃপরজীবিতা দেখা যায়।

4.1.4 সিমবায়োসিস বা মিথোজীবিতা (Symbiosis)

যে আন্তঃপ্রজাতি সম্পর্কে দুটি ভিন্ন প্রজাতি পুষ্টি পদার্থের আদান প্রদানের মাধ্যমে একে অপরের থেকে উপকৃত হয় সেই সহাবস্থানের সম্পর্ককে মিথোজীবিতা বা সিমবায়োসিস বলে। মিথোজীবীয় পুষ্টিসম্পন্নকারী জীবকে মিথোজীবী বা সিমবায়োন্ট বলে (চিত্র 4.6)।

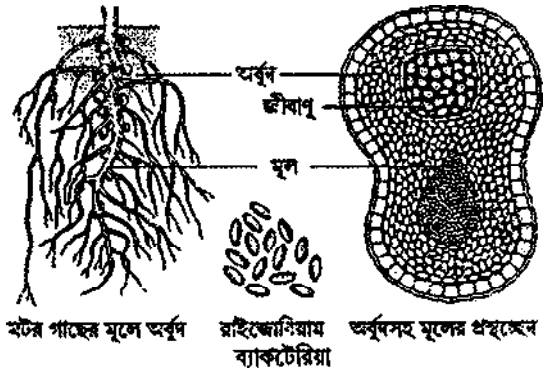

চিত্র 4.6 : মিথোজীবিতা : মটরগাছের মূলের অর্বুদে রাইজোবিয়ামের সহাবস্থান

উদাহরণ— মটর গাছের মূলের অর্বুদে বসবাসকারী নাইট্রোজেন আত্তীকরণকারী রাইজোবিয়াম ব্যাক্টেরিয়া বায়ু থেকে নাইট্রোজেন শোষণ করে মটর গাছকে সরবরাহ করে। এর বিনিময়ে মটর গাছ যে খাদ্যবস্তু সংশ্লেষ করে, তা থেকে রাইজোবিয়াম পুষ্টি সম্পন্ন করে।

মিথোজীবিতার প্রকারভেদ :

শিথিল যোগাযোগ : হার্মিট ক্র্যাব (hermit crab) বা সন্ন্যাসী কাঁকড়া এবং সি-অ্যানিমনের পারস্পরিক সম্পর্ক এই ধরনের মিথোজীবিতার উদাহরণ। হার্মিট ক্র্যাব যে শামুকের খোলকের মধ্যে বসবাস করে তার ওপর সি-অ্যানিমন আটকে থাকে। কাঁকড়ার উদ্‌বৃত্ত খাদ্য সি-অ্যানিমন গ্রহণ করে এবং সি-অ্যানিমনের নিমাটোসিস্টের

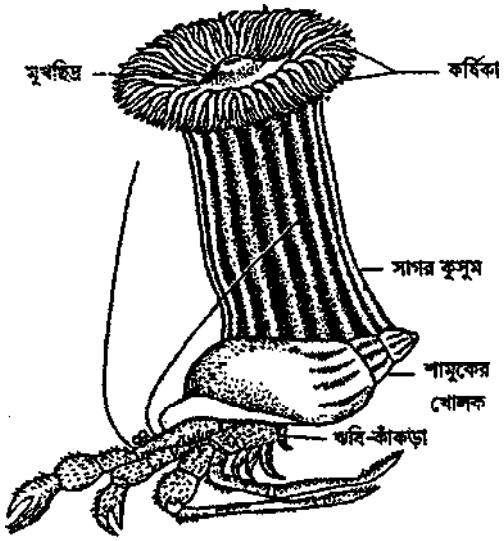

চিত্র 4.7 : শিথিল মিথোজীবিতা ; সন্ন্যাসী কাঁকড়া শামুক খোলকের মধ্যে এবং সাগর কুসুম তার উপরে আটকে

বিষাক্ত ক্ষরণ হার্মিট ক্র্যাবকে রক্ষা করে। এ ছাড়া সি-অ্যানিমন কাঁকড়াটির সঙ্গো একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাওয়ার সুযোগ পায়। এই সম্পর্কটি অবিচ্ছেদ্য নয় বরং উভয় প্রাণী স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করতে পারে। (চিত্র 4.7)

অন্তরঙ্গা যোগাযোগ :

এক্ষেত্রে একটি প্রজাতি অন্য প্রজাতিটির দেহাভ্যন্তরে বসবাস করে। উদাহরণ সবুজ হাইড্রার দেহাভ্যন্তরে অসংখ্য এককোষী সবুজ শৈবাল থাকে। শৈবাল হাইড্রার শ্বসনজাত CO_2 গ্যাসকে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করে। এ ছাড়া শৈবাল হাইড্রার মধ্যে নিশ্চিন্ত আশ্রয় লাভ করে। অপরপক্ষে হাইড্রা শৈবাল থেকে O_2 এবং শর্করা পেয়ে থাকে। ফলে দেখা যায় এই নির্ভরতা এমন অন্তরঙ্গা পর্যায়ে পৌঁছায় যে শৈবাল এবং হাইড্রাকে বিচ্ছিন্ন করলে উভয়ের অস্তিত্ব রক্ষা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

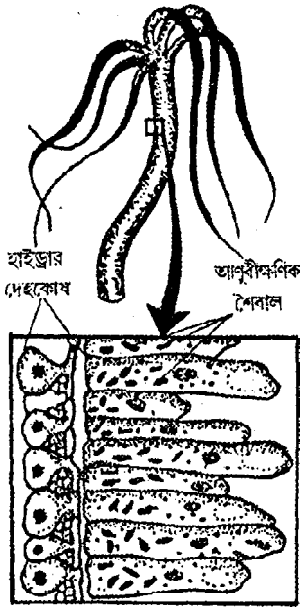

চিত্র 4.8 : মিথোজীবিতার অন্তরঙ্গা যোগাযোগ: হাইড্রার দেহাভ্যন্তরে সবুজ শৈবাল

4.1.5 ব্যতিহারজীবিতা বা কমেন্স্যাজিম্ (Commensalism)

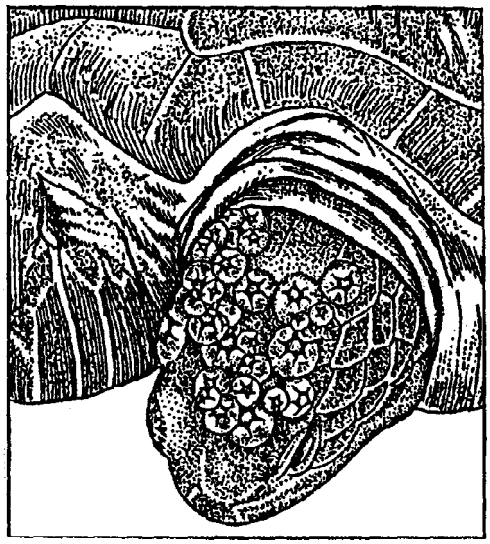

চিত্র 4.9 : ব্যতিহারজীবিতা : কচ্ছপ ও বার্নাকলের অনুষঙ্গা

কমেনস্যালিজম শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হল "একই টেবিলে খাদ্যগ্রহণ"। যখন দুটি ভিন্ন প্রজাতির সম্পর্কে একটি প্রজাতি পুষ্টিগতভাবে উপকৃত হয় এবং পোষক প্রজাতি উপকৃত বা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, এ-রূপ সম্পর্ককে কমেনসেলিজম্ বা ব্যতিহারজীবিতা বলে। এই প্রকার সম্পর্কে যে প্রজাতি উপকৃত হয় তাকে কমেনস্যাল বা ব্যতিহারজীবি বলে। উদাহরণ— আর্থ্রোপোডা পর্বভুক্ত বার্নাকল্ সামুদ্রিক কচ্ছপের দেহে বহিঃকমেনস্যালরূপে দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন থাকে। এরা কচ্ছপের সঙ্গো বিভিন্ন স্থানে

ঘুরে বেড়ায় এবং কচ্ছপের উদ্‌বৃত্ত খাদ্য গ্রহণ করে। এই প্রকার সম্পর্কে বার্নাকল্ উপকৃত হয় কিন্তু কচ্ছপের কোনো ক্ষতি হয় না (চিত্র 4.9)।

কমেনস্যালিজম্ বা ব্যতিহারজীবিতার প্রকারভেদ :

(ক) এক্টোকমেন্‌স্যালিজম্ (Ectocommensalism) : চোষক মাছ (Remora) এবং হাঙর এই প্রকার সম্পর্কের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। Remora চোষকের সাহায্যে হাঙরের দেহের অঙ্কীয়দেশে দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন থাকে। হাঙরের পরিত্যক্ত খাদ্যবস্তুর উদ্‌বৃত্ত অংশ খেয়ে চোষক মাছ বেঁচে থাকে। এর ফলে হাঙরের বিশেষ কোনো অসুবিধা হয় না। পরন্তু রেমোরা উপকৃত হয় চিত্র (4.11)।

চিত্র 4.10 : এক্টোকমেন্‌স্যালিজম : চোষক মাছ (Remora) হাঙরের দেহে অবস্থানরত

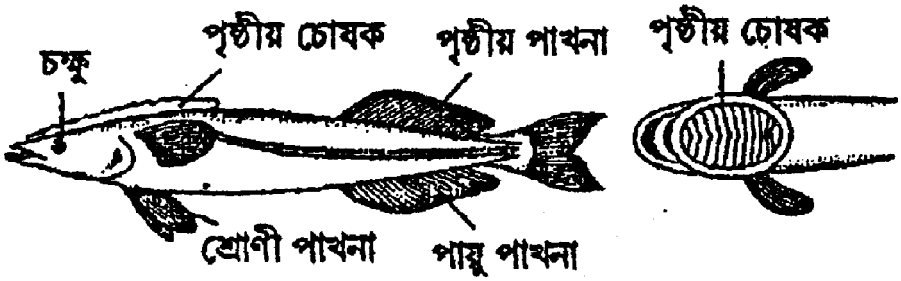

চিত্র 4.11 : চোষক (Remora) মাছ ও চোষক মাছের মস্তকের পৃষ্ঠীয় দৃশ্য

(খ) এন্ডোকমেনস্যালিজম্ (Endocommensalism) :

একটি প্রজাতির প্রাণী অপর প্রজাতির প্রাণীর দেহাভ্যন্তরে বাস করে এবং দ্বিতীয় প্রজাতির অপাচ্য খাদ্যবস্তু প্রথম প্রজাতির প্রাণী খেয়ে পুষ্টিলাভ করে এবং আপাতদৃষ্টিতে কোনো ক্ষতিকর প্রভাব দেখা যায় না। উদাহরণ— মেরুদণ্ডী প্রাণীর অন্ত্রে বসবাসকারী প্রোটোজোয়া, ব্যাক্‌টেরিয়া পোষকের কোনো ক্ষতি করে না, পরন্তু পোষকের অন্ত্রের মধ্যে পাচিত খাদ্যবস্তু ভক্ষণ করে তারা উপকৃত হয়।

(গ) ইনকুইলিনিজম্ (Inquilinism) :

কমেন্স্যালিজম্ শুধুমাত্র খাদ্যবস্তুর সম্পর্কের ওপর নির্ভর করে নয়, বাসস্থানের উপর নির্ভর করেও এই ধরনের সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে। কাঠঠোকরা পাখির দ্বারা তৈরি গাছের গর্ত পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকলে ব্লু-বার্ড পাখি ওই গর্তে আশ্রয় গ্রহণ করে। ফলে কাঠঠোকরার উপস্থিতি ব্লু-বার্ডের পক্ষে উপকারী (চিত্র 4.12)।

চিত্র 4.12 : ইনকুইলিনিজম; কাঠঠোক্রার গর্তে ব্লু-বার্ডের আশ্রয়

(ঘ) ফোরেসিস (Phoresis) :

'ফোরেসিস' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হল 'বহন করা'। এই প্রকার কমেনস্যালিজমে একটি প্রজাতির প্রাণী অপর একটি প্রজাতির প্রাণীকে নিষ্ক্রিয়ভাবে বহন করে। এক্ষেত্রে শেষোক্ত প্রাণীটি উপকৃত হয় এবং বাহক প্রাণীটি কোনোভাবে প্রভাবিত হয় না। Fierasfier নামক এক প্রকার মাছ একাইনোডার্মাটা পর্বভুক্ত হলোথুরিয়ার শ্বসন যন্ত্রে (respiratory tree) অবস্থান করে। মাছটি স্বাধীনভাবে থাকলে শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয়। তাই মাছটি হলোথুরিয়ার দেহে আশ্রয় নেয়। তাতে কোনো ক্ষতি হয় না বা বিরক্ত বোধ করে না।

4.1.6 অন্যোন্যজীবিতা বা মিউচুয়ালিজম (Mutualism)

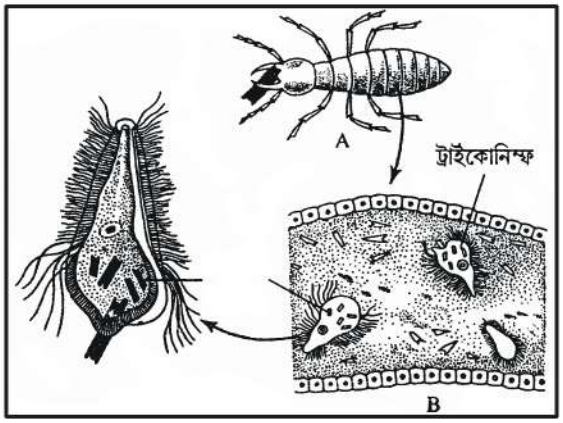

চিত্র 4.13 : উইপোকার (A) পৌষ্টিক নালিতে ট্রাইকোনিম্ফা প্রোটোজোয়া এবং (B) ও (C) ট্রাইকোনিম্ফার বিবর্ধিত চিত্ররূপ

যখন দুটি ভিন্ন প্রজাতির জীব একত্রে বসবাস করে পারস্পরিক বিনিময়ের মাধ্যমে জীবনধারণ করে এবং উভয় প্রজাতি উপকৃত হয়, তাকে মিউচুয়ালিজম বা অন্যোন্যজীবিতা বলে।

উদাহরণ : উইপোকা সাধারণত কাঠ ভক্ষণের মাধ্যমে জীবনধারণ করে। কাঠের সেলুলোজ এরা পাচিত করতে পারে না, কিন্তু এদের অন্ত্রে বসবাসকারী ট্রাইকোনিম্ফা (Trichonympha) প্রোটোজোয়া সেলুলোজ উৎসেচক নিঃসরণ করে কাঠের সেলুলোজকে পরিপাক করতে সহায়তা করে। উপরন্তু প্রোটোজোয়া উইপোকার অন্ত্রে আশ্রয় ও পুষ্টিলাভ করে।

মিউচুয়ালিজম্ বা অন্যোন্যজীবিতার তাৎপর্য :

(১) অধিকাংশ ক্ষেত্রে মিউচুয়ালিজম্ শিকারি-শিকার অথবা পরজীবী-পোষক সম্পর্ক থেকে উদ্ভব হয়েছে।

(২) মিউচুয়ালিজম্ দীর্ঘসময় ধরে সহবিবর্তনের (coevolution) ফলশ্রুতিরূপে চিহ্নিত।

(৩) মিউচুয়ালিজম্ ঘটনায় পুষ্টিদ্রব্যের পুনরাবর্তন এবং সমগ্র বাস্তুতন্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

মিউচুয়ালিজমের প্রকারভেদ :

(১) **ট্রফিক মিউচুয়ালিজম (Trophic mutualism):**
উভয় অংশীদার প্রজাতি পরস্পর থেকে শক্তি ও পুষ্টিদায়ী পদার্থ পেয়ে থাকে।

(২) **ডিফেনসিভ (defensive) বা প্রতিরক্ষামূলক মিউচুয়ালিজম্ :**
মিউচুয়ালিজমে যুক্ত এক অংশীদার প্রজাতি থেকে অন্য অংশীদার প্রজাতিটি খাদ্য ও আশ্রয় পেয়ে থাকে এবং বিনিময়ে অংশীদার প্রজাতিটিকে শাকাশী বা শিকারজীবী প্রাণী থেকে রক্ষা করে।

(৩) **ডিসপারসিভ মিউচুয়ালিজম (Dispersive mutualism) :**
এই প্রকার সম্পর্কে দুটি অংশীদার প্রজাতির মধ্যে সাধারণত অন্তরঙ্গভাবে বসবাসের ব্যবস্থা থাকে না। সাধারণত এই প্রকার সম্পর্কে প্রাণী ও পুষ্প যুক্ত থাকে। প্রাণীরা পুষ্প থেকে পরাগ বহন করে পরাগ সংযোগের মাধ্যমে উদ্ভিদের অস্তিত্ব রক্ষা করে অপরদিকে প্রাণী মকরন্দ সংগ্রহ করে।

(৪) **আবশ্যিক অন্যোন্যজীবিতা (Obligate mutualism) :**
এই প্রকার সম্পর্কে অংশীদার প্রজাতিদ্বয় উভয়ে উভয়ের ওপর ওতপ্রোতভাবে নির্ভরশীল, তারা কোনোভাবেই স্বাধীনভাবে বাঁচতে পারে না।

(৫) **স্বেচ্ছামূলক অন্যোন্যজীবিতা বা মিউচুয়ালিজম (Facultative mutualism) :**
এই প্রকার সম্পর্কে উভয় অংশীদার প্রজাতিই প্রয়োজনানুসারে স্বাধীন জীবনযাপনে সক্ষম।

4.1.7 সারাংশ

দুটি ভিন্ন প্রজাতির মধ্যে গড়ে ওঠা সম্পর্ককে আন্তঃপ্রজাতির সম্পর্ক বলা হয়।

পরজীবিতা, মিথোজীবিতা, ব্যতিহারজীবিতা, অন্যোন্যজীবিতা প্রভৃতি হল বিভিন্ন প্রকার আন্তঃপ্রজাতি সম্পর্কের উদাহরণ। পরজীবিতা বলতে পরজীবীর পোষকের ওপর শারীরবৃত্তীয় ও বিপাকীয় নির্ভরশীলতাকে বোঝায়।

পরজীবিতা বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে—স্বেচ্ছামূলক পরজীবিতা, বাধ্যতামূলক পরজীবিতা, আকস্মিক পরজীবিতা, বহিঃপরজীবিতা, অন্তঃপরজীবিতা, ম্যাক্রোপরজীবিতা, মাইক্রোপরজীবিতা, ব্রুড পরজীবিতা, অন্তঃপরজীবিতা। পরজীবিতা পূর্ণ বা আংশিক সময়ের জন্য হতে পারে।

মিথোজীবিতা সম্পর্কে দুটি ভিন্ন প্রজাতি পুষ্টি পদার্থের আদানপ্রদানের মাধ্যমে একে অপরের থেকে উপকৃত হয়। ব্যতিহারজীবিতা সম্পর্কে দুটি ভিন্ন প্রজাতির একটি প্রজাতি পুষ্টিগতভাবে উপকৃত হয় এবং পোষক প্রজাতি উপকৃত বা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

অন্যোন্যজীবিতা বা মিউচুয়ালিজম্ সম্পর্কে দুটি ভিন্ন প্রজাতির জীব একত্রে বসবাস করে পারস্পরিক বিনিময়ের মাধ্যমে জীবনধারণ করে এবং উভয় প্রজাতি উপকৃত হয়।

4.1.8 অনুশীলনী

1. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

(a) পরজীবিতা কাকে বলে ?

(b) পূর্ণ পরজীবী কাকে বলে ?

(c) উদাহরণসহ বহিঃপরজীবীর সংজ্ঞা দিন।

(d) হিমোপ্যারাসাইট বলতে কী বোঝেন ? এর একটি উদাহরণ দিন।

(e) মিউচুয়ালিজম কাকে বলে ? উদাহরণ দিন।

(f) পরজীবিতার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি লিখুন।

(g) ব্যতিহারজীবিতা (commensalism) এবং অন্যোন্যজীবিতার (Mutualism) পার্থক্য নিরূপণ করুন।

(h) উইপোকা (Termite) এবং ট্রাইকোনিম্ফার (Trichonympha) অনুষঙ্গ কোন্ আন্তঃপ্রজাতি সম্পর্ককে নির্দেশ করে এবং কেন ?

2. শূন্যস্থান পূরণ করুন :

(a) যে সকল জীব জীবনের সমগ্র দশা পরজীবীরূপে পোষকের ওপর নির্ভরশীল তাদের..... পরজীবী বলে।

(b) পরজীবীর আয়ুষ্কাল পোষকের তুলনায়.....কিন্তু প্রজনন হার খুব.....।

(c) হার্মিট ক্র্যাব ও সি-অ্যানিমনের পারস্পরিক সম্পর্ক.....উদাহরণ।

(d) কমেনস্যালিজম্ শব্দের আক্ষরিক অর্থ একই টেবিলে.....।

(e) যে আন্তঃপ্রজাতি অনুষঙ্গো অংশীদার উভয় প্রজাতি উপকৃত হয় তাকে.....বলে।

4.1.9 উত্তরমালা

1.(a) 1.3 অংশ দেখুন

(b) 1.3.1 অংশ দেখুন

(c) 1.3.1 অংশ দেখুন

(d) 1.3.1 অংশ দেখুন

(e) 1.4 অংশ দেখুন

(f) 1.3.2 অংশ দেখুন

(g) 1.5 এবং 1.6 অংশ দেখুন

(h) 1.6 অংশ দেখুন

2. (a) বাধ্যতামূলক

(b) কম, বেশি

(c) মিথোজীবিতা

(d) খাদ্যগ্রহণ

(e) মিউচুয়ালিজম

একক 4.2? কয়েকটি পরজীবী প্রাণীর জীবন ইতিহাস এবং রোগজনিত লক্ষণ (Life history and pathogenecity of some parasites)

4.2.1 প্রস্তাবনা

যে সকল প্রাণী অন্য প্রজাতির প্রাণীর দেহে বসবাস করে আশ্রয় ও খাদ্য গ্রহণ করে তাদের **পরজীবী** প্রাণী বলে এবং যে সব প্রাণীদেহে আশ্রয় পায় তাদের বলে **পোষক** প্রাণী। প্রতিটি পরজীবী বিভিন্নভাবে পোষকের ওপর নির্ভরশীল এবং বিভিন্নভাবে পোষকের ক্ষতিসাধন করে। পরজীবীর পোষকের ওপর নির্ভরশীলতা সুদীর্ঘ ও চিরস্থায়ী হতে পারে, যেমন মানুষের অন্ত্রে বসবাসকারী ফিতাকৃমি। আবার সম্পর্ক সাময়িক হতে পারে, যেমন এঁটুলি। মানুষের বিভিন্ন ধরনের অভ্যাসের ফলে ওই সমস্ত পরজীবীর সংক্রমণ ঘটার সম্ভাবনা প্রবল। যেমন, এন্টামিবা হিস্টোলাইটিকার সংক্রমণ মানুষের অপরিচ্ছন্ন স্বভাব ও অজ্ঞতার জন্য দায়ী এবং এর ফলে মানুষের আমাশয় রোগের সৃষ্টি হয়। প্লাজমোডিয়াম ভাইভ্যাক্স ম্যালেরিয়া রোগসৃষ্টিকারী একটি পরজীবী। এই পরজীবীটি স্ত্রী অ্যানোফিলিস মশা দ্বারা বাহিত হয়। অ্যাসকারিস লুম্ব্রিকয়ডিস মানুষের অন্ত্রে বসবাসকারী সব থেকে পরিচিত গোলকৃমি। এই গোলকৃমি মানুষের ক্ষুধামান্দ্য, অনিদ্রা, অজীর্ণতা, অ্যানিমিয়া, উদরাময়, স্নায়বিক দৌর্বল্য প্রভৃতি সৃষ্টির জন্য দায়ী। **অ্যাঙ্কাইলোস্টোমা ডুওডিনেল** নামক হুককৃমি প্রথম পর্যায়ে কুকুর, বেড়াল প্রভৃতি পোষকের দেহে পাওয়া গেলেও এই সমস্ত পোষকের সংস্পর্শে এসে মানুষের দেহেও এর সংক্রমণ ঘটে। ফলে অ্যাঙ্কাইলোস্টোমিওসিস, ক্রিপিং ইরাপশান ইত্যাদি রোগের সৃষ্টি হয়। যকৃৎ কৃমি *Fasciola hepatica* সাধারণত ভেড়ার যকৃতে অন্তঃপরজীবীরূপে বসবাস করে। মানুষ সাধারণত যকৃৎ কৃমি দ্বারা আক্রান্ত হয় না, তবে সুযোগ হলে মানুষের দেহেও এদের সংক্রমণ হয়। এর আক্রমণে যকৃৎ পচে গিয়ে **'লিভার রট'** রোগ সৃষ্টি করে। **একাইনোকক্কাস গ্রানুলোসাস** এক প্রকারের ফিতাকৃমি এবং কুকুর ও অন্যান্য মাংসাশী প্রাণীরা এদের চূড়ান্ত বা প্রধান পোষক। আক্রান্ত কুকুর ও অন্যান্য মাংসাশী প্রাণীদের সংস্পর্শে মানুষ এলে একাইনোকক্কাসের ডিম প্রায়শই মানুষের অন্ত্রে প্রবেশ করে। এর ফলে মানুষের বিভিন্ন অঙ্গে মারাত্মক **হাইডাটিডোসিস** রোগের সৃষ্টি হয়।

4.2.2 উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনারা এন্টামিবা হিস্টোলাইটিকা, প্লাজমোডিয়াম ভাইভ্যাক্স, অ্যাসকারিস লুম্ব্রিকয়ডিস, অ্যাঙ্কাইলোস্টোমা ডুওডিনেল, ফ্যাসিওলা হেপাটিকা এবং একাইনোকক্কাস গ্রানুলোসাস এর—

প্রাণীজগতে অবস্থান
ভৌগোলিক বিস্তার
বাসস্থান
অঙ্গসংস্থান
জীবনচক্র
সংক্রমণ

রোগজনিত লক্ষণ
নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সম্বন্ধে জানতে ও আলোচনা করতে পারবেন।

4.2.3 এন্টামিবা হিস্টোলাইটিকা *(Entamoeba histolytica)*

এন্টামিবা হিস্টোলাইটিকা মানুষের অন্ত্রে বসবাসকারী গুরুত্বপূর্ণ পরজীবী প্রোটোজোয়া। এরা অন্ত্রের গাত্রের কলা কোষ দ্রবীভূত করে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে এবং মানুষের আমাশয় (dysentery) রোগ সৃষ্টি করে। ল্যাম্বল্ (Lambl, 1859) সর্বপ্রথম এই পরজীবীটির সন্ধান পেয়েছিলেন। আক্ষরিক অর্থে **এন্টামিবা হিস্টোলাইটিকা** (Ento=within, amoibe=change; Histos-tissue, lysis=dissolve) পরজীবীটি "কলাকোষ বিধ্বংসী" বা 'কলা-লয়নিক' (tissue dissolving) অন্তঃপরজীবী। এরা উৎসেচক নিঃসরণের মাধ্যমে অন্ত্রগাত্রের কোষকে দ্রবীভূত করে ক্ষত বা আলসার সৃষ্টি করে। এই স্থান থেকে পরজীবী শ্লেষ্মাকোষ, কলা, লোহিত রক্তকণিকা ইত্যাদি খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। মানুষ ছাড়া বানর, বিড়াল, কুকুর, শূকর, বনমানুষ, বেবুন ইত্যাদি প্রাণীতে এন্টামিবা সংক্রমণের বিবরণ পাওয়া যায়।

4.2.3.1 প্রাণীজগতে অবস্থান (Systematic position)

উপরাজ্য—প্রোটোজোয়া
পর্ব—সারকোম্যাস্টিগোফোরা
উপপর্ব—সারকোডিনা
শ্রেণি—লোবোসিয়া
গণ—এন্টামিবা (Entamoeba)
প্রজাতি—হিস্টোলাইটিকা (histolytica)

4.2.3.2 ভৌগোলিক বিস্তার (Geographical distribution)

এন্টামিবা হিস্টোলাইটিকার সংক্রমণ পৃথিবীর সর্বত্রই দেখতে পাওয়া যায়। পৃথিবীব্যাপী ব্যাপ্তি হলেও উষ্ণমণ্ডলের নিরক্ষীয় এবং উপনিরক্ষীয় অঞ্চলসমূহে এন্টামিবার প্রাদুর্ভাব বেশি। দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, মেক্সিকো, মিশর, চীন, ভারত, বাংলাদেশ ইত্যাদি দেশে এন্টামিবার সংক্রমণ বহুলভাবে পরিলক্ষিত হয়। ভারতে এদের ব্যাপক প্রাদুর্ভাব উল্লেখযোগ্য। এদেশের সত্তর শতাংশ মানুষ এন্টামিবা ঘটিত আমাশয়ে আক্রান্ত। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, যে সকল অঞ্চলে জীবনযাত্রা নিকৃষ্ট মানের এবং যেখানে পরিচ্ছন্ন খাদ্য ও পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই সেই সব অঞ্চলে এই পরজীবীর ব্যাপকতা বেশি দেখা যায়।

4.2.3.3 বাসস্থান (Habitat)

এই পরজীবীটির ট্রোফোজয়েট দশা মানুষের ইলিয়াম ও সিকামের সংযোগস্থলে ও বৃহদন্ত্রের মিউকাস ও অধঃমিউকাস স্তরে উপস্থিত থাকে। অন্ত্র গহ্বরে এদের সিস্ট পাওয়া যায়। ক্রনিক অবস্থায় পরজীবী অন্ত্রের প্রাকার ভেদ করে পোর্টাল সংবহনের মাধ্যমে যকৃৎ, ফুসফুস, প্লীহা এমনকি মস্তিষ্ক প্রভৃতি অঙ্গে পৌঁছায়। এই পরজীবীর সিস্ট পানীয় জল, শাকসব্জির মধ্যে বহুদিন অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকতে পারে।

4.2.3.4 অঙ্গসংস্থান (Morphology)

এন্টামিবা হিস্টোলাইটিকার জীবনচক্রে অ্যামিবাকৃতি ট্রোফোজয়েট, প্রিসিস্টিক এবং সিস্টিক দশা দেখা যায়।

(ক) ট্রোফোজয়েট (বৃদ্ধি ও খাদ্যগ্রহণ পর্যায়) :

এই পর্যায়ে পরজীবী স্বল্পগতিসম্পন্ন হয়, অন্ত্র থেকে লোহিত রক্তকণিকা, শ্লেষ্মাকোষ এবং অন্ত্রের ব্যাক্টেরিয়া খাদ্যরূপে গ্রহণ করে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ক্ষণপদযুক্ত ট্রোফোজয়েটটির সুনির্দিষ্ট কোনো আকার থাকে না। দেহ বর্ণহীন স্বচ্ছ ও অনিয়তাকার। এন্টামিবার ট্রোফোজয়েট দশাটি পাতলা স্থিতিস্থাপক প্লাজমা পর্দা দ্বারা আবৃত থাকে। সাইটোপ্লাজম এক্টোপ্লাজম ও এন্ডোপ্লাজমে বিভেজিত। এক্টোপ্লাজম সম্মুখ দিকে প্রসারিত হয়ে স্থূল ক্ষণপদ সৃষ্টি করে। এন্ডোপ্লাজমে খাদ্যগহ্বর, নিউক্লিয়াস, লোহিত রক্তকণিকা এবং শ্বেত রক্তকণিকার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। ট্রোফোজয়েটে নিউক্লিয়াসটি গোলাকার এবং নিউক্লিয়াসের কেন্দ্রে ক্ষুদ্র ক্যারিওসোম থাকে। এ ছাড়া সাইটোপ্লাজমে রাইবোজোম, দণ্ডাকৃতি ক্রোমাটয়েড বস্তু, গ্লাইকোজেন দানা এবং এন্ডোপ্লাজমিক জালিকা থাকে। গলগি বস্তু ও মাইটোকন্ড্রিয়া থাকে না (চিত্র 4.14)। ট্রোফোজয়েট দশাটি প্রতি 8 ঘণ্টায় দ্বিপার্শ্বীয় বিভাজন দ্বারা বিভাজিত হয়। কিছু কিছু ট্রোফোজয়েট খাদ্যনালিতে সিস্ট দশায় পরিণত হয়, তাকে এনসিস্টমেন্ট (Encystment) বলে। ট্রোফোজয়েটগুলি ক্রমে বৃত্তাকার ধারণ করে যা পরজীবীর প্রিসিস্টিক দশা নামে পরিচিত।

(খ) প্রিসিস্টিক দশা :

এটি গোলাকার অথবা সামান্য ডিম্বাকার এবং ক্ষুদ্র ক্ষণপদবিশিষ্ট হয়। সাইটোপ্লাজমে লোহিত রক্তকণিকা অথবা খাদ্যকণা থাকে না। এর নিউক্লিয়াসের বৈশিষ্ট্য ট্রোফোজয়েটের মতো। এই পর্যায়ে সাইটোপ্লাজমে একটি বা দুটি ক্রোমাটয়েড বডি দেখা যায়। এই দশা বৃহদন্ত্রে আবরণীবদ্ধ অবস্থায় নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে থাকে এবং অন্ত্রের কোনোরূপ ক্ষতি করে না।

(গ) সিস্টিক দশা : প্রি-সিস্টিক দশাটি একটি পাতলা স্বচ্ছ অভেদ্য পর্দা বেষ্টিত থাকে এবং ক্রমে গোলাকার হয় এবং সাইটোপ্লাজমে ক্রোমাটয়েড দণ্ড ও গ্লাইকোজেন দানা দেখা যায়। একে সিস্ট বলে। প্রথম অবস্থায় সিস্টে একটি নিউক্লিয়াস থাকে। পরিণতির সময় এর নিউক্লিয়াসটি দ্বিবিভাজন পদ্ধতিতে বিভাজিত হয়ে প্রথমে দুটি ও পরে চারটি নিউক্লিয়াস সৃষ্টি করে। এই দশার শেষদিকে ক্রোমাটয়েড দণ্ড এবং গ্লাইকোজেন দানা অবলুপ্ত হয়ে যায় (চিত্র 4.14)। মানুষের মলের সঙ্গে সিস্টগুলি দেহের বাইরে মুক্ত হয়। কম তাপমাত্রায় 6-7 সপ্তাহ বেঁচে থাকে। সিস্ট পরিস্ফুরণের উপযুক্ত তাপমাত্রা হল 37°C।

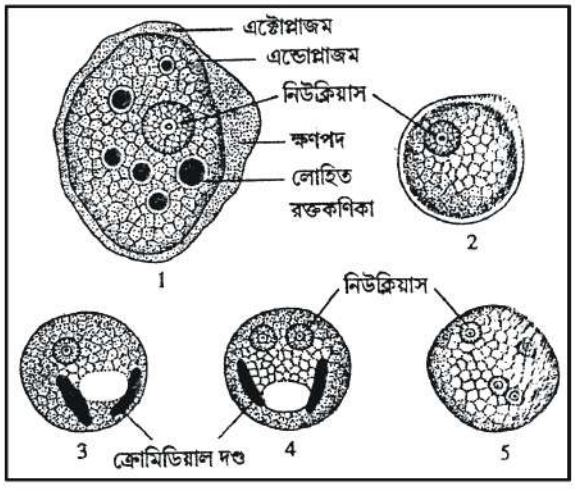

চিত্র : 4.14 : এন্টামিবা হিস্টোলাইটিকা : 1. ট্রোফোজয়েট দশা 2. প্রি-সিস্টিক দশা 3-5. সিস্টিক দশা

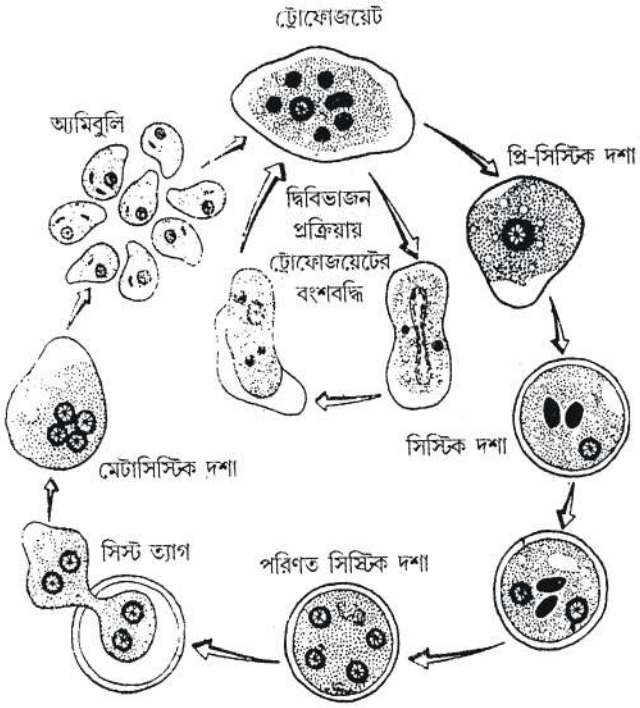

চিত্র : 4.15 এন্টামিবা হিস্টোলাইটিকার জীবন ইতিহাসের বিভিন্ন দশা

4.2.3.5 জীবনচক্র (Life Cycle)

এন্টামিবা হিস্টোলাইটিকার জীবনচক্র সম্পাদনের জন্য একটিমাত্র পোষকের প্রয়োজন হয়। এদের জীবনচক্রে প্রধানত দুটি দশা দেখা যায়—ট্রোফোজয়েট ও সিস্টিক দশা। এই দুটি দশার অন্তর্বর্তী দশারূপে প্রিসিস্টিক দশা দেখা যায়। সিস্ট থেকে ট্রোফোজয়েটে রূপান্তরকে এক্সসিস্টেশন এবং ট্রোফোজয়েট থেকে সিস্টে রূপান্তরকে এনসিস্টেশন বলে। উভয় পদ্ধতি একই পোষক প্রাণীতে সংঘটিত হলেও উৎপাদনের পর সিস্টকে নতুন অর্থাৎ বিভিন্ন মানুষে স্থানান্তরিত হতে হয় এবং কেবলমাত্র তাহলেই সিস্টের পরিস্ফুরণ ঘটে (চিত্র : 4.15) ।

ক. এক্সসিস্টেশন (Excystation) :

আক্রান্ত মানুষের মলের সঙ্গে এন্টামিবা হিস্টোলাইটিকা সিস্টরূপে নির্গত হয়। সিস্ট দশাটি চারটি নিউক্লিয়াসযুক্ত এবং এটাই পরজীবীর সংক্রামক দশা। এই সংক্রামক দশা খাদ্য বা পানীয়ের সঙ্গে পোষকের অন্ত্রে প্রবেশ করে। সিস্টের প্রোটিনসমৃদ্ধ প্রাকার ক্ষুদ্রান্ত্রের ট্রিপ্সিনের সান্নিধ্যে এসে বিনষ্ট হয়। প্রতি সিস্ট থেকে চারটি নিউক্লিয়াসযুক্ত অ্যামিবা মুক্ত হয়। একে বলে **মেটাসিস্টিক** দশা। এরপর ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রতিটি চারটি নিউক্লিয়াসযুক্ত অ্যামিবা বিভাজিত হয়ে আটটি নিউক্লিয়াস উৎপন্ন করে। এর আটটি নিউক্লিয়াস

আলাদা হয়ে আটটি ক্ষুদ্র অ্যামিবার সৃষ্টি হয়। এই অ্যামিবাগুলি পরিণত হয়ে খুবই সক্রিয় ও চলনশীল হয় এবং শীঘ্রই অন্ত্রের কলার মধ্যে প্রবেশ করে অন্ত্রের কলাকোষ ও লোহিত রক্তকণিকা ভক্ষণ করে। এই ট্রোফোজয়েট কলা-কোষ সংক্রমণে পারদর্শী এবং কোলন ও সিকামের অধঃমিউকাস স্তরে আশ্রিত থেকে বিভাজিত হতে থাকে। এন্টামিবা হিস্টোলাইটিকার ট্রোফোজয়েট সম্পূর্ণরূপে পরজীবী জীবনযাপন করে। ট্রোফোজয়েট দশাটি অন্ত্রের প্রাকারে আমাশয়ের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ক্ষতের সৃষ্টি করে। পূর্ণাঙ্গ ট্রোফোজয়েটটি ক্রমাগত বিভাজিত হয়ে নতুন অপত্যের সৃষ্টি করে (চিত্র 4.16)।

খ. এনসিস্টেশন (Encystation) :

কিছু সংখ্যক ট্রোফোজয়েট পোষকের বৃহদন্ত্রের মিউকাস স্তর থেকে মুক্ত হয়ে বৃহদন্ত্রের গহ্বরে অবস্থান করে। এখানে ট্রোফোজয়েট সিস্ট দশায় পরিণত হয় এবং প্রাকার পরিবেষ্টিত হয়। নিউক্লিয়াসটি পরপর দুবার বিভাজিত হয়ে চারটি নিউক্লিয়াস সৃষ্টি করে। প্রাকারবেষ্টিত চার নিউক্লিয়াসযুক্ত দশাটিকে সিস্ট দশা বলে। (চিত্র 4.16)

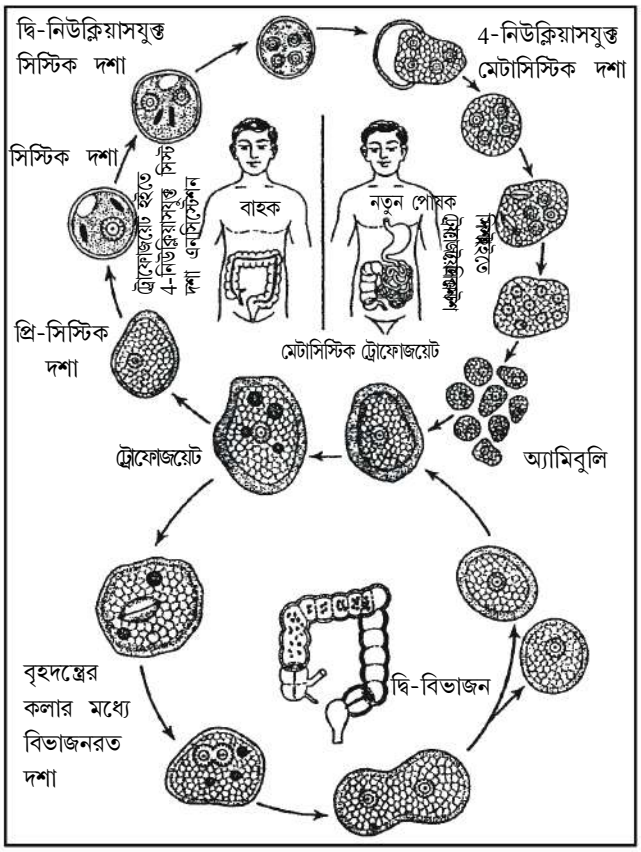

চিত্র 4.16 এন্টামিবা হিস্টোলাইটিকার মানবদেহে সম্পন্ন জীবনচক্র

4.2.3.6 সংক্রমণ পদ্ধতি (Mode of infection)

চারটি নিউক্লিয়াসযুক্ত আবরণীবদ্ধ সিস্টগুলি মানুষের মলের সঙ্গে বাইরে আসে। এই মল যখন পানীয় জল বা কাঁচা শাক-সব্জির সংস্পর্শে আসে, তখন সিস্টগুলি শাকসব্জি বা পানীয় জলে সংক্রমিত হয়। সংক্রমিত পানীয় জল পান করলে বা অসিদ্ধ শাক-সব্জি ভক্ষণ করলে সিস্টগুলি সুস্থ মানুষের পৌষ্টিক নালিতে প্রবেশ করে। কোনো ব্যক্তি খাদ্যবস্তু নাড়াচাড়া করলে তাদের নখের নিচে কিংবা অপরিষ্কার হাতে জীবিত সিস্ট বাহিত হয়ে সংক্রামিত হয়। সুতরাং খাদ্যবস্তু নাড়াচাড়া করায় নিযুক্ত ব্যক্তি অ্যামিবিয়েসিস ব্যাধিতে আক্রান্ত কি না তা নিরূপণ করা একান্ত প্রয়োজন। সুতরাং সংক্রমণে পোষক প্রাণী, পরজীবী ও পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অনেক সময় মাছি, আরশোলা প্রভৃতি পতঙ্গ সংক্রামিত মলের সান্নিধ্যে এলে তার মুখোপাঙ্গ ও পদে সিস্টগুলি লেগে যায়। এরপর এভাবে সংক্রমিত প্রাণীগুলি মানুষের খাদ্য ও পানীয়ে বসলে এই খাদ্য ও পাণীয়ও সিস্ট সংক্রমিত হয়। এবার এই সিস্টযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করে সহজেই মানুষ সংক্রামিত হয়।

4.2.3.7 রোগজনিত লক্ষণ (Pathogenecity) : এন্টামিবা হিস্টোলাইটিকার সংক্রমণে মানুষের দেহে আমাশয় ও রক্ত আমাশয় রোগ দেখা দেয়। একে অ্যামিবিক আমাশয় বলে। এই প্রকার আমাশয়ে তলপেটে অসহ্য বেদনা এবং অনবরত মিউকাসসমৃদ্ধ অল্প অল্প তরল মল নির্গত হতে থাকে। এইসময় ট্রোফোজয়েটগুলি ক্ষুদ্রান্ত্রের মাইক্রোভিলাই-এর সংস্পর্শে এসে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত হয়। এর ফলে ট্রোফোজয়েটের প্লাজমাপর্দা থেকে নিঃসৃত উৎসেচক অন্ত্রের অন্তঃগাত্রের কোলাজেন তন্তুগুলিকে নষ্ট করে দেয়। ফলে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়। দীর্ঘদিন আক্রমণের ফলে ক্ষতস্থান থেকে রক্ত, মিউকাস প্রভৃতি ক্ষরিত হতে থাকে। ক্ষত ক্রমশ প্রসারিত হয় এবং অন্ত্রের প্রাকারে ছিদ্রের সৃষ্টি হয়। সেই সময় রোগী ঘনঘন মলত্যাগে বাধ্য হয়। এই ক্ষরিত মিউকাসের সঙ্গে পরজীবীর ট্রোফোজয়েট ও সিস্ট মুক্ত হয়। দীর্ঘদিন এন্টামিবার সংক্রমণের ফলে পরজীবীর ট্রোফোজয়েট দশা অন্ত্রের ক্ষতস্থান দিয়ে রক্ত সংবহনতন্ত্রে প্রবেশ করে। সেখান থেকে হেপাটিক পোর্টাল সংবহনের মাধ্যমে পরজীবী যকৃৎ, প্লীহা, ফুসফুস এমনকি মস্তিষ্কে প্রবেশ করে। যকৃতের বৃদ্ধি ঘটে এবং যন্ত্রণা হয়, ফলে জ্বর, জন্ডিস ইত্যাদি রোগ হয়। ফুসফুস আক্রমণে হলুদ বর্ণের শ্লেষ্মা কাশির সঙ্গে বেরিয়ে আসে (চিত্র 4.17)।

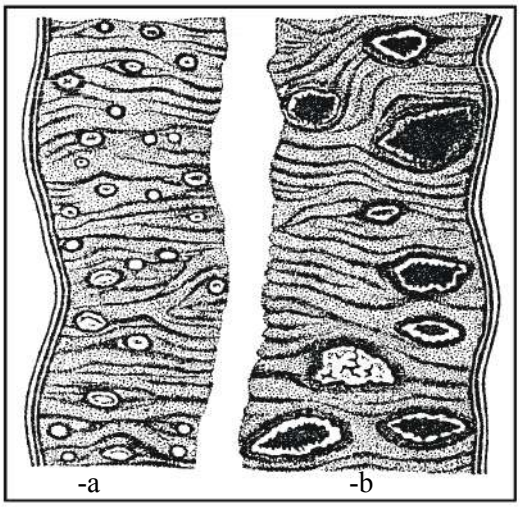

চিত্র 4.17 এন্টামিবার আক্রমণে মানুষের অন্ত্রে ক্ষত সৃষ্টি ; -a প্রাথমিক অবস্থা, -b দীর্ঘদিন রোগভোগের পর

4.2.3.8 নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি (Control measures)

এন্টামিবা হিস্টোলাইটিকার নিয়ন্ত্রণ দুভাবে করা যায়।

(ক) নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা (Preventive measures) :

(i) উন্নত পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। যাতে খাদ্য ও পানীয় সিস্টদ্বারা সংক্রমিত না হয়।
(ii) পরিশোধিত পানীয় জল গ্রহণ করা উচিত।
(iii) খাদ্যগ্রহণ করার আগে ভালোভাবে হাত ধোওয়া উচিত।
(iv) কাঁচা শাকসব্জি ভালোভাবে ধুয়ে রান্না করা প্রয়োজন।

(খ) চিকিৎসা (Treatment) :

এন্টামিবা হিস্টোলাইটিকা দ্বারা সৃষ্ট আমাশয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ সেবন করা প্রয়োজন। টিনিডাজোল (Tinidazole), মেট্রোনিডাজোল (Metronidazole), নিরিডাজোল (Niridazole) ইত্যাদি ওষুধ সেবনে অ্যামিবিক আমাশয়ে ভালো ফল পাওয়া যায়।

4.2.4 প্লাজমোডিয়াম ভাইভ্যাক্স *(Plasmodium vivax)*

এককোষী প্রাণী প্লাজমোডিয়াম মানবদেহে অন্তঃপরজীবীরূপে জীবনযাপন করে ম্যালেরিয়া নামক সবিরাম জ্বর রোগ সৃষ্টি করে। 'ম্যালেরিয়া' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হল bad air বা দূষিত বায়ু। ম্যালেরিয়ার সঠিক কারণ আবিষ্কারের পূর্বে সাধারণ ধারণা ছিল যে, দূষিত বায়ুর প্রভাবে ম্যালেরিয়া নামক দুরারোগ্য ব্যাধির সৃষ্টি হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বিজ্ঞানী লাভেরন, রোমানভস্কি, রোনাল্ড রসের আবিষ্কারের ফলে আমরা জানতে পারি **প্লাজমোডিয়াম** নামক এককোষী পরজীবী প্রাণী ম্যালেরিয়া রোগের কারণ এবং স্ত্রী অ্যানোফিলিস মশার মাধ্যমে এটি ম্যালেরিয়া রোগাক্রান্ত মানুষ থেকে সুস্থ মানুষের দেহে সংক্রমিত হয়। মানুষ ও অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণী প্লাজমোডিয়াম পরজীবীর নিয়মিত আশ্রয়দাতা বা পোষক। স্ত্রী অ্যানোফিলিস মশা এদের অন্তর্বর্তী আশ্রয়দাতা। মানবদেহে চারটি প্রজাতির ম্যালেরিয়া পরজীবী পাওয়া যায়।

(১) *Plasmodium vivax*
(২) *Plasmodium falciparum*
(৩) *Plasmodium malariae*
(৪) *Plasmodium ovale*

4.2.4.1 প্রাণীজাগতে অবস্থান (Systematic position)

উপরাজ্য—প্রোটোজোয়া (Protozoa)
পর্ব—এপিকম্প্লেক্সা (Apicomplexa)

শ্রেণি—স্পোরোজোয়িয়া (Sporozoaea)
উপশ্রেণি—কক্সিডিয়া (Coccidia)
গণ—প্লাজমোডিয়াম (Plasmodium)
প্রজাতি—ভাইভ্যাক্স (vivax)

4.2.4.2 ভৌগোলিক বিস্তার (Geographical distribution)

প্লাজমোডিয়াম ভাইভ্যাক্সের প্রকোপ গ্রীষ্মমণ্ডল (Tropical zone) এবং নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলে সবচেয়ে বেশি। আফ্রিকা ব্যতীত দক্ষিণ আমেরিকা, ভারত, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, মায়ানমার, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া এবং দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে প্লাজমোডিয়াম ভাইভ্যাক্স দ্বারা সৃষ্ট 'বিনাইন টারসিয়ান ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব দেখা যায়।

4.2.4.3 বাসস্থান (Habitat)

প্লাজমোডিয়াম ভাইভ্যাক্স মানুষের লোহিত রক্তকণিকা এবং যকৃতের প্যারেনকাইমা কোষের মধ্যে অবস্থান করে। স্ত্রী অ্যানোফিলিস মশার পৌষ্টিকনালী ও লালাগ্রন্থি প্লাজমোডিয়ামের আবাসস্থল। মানুষের রক্তে ও যকৃতে প্লাজমোডিয়ামের অযৌন জনন এবং স্ত্রী অ্যানোফিলিস মশার শরীরে যৌন জনন দশা সম্পন্ন হয়।

4.2.4.4 অঙ্গসংস্থান (Morphology)

প্লাজমোডিয়াম ভাইভ্যাক্সের দেহ একটিমাত্র কোষের তৈরি। এদের দেহে একটি সজীব কোষাবরণী নিউক্লিয়াসযুক্ত সাইটোপ্লাজমকে বেষ্টন করে থাকে। সাইটোপ্লাজমে সেন্ট্রিওল, মাইটোকন্ড্রিয়া, গলগি বস্তু, এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলাম, রাইবোজোম ও লাইসোজোম থাকে। এই পরজীবীর জীবন ইতিহাসে মানবদেহে অযৌন জনন পর্যায়ে ট্রোফোজয়েট, সাইজন্ট, মেরোজয়েট ও গ্যামেটোসাইট দশা দেখা যায়। মশকীর দেহে এই পরজীবীর যৌন পর্যায়ে গ্যামেট, জাইগোট বা উকাইনেট, উসিস্ট ও স্পোরোজয়েট দশা দেখা যায়।

(ক) ট্রোফোজয়েট : মানুষের লোহিত রক্তকণিকায় অবস্থানরত প্লাজমোডিয়াম পরজীবীর বৃদ্ধিকালকে ট্রোফোজয়েট রূপে বর্ণিত করা হয়েছে। জীবনচক্রে রিং স্তর থেকে পূর্ণ গ্যামেটোসাইট এবং সাইজন্টের পূর্ব অবস্থা পর্যন্ত বিস্তৃত দশা ট্রোফোজয়েট নামে পরিচিত (চিত্র 4.18)।

(খ) সাইজন্ট : ট্রোফোজয়েট কোষের নিউক্লিয়াস বিভাজনের প্রথম অবস্থাকে অপূর্ণ সাইজন্ট এবং বিভাজিত নিউক্লিয়াসসমূহকে ঘিরে সাইটোপ্লাজমীয় আবরণের সম্পূর্ণতা লাভের পর মূল ট্রোফোজয়েট কোষ পর্দা বিদীর্ণ হবার অবস্থায় পৌঁছাবার পর্যায়কে পূর্ণ সাইজন্ট বলে। সাইজন্টগুলি গোলা বা ডিম্বাকৃতির হয়। সাইজন্টের প্রান্তে একটি নিউক্লিয়াস থাকে। সাইজন্টের নিউক্লিয়াস বহুবিভাজন পদ্ধতিতে বিভাজিত হয়ে মেরোজয়েট সৃষ্টি করে। এই পর্যায়কে সাইজোগোনি বলা হয়। সাইজোগোনি মানুষের যকৃৎ কোষে ও রক্তের লোহিত কোষে সম্পন্ন হয়। (চিত্র 4.21)

[illegible]

[illegible]

হয়। সিস্টমধ্যস্থ উকাইনেটকে **ঊসিস্ট** বলে। ঊসিস্ট প্রথমে মিয়োসিস এবং পরে মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় অসংখ্য স্পোরোজয়েট সৃষ্টি করে। (চিত্র 4.21)

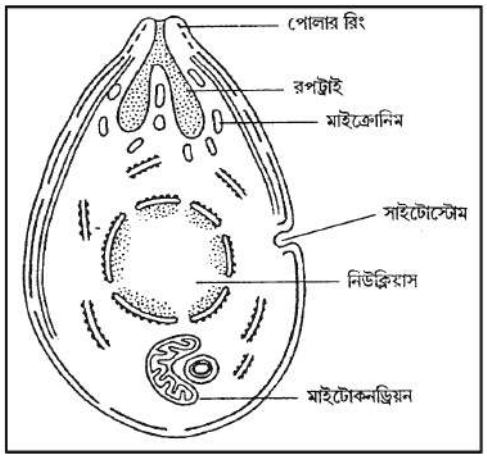

চিত্র 4.19 প্লাজমোডিয়ামের মেরোজয়েট দশা (আল্ট্রা মাইক্রোস্কোপে দেখা)

চিত্র 4.20 লোহিত রক্তকণিকার মধ্যে মেরোজয়েটের প্রবেশ

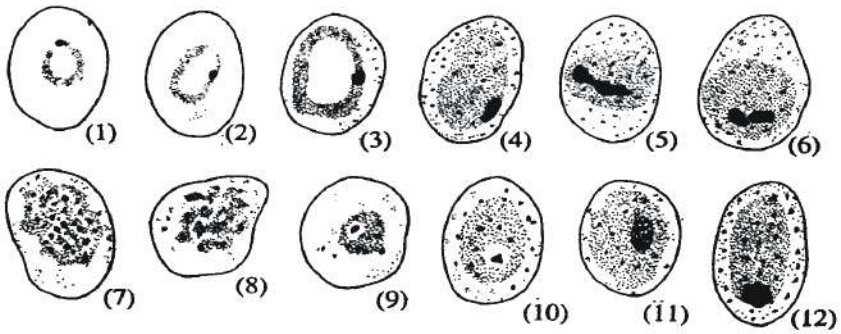

চিত্র 4.21 : *Plasmodium vivax*-এর পরিস্ফুরণের কতিপয় প্রতিনিধিমূলক পর্যায় (মানুষের রক্তের বিরঞ্জিত প্রলেপন (smear) দুষ্ট) ; 1. লোহিত রক্তকোষে প্রাথমিক অবস্থার বলয় পর্যায়ের (ring stage) ট্রোফোজয়েট ; 2. সামান্য পুরোনো ট্রোফোজয়েট ; এখানে লোহিত রক্তকোষের সমগ্র সাইটোপ্লাজমে বিন্দু (Schuffner's doï) আবির্ভূত হয়েছে। 3. আরো পুরোনো ট্রোফোজয়েট, এখানে বলয়টি অনেকটাই বৃহদাকার (enlarged) ধারণ করেছে। 4. পূর্ণাঙ্গ ট্রেফোজয়েট ; 5. নিউক্লিয়াস বিভাজন সূচনা করে ট্রোফোজয়েটের সাইজন্টে পরিবর্তন ; 6. প্রাথমিক অবস্থার সাইজন্ট, এখানে দুটি পৃথক নিউক্লিয়াস রয়েছে ; 7. অগ্রগতি সম্পন্ন (advanced) সাইজন্ট, এতে পরজীবীর সাইটেপ্লাজমে বহু নিউক্লিয়াস থাকে ; 8, বিখণ্ডন : এক্ষেত্রে প্রতিটি নিউক্লিয়াস সামান্য পরিমাণ সাইটোপ্লাজম গ্রহণ করে মেরোজয়েট গঠিত হয় ; 9,10, পরিস্ফুরণরত পুরুষ ও স্ত্রী গ্যামোটোসাইট ; 11. মাইক্রোগ্যামেটোসাইট ; 12. ম্যাক্রোগ্যামেটোসাইট।

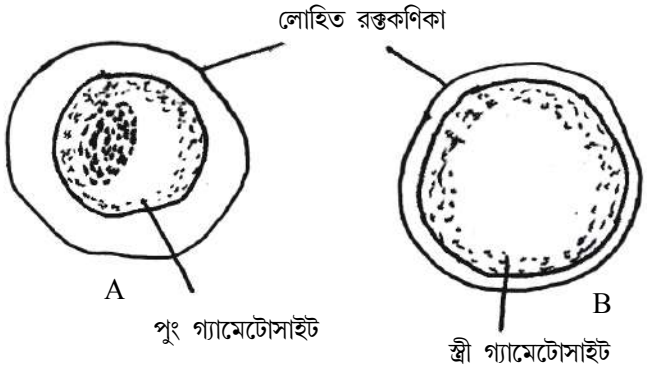

চিত্র 4.22 প্লাজমোডিয়াম ভাইভ্যাক্সের গ্যামেটোসাইট ; [A] পুংগ্যামেটোসাইট ও [B] স্ত্রী গ্যামেটোসাইট

পুং এবং স্ত্রী গ্যামেটোসাইটের মধ্যে পার্থক্য

পুং গ্যামেটোসাইট	স্ত্রী গ্যামেটোসাইট
১. আকারে ছোটো (10μm)	১. আকারে বড়ো (12μm)
২. সাইটোপ্লাজম উপযুক্ত রঞ্জকে হাল্‌কা নীল বর্ণ ধারণ করে।	২ উপযুক্ত রঞ্জকে গাঢ় নীল বর্ণ ধারণ করে।
৩. নিউক্লিয়াস বড়ো ও কেন্দ্রে অবস্থিত।	৩. নিউক্লিয়াস ছোটো ও কোষের কিনারায় অবস্থিত।

4.2.4.5 জীবনচক্র (Life cycle)

প্লাজমোডিয়াম ভাইভ্যাক্সের জীবনচক্রটি চারটি পর্যায়ে সম্পন্ন হয়ে থাকে—

১। প্রাক্ লোহিত রক্তকণিকা বা প্রি-এরিথ্রোসাইটিক সংক্রমণ চক্র (Pre-erythrocytic cycle)।
২। লোহিত রক্তকণিকা বা এরিথ্রোসাইটিক সংক্রমণ চক্র (Erythrocytic cycle)।
৩। বহিঃলোহিত রক্তকণিকা চক্র বা এক্সো-এরিথ্রোসাইটিক চক্র।
৪। যৌন জনন চক্র (Sexual cycle)

এদের মধ্যে প্রথম থেকে তৃতীয় দশা মানুষের দেহে এবং চতুর্থ দশা অ্যানোফিলিস মশকীর দেহে অতিবাহিত হয়।

(ক) মানুষের দেহে জীবনচক্র :

সংক্রমিত স্ত্রী অ্যানোফিলিস মশা সুস্থ মানুষকে কামড়ালে মশার লালারসের সঙ্গে প্লাজমোডিয়াম ভাইভ্যাক্সের অগণিত স্পোরোজয়েট মানুষের ত্বকের রক্তজালকে মুক্ত হয় ও রক্তস্রোতে প্রবেশ করে।

বহুসংখ্যক স্পোরোজয়েট মানুষের দেহের অনাক্রম্যতা (immunity) প্রক্রিয়ায় বিনষ্ট হয় এবং কিছু স্পোরোজয়েট রক্ত বাহিত হয়ে যকৃৎ কোষে উপস্থিত হয়।

(১) প্রাক্‌লোহিত রক্তকণিকা সংক্রমণ চক্র :

স্পোরোজয়েটগুলি মানুষের রক্তস্রোতে প্রবেশ করার আধঘণ্টার মধ্যে যকৃতের প্যারেনকাইমা কোষে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং প্রায় চারদিন অবস্থান করে। এখানে স্পোরোজয়েট খাদ্যগ্রহণ করে গোলাকার ধারণ করে ট্রোফোজয়েট দশায় পরিণত হয়। এই ট্রোফোজয়েট ক্রমে বিভাজিত হয়ে সাইজন্ট দশায় পৌঁছায়। এই সাইজন্টগুলি ক্রমাগত বিভাজিত হয়ে প্রায় 12,000 **প্রি-এরিথ্রোসাইটিক মেরোজয়েট** বা **ক্রিপ্টোজয়েট** সৃষ্টি হয় (চিত্র 4.19) । এই মেরোজয়েটগুলি খুব তাড়াতাড়ি রক্তবাহে প্রবেশ করে লোহিত রক্তকণিকায় আশ্রয় নিয়ে জীবনচক্রের পূর্ণতা আনে। (চিত্র 4.23)

(২) লোহিত রক্তকণিকা সংক্রমণ চক্র :

মেরোজয়েট লোহিতকণিকার প্লাজমাপর্দা অনুপ্রবিষ্ট করে সাইটোপ্লাজমের ভিতরে প্রবেশ করে (চিত্র 4.20) । মেরোজয়েটগুলি খাদ্য গ্রহণ শুরু করে এবং ট্রোফোজয়েটে পরিণত হয়। ট্রোফোজয়েট হিমোগ্লোবিনের গ্লোবিন অংশ আত্মসাৎ করে। এই দশায় নিউক্লিয়াসটি কোষের একপ্রান্তে অবস্থায় করে আংটির ন্যায় সিগনেট রিং দশা গঠন করে। এই সময় লোহিত রক্তকণিকার যে স্থানে ট্রোফোজয়েট অবস্থান করে না, সেই অংশের সাইটোপ্লাজমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানা দেখা যায়। এদের সুফ্‌নার্স ডটস্ (Schuffner's dots) বলে। প্লাজমোডিয়াম ভাইভাক্সের ক্ষেত্রে প্রায় আটচল্লিশ ঘণ্টায় এই চক্রটি সম্পূর্ণ হয়।

ট্রোফোজয়েট দশার শেষে ক্ষণপদগুলি অবলুপ্ত হয়ে যায় এবং গোলাকার সাইজন্ট গঠন করে। প্রতিটি সাইজন্ট বিভাজিত হয়ে 12-24টি অপত্য কোষ উৎপন্ন করে। এদের **এরিথ্রোসাইটিক মেরোজয়েটও** বলে। এই অবস্থায় লোহিত রক্তকণিকা পরজীবীর অপত্য কোষগুলি ধারণে অক্ষম হয়। ফলে মেরোজয়েটগুলি রক্তকণিকার পর্দা বিদীর্ণ করে রক্তস্রোতে নির্গত হয় এবং প্রচুর টক্সিন বা বিষ মুক্ত করে। এই বিষক্রিয়ার ফলে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর হয়।

লোহিত রক্তকণিকার মধ্যে কিছু মেরোজয়েট ট্রোফোজয়েটে পরিবর্তিত না হয়ে গ্যামেটোসাইটে রূপান্তরিত হয়। ছোটো আকৃতির গ্যামেটোসাইটগুলিকে পুং গ্যামেটোসাইট বা **মাইক্রোগ্যামেটোসাইট** এবং অপেক্ষাকৃত বড়ো আকৃতির গ্যামেটোসাইটকে স্ত্রী বা **ম্যাক্রোগ্যামেটোসাইট** বলে।

মানুষের শরীরে স্পোরোজয়েট দশা প্রবেশ করার 16 দিন পর প্রান্তীয় রক্তে গ্যামেটোসাইট দশাগুলি পাওয়া যায়। এইসময় স্ত্রী অ্যানোফিলিস মশা দংশনের মাধ্যমে আক্রান্ত রোগীর রক্ত গ্রহণ করে এবং মশার পাকস্থলীতে নীত গ্যামেটোসাইটগুলি গ্যামেটে রূপান্তরিত হয়। (চিত্র 4.23, 4.24)

(৩) বহিঃলোহিত রক্তকণিকা চক্র :

দেখা গেছে যে, প্রবিষ্ট কিছু মেরোজয়েট হিপ্‌নোজয়েটরূপে রক্তবাহের মাধ্যমে যকৃতে প্রবেশ করে এবং বেশ কিছুদিন সুপ্ত অবস্থায় থাকে। প্রায় ৬ মাস পর হিপ্‌নোজয়েটগুলি সুপ্ত অবস্থা কাটিয়ে মেরোজয়েটে পরিবর্তিত হয় এবং পুনরায় লোহিত রক্তকণিকাকে আক্রমণ করে ম্যালেরিয়া রোগের সৃষ্টি করে। এভাবে যকৃতে সুপ্ত হিপনোজয়েট থেকে পুনরায় জ্বর হওয়াকে বলে **রিল্যাপ্স** (relapse)।

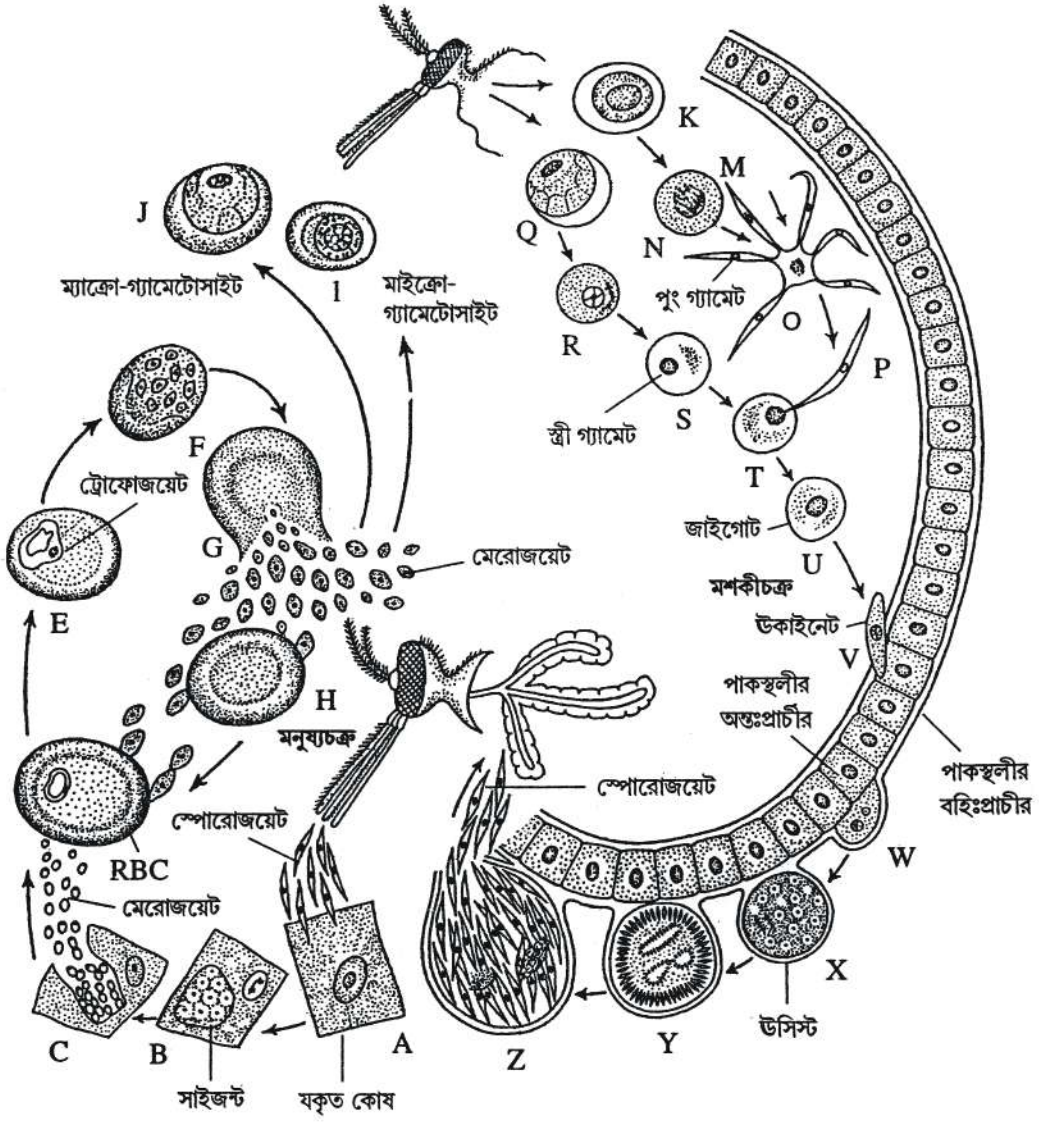

চিত্র : 4.23 প্লাজমোডিয়াম ভাইভ্যাক্সের জীবনচক্র

(৪) যৌন জনন চক্র (মশকীচক্র) :

আক্রান্ত ব্যক্তিকে কামড়ানোর সময় মশা রক্তের লোহিতকণিকাস্থিত গ্যামেটোসাইটগুলিকে নিজ পাকস্থলীতে গ্রহণ করে। পাকস্থলীতে মাইক্রোগ্যামেটোসাইটগুলি মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে আটটি হ্যাপ্লয়েড অপত্য কোষ সৃষ্টি করে। ক্রমে এদের একটি করে ফ্ল্যাজেলা সৃষ্টি হয়। এই অপত্য কোষগুলি ফ্লাজেলাযুক্ত হয়ে সূত্রাকার পুং গ্যামেট গঠন করে। এই পদ্ধতিকে এক্স-ফ্ল্যাজেলেশন বলে। অপরপক্ষে, পাকস্থলীর অভ্যন্তরে ম্যাক্রোগ্যামেটোসাইটগুলি গোলাকার ধারণ করে ম্যাক্রোগ্যামেট বা **ডিম্বাণু** সৃষ্টি করে। সক্রিয়, চলমান মাইক্রোগ্যামেট এই ম্যাক্রোগ্যামেটকে নিষিক্ত করে এবং নিশ্চল ভ্রূণাণু বা **জাইগোট** উৎপন্ন করে। ভ্রূণাণু নিউক্লিয়াসটি ডিপ্লয়েড। ভ্রূণাণুটি আকারে বৃদ্ধি পেয়ে দুপ্রান্ত সূচালো ও প্রলম্বিত আকার ধারণ করে এবং সক্রিয়, চলমান **উকাইনেট** গঠন করে। এই উকাইনেট মশার পাকস্থলীর অন্তঃপ্রাকার ভেদ করে বহিঃপ্রাকারের আবরণীকলার নিচে বাস করে। উকাইনেট সিস্ট গঠন করে ঊসিস্টে পরিবর্তিত হয়। একটি আক্রান্ত মশার পাকস্থলীর বহিঃপ্রাকারে প্রায় ৫০-৫০০ ঊসিস্ট থাকতে পারে। ডিপ্লয়েড ঊসিস্ট প্রথমে মিয়োসিস এবং পরে মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে সাইটোপ্লাজম পরিবেষ্টিত হয়ে স্পোরোব্লাস্টে পরিণত হয়। স্পোরোব্লাস্টের নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজম বিভাজিত হয়ে বেলনাকার স্পোরোজয়েট উৎপন্ন করে। ঊসিস্ট থেকে স্পোরোজয়েট সৃষ্টির পদ্ধতিকে **স্পোরোগোনি** বলে। অসংখ্য পরিণত স্পোরোজয়েট ঊসিস্টের প্রাকার বিদীর্ণ করে মশার দেহগহ্বরে মুক্ত হয়। এই স্পোরোজয়েটগুলি দেহগহ্বর থেকে মশার লালাগ্রন্থি, লালানালিকা হয়ে মশার প্রোবোসিসে প্রবেশ করে। আক্রান্ত মশা সুস্থ মানুষের রক্ত শোষণ করার আগে লালা নিঃসরণ করে। এই লালায় থাকে অসংখ্য স্পোরোজয়েট। স্পোরোজয়েটগুলি চর্মস্থ রক্তবাহদ্বারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে এবং ম্যালেরিয়া রোগ সংক্রামিত হয় (চিত্র 4.23) এই চক্র সম্পূর্ণ হতে 10-12 দিন সময় লাগে।

4.2.4.6 রোগজনিত লক্ষণ (Pathogenecity)

প্লাজমোডিয়াম ভাইভ্যাক্স দ্বারা সৃষ্ট ম্যালেরিয়া রোগের লক্ষণ তিনটি পর্যায়ে প্রকাশ পায়—

(ক) শীতল অবস্থা :

রোগী প্রথমে ভীষণ শীত অনুভব করে এবং কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে। এইসময় রোগীর বমি বমি ভাব অনুভূত হয়। এই অবস্থা প্রায় এক ঘণ্টা স্থায়ী হয়।

(খ) উত্তাপ অবস্থা :

শীতাবস্থার পরেই শরীরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। তাপমাত্রা 106° সেলসিয়াস পর্যন্ত ওঠে। রোগীর জ্বরের সঙ্গে মাথার যন্ত্রণা, গা, হাত ও পায়ের ব্যাথা অনুভূত হয়। ভুল বকতে থাকে। এই অবস্থা 4-6 ঘণ্টা পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

(গ) ঘর্ম দশা :

এই পর্যায়ে রোগীর দেহের তাপমাত্রা ঘাম নিঃসরণের মাধ্যমে দ্রুত নেমে আসে। আক্রান্ত ব্যক্তি ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে।

এ ছাড়া এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির যেসমস্ত ক্ষতি সাধন হয় সেগুলি হল—

(১) প্রচুর পরিমাণে লোহিত রক্তকণিকা নষ্ট হওয়ায় অ্যানিমিয়া বা রক্তাল্পতার সৃষ্টি হয়।

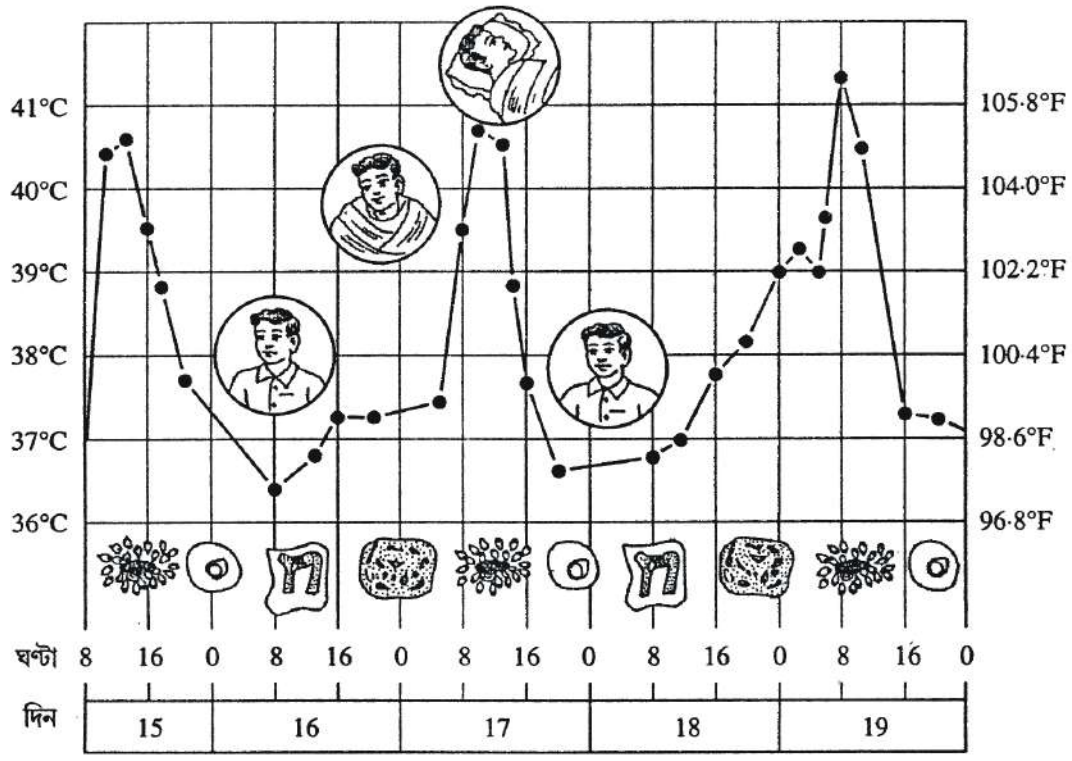

জ্বরের ওঠা-নামার সম্পর্ক

(২) হিমোলাইটিক জন্ডিস দেখা দেয়।

(৩) প্লীহা ও যকৃৎ আকারে বৃদ্ধি পায় এবং হেপাটোস্প্লেনোমেগালি হয়।

(৪) মাত্রাতিরিক্ত হিমোলাইসিসের ফলে পিত্তবমি হয়।

4.2.4.7 নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা (Control measures)

ম্যালেরিয়া রোগ থেকে অব্যাহতি পেতে গেলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাসমূহ অবলম্বন করতে হবে—

চিকিৎসা ব্যবস্থা (Treatment) :

(১) কাঁপুনি, শিরঃপীড়া, বমি ইত্যাদি উপসর্গ সমেত দেহের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে অবিলম্বে রক্ত পরীক্ষা করে ম্যালেরিয়া হয়েছে কি না সুনিশ্চিত করা এবং চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী

ক্লোরোকুইন, অ্যামাইডোকুইন, প্রাইমাকুইন, পাইরিমেথামাইন ইত্যাদি ওষুধ ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য নিয়মমাফিক সেবন করতে হবে।

(২) রোগমুক্ত হওয়ার ছয় মাস পরে আবার ম্যালেরিয়ার ওষুধ সেবন করতে হয় কারণ যকৃতের মধ্যে ম্যালেরিয়া রোগের পরজীবী সুপ্ত অবস্থায় অনেকদিন পর্যন্ত থাকতে পারে।

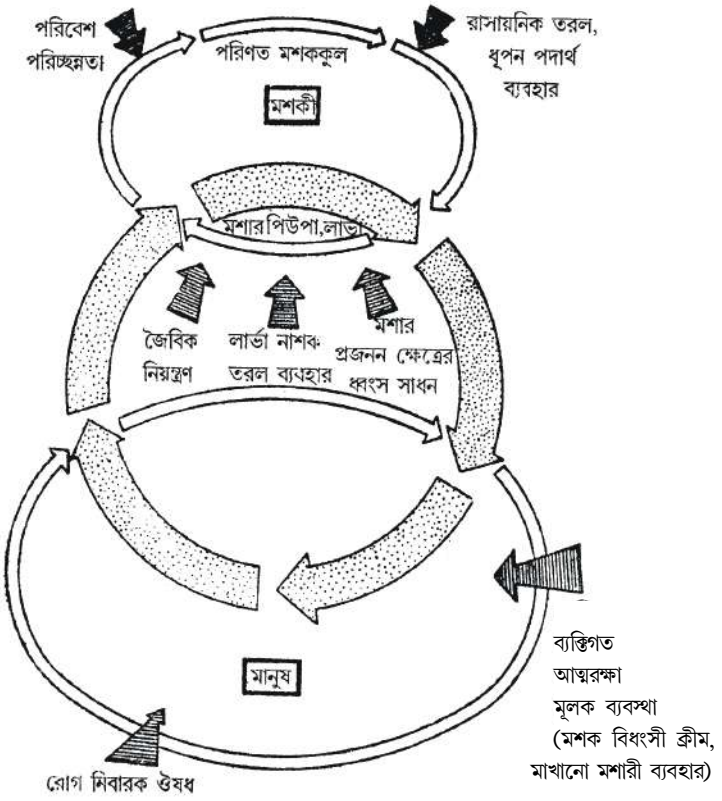

চিত্র 4.25 ম্যালেরিয়া রোগের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাসমূহ এবং ম্যালেরিয়া চক্র
(মধ্যের বৃত্তটি প্লাজমোডিয়ামের জীবনচক্র নির্দেশক)

(খ) নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা (Preventive measures) :

(১) অ্যানোফিলিস মশার ধ্বংস সাধন :

DDT, BHC, ইথাইল প্যারাথিয়ন, ম্যালাথিয়ন, ডায়েলড্রিন ইত্যাদি নির্দিষ্ট পরিমাণে স্প্রে করে পূর্ণাঙ্গ মশার বিনাশ করা হয়। কার্বন ডাইসালফাইড, সালফার ডাই অক্সাইড, মিথাইল ব্রোমাইড ইত্যাদি রাসায়নিক পদার্থের বাষ্পস্নানে পরিণত মশার নিধন হয়।

(২) যে সকল জলাশয় মশার প্রজনন ক্ষেত্ররূপে চিহ্নিত, সেসব স্থানে কেরোসিন, পেট্রোলিয়াম, কীটনাশক রাসায়নিক পদার্থ ইত্যাদি তেল সহযোগে প্রয়োগ করে মশার ডিম, লার্ভা ও পিউপা ধ্বংস করা হয়।

(৩) বাড়িতে চৌবাচ্চার জল নিয়মমাফিক ফেলে দেওয়া এবং বাড়ির চারপাশে জল জমার মতো ভাঙা কলসি টায়ার ইত্যাদি না রাখা অবশ্যই প্রয়োজন।

(৪) নালা-নর্দমায় নিয়মিত জল নিকাশের ব্যবস্থা করলে মশার পিউপা এবং লার্ভা দশা বেঁচে থাকতে পারে না।

(৫) কয়েক প্রকার লার্ভাভুক মাছ যথা গাম্বুসিয়া, গাপ্পি, মশার লার্ভা খেয়ে মশার সংখ্যা কমায়।

4.2.5 অ্যাসকারিস লুম্ব্রিকয়ডিস *(Ascaris lumbricoides)*

অ্যাসকারিস লুম্ব্রিকয়ডিস মানুষের অন্ত্রে বসবাসকারী বৃহৎ একটি বড় মাপের গোলকৃমি। এই পরজীবীটি পোষকের প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের পুষ্টিতে বিঘ্ন ঘটায়। অনুন্নত দেশে অ্যাসকারিসের সংক্রমণ অত্যধিক এবং পরিণত মানুষের চেয়ে শিশুরাই এই পরজীবী দ্বারা বেশি আক্রান্ত হয়। এই পরজীবীর একমাত্র পোষক হল মানুষ এবং এদের জীবনচক্র সম্পাদনের জন্য অন্য কোনও অন্তর্বর্তী পোষকের (Intermediate host) প্রয়োজন হয় না। অন্ত্রে এই পরজীবীর উপস্থিতিতে পেটব্যাথা, হজমে গোলযোগ, খিদের অভাব, বমি বমি ভাব, জ্বর, হাঁপানি, রক্তাল্পতা, আমবাত ইত্যাদি উপসর্গ প্রকাশ পায়। এই পরজীবীর সংক্রমণ কাঁচা বা অসিদ্ধ শাকসব্জি ভক্ষণ, অপরিস্রুত জল পানের মাধ্যমে ঘটে থাকে। এই সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করতে প্রতিটি মানুষের সর্বপ্রথমে স্বাস্থ্যবিধি সম্বন্ধে সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

4.2.5.1 প্রাণীজগতে অবস্থান (Systematic position)

পর্ব — নিমাটোডা
শ্রেণি — ফাসমিডা
বর্গ — র‍্যাবডিটয়ডিয়া
গণ — অ্যাসকারিস (Ascaris)
প্রজাতি — লুম্ব্রিকয়ডিস (Lumbricoides)

4.2.5.2 ভৌগোলিক বিস্তার (Geographical distribution)

পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই অ্যাসকারিসের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রধানত ভারতবর্ষ, চীন, ফিলিপাইন, কোরিয়া, প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে এদের প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য করা যায়। বিশেষত উষ্ণ অঞ্চলই এদের বিস্তারের পক্ষে অধিক অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে।

4.2.5.3 বাসস্থান (Habitat)

অ্যাসকারিস মানুষের দেহের ক্ষুদ্রান্ত্রের জেজুনামে অন্তঃপরজীবীরূপে বসবাস করে। এরা জীবনচক্রের প্রথম পর্যায়ে পোষক দেহের অন্ত্র থেকে যকৃৎ এবং হৃৎপিণ্ডের মাধ্যমে ফুসফুসের দিকে ভ্রমণ করে।

4.2.5.4 অঙ্গসংস্থান (Morphology)

পূর্ণাঙ্গ অ্যাসকারিসের দেহ লম্বা ও গোলাকার। জীবিত অবস্থায় দেহের রং হাল্কা গোলাপী বর্ণের

হয়। অ্যাসকারিসের দেহ কিউটিকল্ নির্মিত আবরণী দ্বারা আবৃত এবং এদের দেহগহ্বরটি ভ্রান্ত দেহগহ্বর (Pseudocoel)। এদের খাদ্যনালী সরল, অনুন্নত এবং পরিপাক গ্রন্থিবিহীন। অ্যাসকারিসের যৌনদ্বিরুপতা দেখা যায়। স্ত্রী অ্যাসকারিস পুরুষের তুলনায় দীর্ঘ। নিম্নের সারণিতে পুরুষ ও স্ত্রী অ্যাসকারিসের পার্থক্য দেওয়া হল।

সারণী : স্ত্রী ও পুরুষ অ্যাসকারিসের পার্থক্য :

স্ত্রী	পুরুষ
১. স্ত্রী অ্যাসকারিসের দেহ দৈর্ঘ্যে প্রায় ৪০ সেমি এবং প্রস্থে ২-৪ মি-মি হয়।	১. পুরুষ অ্যাসকারিসের দেহ দৈর্ঘ্যে ৩০ সেমি এবং প্রস্থে ২-৩ মি-মি হয়।
২. দেহের শেষপ্রান্ত ভোঁতা।	২. দেহের শেষপ্রান্ত সূঁচালো ও বক্র।
৩. দেহের শেষপ্রান্তের দিকে ক্লোয়েকা ছিদ্র থাকে না, পরিবর্তে পায়ুছিদ্র থাকে।	৩. দেহের শেষপ্রান্তের দিকে ক্লোয়েকা ছিদ্র থাকে।
৪. পায়ুতে কোনো পিনিয়াল সিটি থাকে না।	৪. ক্লোয়েকা থেকে একজোড়া কাইটিন নির্মিত বাঁকানো পিনিয়াল সিটি বের হয়।
৫. স্ত্রী জননছিদ্রের কাছে ভালভার ওয়েস্ট (Vulvar waste) থাকে।	৫. ভালভার ওয়েস্ট থাকে না।

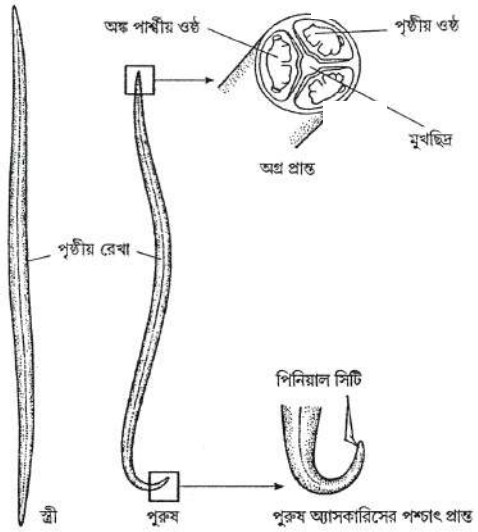

চিত্র : 4.26 অ্যাসকারিসের বহির্গঠন

অ্যাসকারিসের মুখছিদ্রটি তিনটি ওষ্ঠ দ্বারা পরিবেষ্টিত। প্রতিটি ওষ্ঠে সংবেদনশীল প্যাপিলা থাকে। পুরুষ অ্যাসকারিসের কোনো স্বতন্ত্র জনন ছিদ্র নেই। পুং জননানালী অবসারণীতে উন্মুক্ত হয়। পুরুষ অ্যাসকারিসের অবসারণী ছিদ্র থেকে একজোড়া ছুঁচালো, বাঁকানো কাইটিন নির্মিত প্রবর্ধক নির্গত হয়। একে পিনিয়াল সিটি বলে। সঙ্গমকালে পুরুষ অ্যাসকারিসের অবসারণী ছিদ্র থেকে শুক্রাণু স্ত্রী জননছিদ্রে স্থানান্তরে পিনিয়াল সিটি সাহায্য করে (চিত্র 4.26)।

4.2.5.5 জীবনচক্র (Life cycle)

মানুষ হল অ্যাসকারিসের একমাত্র নির্দিষ্ট পোষক এবং এর জীবনচক্র এই একটিমাত্র পোষকের দেহে সম্পন্ন হয়। পূর্ণাঙ্গ স্ত্রী ও পুরুষ অ্যাসকারিস প্রজননের জন্য মানুষের খাদ্যনালীতে সঙ্গমে মিলিত হয়। এই সময় পুরুষ অ্যাসকারিসের শুক্রাণুগুলি স্ত্রী জননছিদ্রের মধ্য দিয়ে যোনিপথে জরায়ুতে প্রবেশ করে। জরায়ুর মধ্যেই ডিম্বাশয় থেকে নির্গত ডিম্বাণু ও শুক্রাণু মিলিত হয়ে নিষিক্ত ডিম গঠন করে।

মাটিতে ডিমের পরিস্ফুরণ :

প্রথম পর্যায়— অ্যাসকারিসের নিষিক্ত ডিম্বাণুগুলি মলের সঙ্গে নির্গত হয় এবং বাইরের পরিবেশের উষ্ণতা, আর্দ্রতা এবং অক্সিজেনের প্রভাবে 10-14 দিনের মধ্যে ডিম্বাণু খোলকের ভিতরে জাইগোটের পরিস্ফুরণের ফলে ক্ষুদ্রাকৃতির প্রথম দশার র‍্যাবডিটিফর্ম লার্ভার সৃষ্টি হয়। (চিত্র 4.27)

দ্বিতীয় পর্যায়— পরবর্তী সাত দিনের মধ্যে প্রথম দশার লার্ভা দ্বিতীয় র‍্যাব্‌ডিটিফর্ম (rhabditiform) লার্ভায় পরিণত হয় এবং খোলকের মধ্যেই লার্ভার নির্মোচন ঘটে। এই দশা মানবদেহে সংক্রামক দশারূপে পরিচিত। এই সংক্রামক লার্ভার পরিস্ফুরণ মানবদেহের অভ্যন্তরে ঘটে। জমিতে বা তার আশেপাশে আক্রান্ত মানুষ মলত্যাগ করলে অথবা অন্যভাবে শাকসব্জি, জল ও খাদ্যে এই পরজীবীর ডিম সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। এরূপ সংক্রামিত শাকসব্জি অপরিষ্কার অবস্থায় গ্রহণ করলে অথবা ময়লা আঙুল মুখে দিলে পরজীবীর ডিম সরাসরি অন্ত্রে প্রবেশ করে।

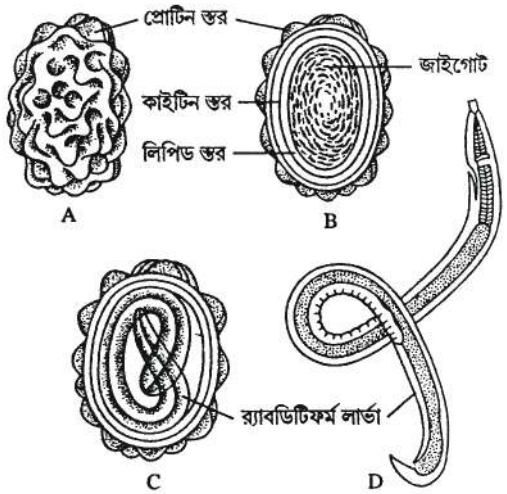

চিত্র 4.27 : অ্যাসকারিসের পরিস্ফুরণের বিভিন্ন দশা ; A -ডিম্বক, B-ডিমের ছেদ, C-লার্ভাসহ ডিম্বক, D-র‍্যাবডিটিফর্ম লার্ভা

মানুষের অন্ত্রে লার্ভা নির্গমন : অ্যাসকারিসের ডিম খাদ্যনালীর মাধ্যমে পাকস্থলী থেকে ডুওডেনাম ও ক্ষুদ্রান্ত্রে এসে পৌঁছায়। ক্ষুদ্রান্ত্রে পাচক রসের প্রভাবে ডিমের খোলক দ্রবীভূত হয়ে

যে লার্ভা নির্গত হয় তাকে **র‍্যাব্‌ডিটিফর্ম** লার্ভা বলে। এই সদ্য নির্গত লার্ভাটি খুব সরু ও প্যাঁচানো হয় (চিত্র 4.27)।

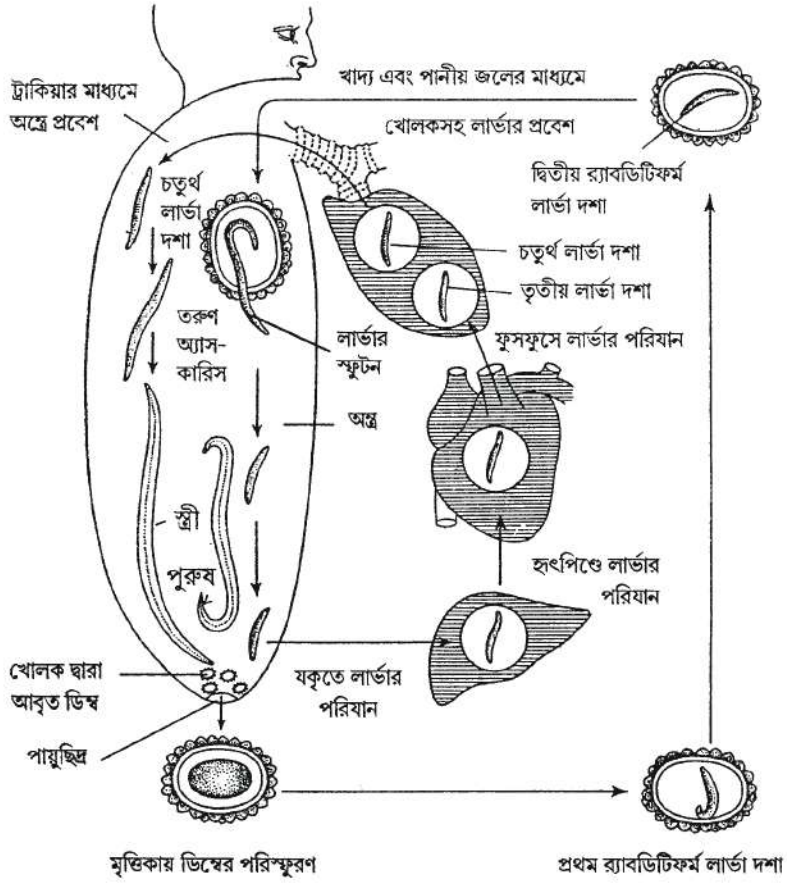

চিত্র 4.28 অ্যাসকারিসের জীবনচক্রে মানুষের দেহে লার্ভার পরিযান

লার্ভার পরিযান : এই সদ্য নির্গত দ্বিতীয় দশার র‍্যাব্‌ডিটিফর্ম লার্ভা ক্ষুদ্রান্ত্রের মিউকাস পর্দা ভেদ করে রক্তজালকে প্রবেশ করে এবং পোর্টাল সংবহনের মাধ্যমে যকৃতে পৌঁছায়। যকৃতে কিছুদিন থাকার পর যকৃৎ থেকে পোস্টক্যাভাল শিরার মধ্য দিয়ে হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ প্রকোষ্ঠে পৌঁছায়। হৃৎপিণ্ড থেকে রক্তের সঙ্গে সারা দেহে কয়েকবার ঘুরে অবশেষে এই লার্ভাগুলি পালমোনারি ধমনীর মাধ্যমে ফুসফুসে আসে। এই স্থানে লার্ভা দ্বিতীয়বার খোলস বদলায় এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে তৃতীয় দশার র‍্যাব্‌ডিটিফর্ম লার্ভায় পরিণত হয় (চিত্র 4.28)। সংক্রমণের দশদিনের মধ্যে ফুসফুসের বায়ুথলি বা অ্যালভিওলাইতে খোলস ত্যাগ করে চতুর্থ দশার র‍্যাব্‌ডিটিফর্ম লার্ভায় পরিণত হয়। চতুর্থ দশার র‍্যাবডিটিফর্ম লার্ভা ফুসফুসের অ্যালভিওলাই ত্যাগ করে ব্রঙ্কাস, ট্রাকিয়া, ল্যারিংক্স, এপিগ্লটিস হয়ে গলবিল ও গ্রাসনালীতে প্রবেশ

করে। গ্রাসনালীর মাধ্যমে র‍্যাবডিটিফর্ম লার্ভা পুনরায় পাকস্থলীতে ও ক্ষুদ্রান্ত্রে পৌঁছায়। চতুর্থ দশার র‍্যাবডিটিফর্ম লার্ভা ক্ষুদ্রান্ত্রে শেষবার খোলস ত্যাগ করে পঞ্চম দশার র‍্যাবডিটিফর্ম লার্ভায় পরিণত হয়। মানুষের দেহে সংক্রমণের 60-65 দিনের মধ্যে এগুলি ক্ষুদ্রান্ত্রে জননক্ষমতা ও পরিপূর্ণতা লাভ করে (চিত্র 4.29)।

যৌন পরিণতি ও ডিম উৎপাদন— মানুষের ক্ষুদ্রান্ত্রে পূর্ণাঙ্গ অ্যাসকারিস যৌন পরিণতি লাভ করে এবং পূর্ণাঙ্গ স্ত্রী অ্যাসকারিস মানুষকে সংক্রমণ করার দুমাসের মধ্যে ডিম উৎপাদন করে। এই ডিম মানুষের মলের সঙ্গে পরিবেশে নির্গত হয়ে যায় (চিত্র 4.28)।

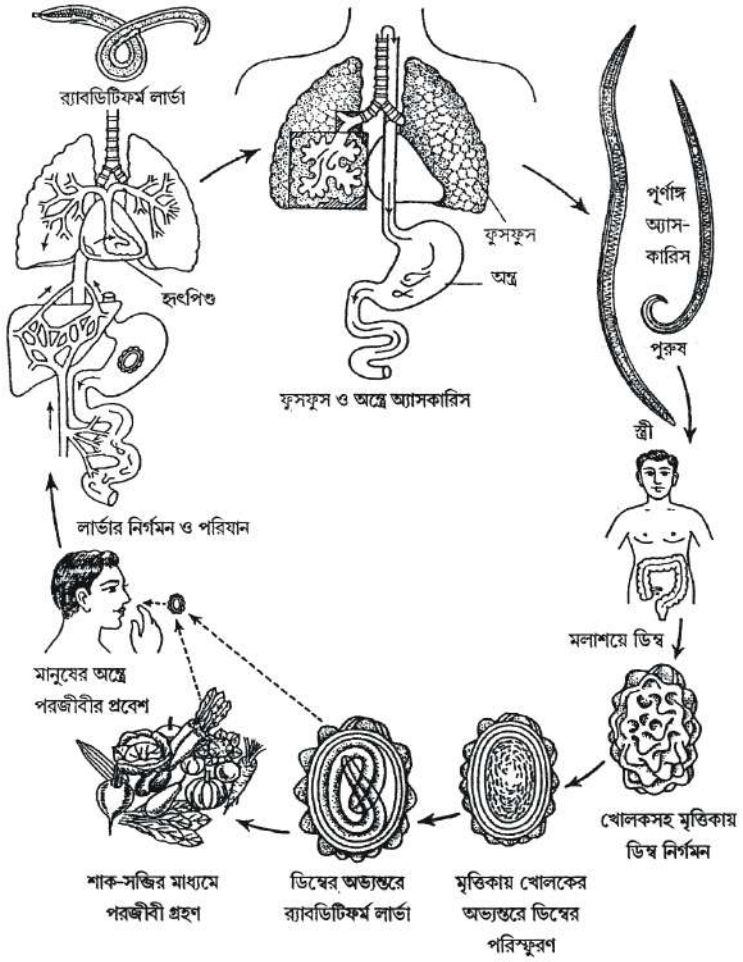

চিত্র 4.29 অ্যাসকারিসের জীবনচক্র

4.2.5.6 রোগজনিত লক্ষণ (Pathogenecity)

মানুষের দেহে অ্যাসকারিসের সংক্রমণের ফলে সাধারণভাবে অ্যাসকারিয়েসিস রোগের সৃষ্টি হয়।
পূর্ণাঙ্গ অ্যাসকারিস থাকার ফল : পরিণত অ্যাসকারিস মানবদেহে দুভাবে ক্ষতি করে—

(১) পাকস্থলী ও ক্ষুদ্রান্ত্রে থাকাকালীন কার্যকলাপ—

পূর্ণাঙ্গ অ্যাসকারিস পোষকের অর্ধ বা পূর্ণ পাচিত খাদ্যরস গ্রহণ করে ফলে পোষক প্রাণীর পুষ্টিতে ব্যাঘাত ঘটে। অ্যাসকারিসের সংখ্যাধিক্য ঘটলে পোষক প্রাণী বিশেষত শিশুরা অপুষ্টিজনিত রোগে ভোগে।

অ্যাসকারিস অনেক সময় অন্ত্রের প্রাকারে ক্ষত সৃষ্টি করে এবং অ্যাসকারিসের দেহ থেকে নির্গত অ্যাসকারিস অধিবিষ ক্ষতের রক্তে বাহিত হয়ে পোষকের দেহে নানা প্রকার স্নায়ুঘটিত রোগ সৃষ্টি করে। জ্বর, চক্ষুপীড়া, হাঁপানি, অনিদ্রা, প্রলাপ বকা, গভীর নিদ্রাচ্ছন্ন ভাব, স্নায়বিক দৌর্বল্য, খিঁচুনি প্রভৃতি রোগ সৃষ্টি হয়। অধিক সংখ্যক পরজীবীর সংক্রমণে ক্ষুদ্রান্ত্রের গহ্বর সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে পোষক প্রাণীর মৃত্যুও ঘটতে পারে।

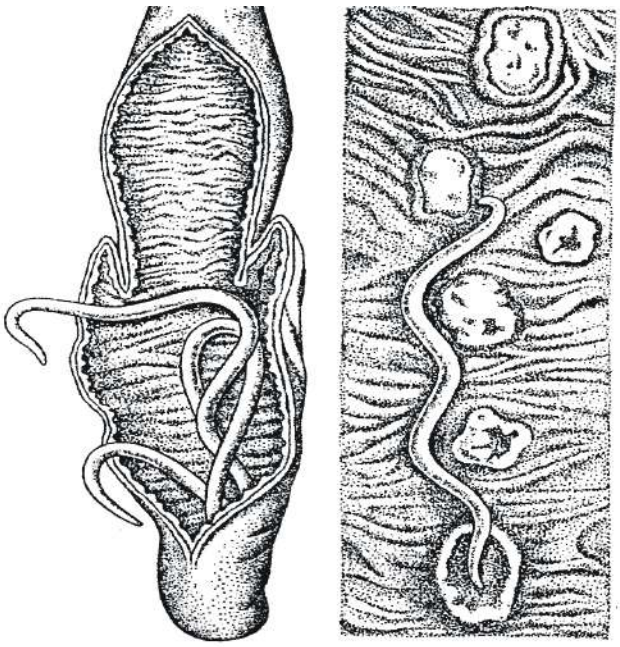

চিত্র 4.30 মানুষের অন্ত্রে অ্যাসকারিসের অবস্থানজনিত অবস্থা : A-অন্ত্রে অবস্থানরত অ্যাসকারিস, B-অন্ত্রে ক্ষতের মধ্যে প্রবেশের চেষ্টা

(২) দেহের অভ্যন্তরীণ যন্ত্রসমূহে পরিভ্রমণ কালে কার্যকলাপ—

পোষক প্রাণীর দেহযন্ত্র পরিযানকালে অ্যাসকারিস কখনো কখনো মারাত্মক ক্ষতি করে (চিত্র 4.28)। ঘুমন্ত অবস্থায় শ্বাসনালীতে প্রবেশ করলে পোষকের শ্বাসবন্ধ হয়ে মৃত্যু হয়। অনেক সময় অ্যাসকারিস অ্যাপেনডিক্সে প্রবেশের ফলে অ্যাপেনডিসাইটিস সৃষ্টি করে। পিত্তনালীতে প্রবেশ করে অবস্ট্রাক্টিভ জন্ডিস সৃষ্টি করে।

(৩) **লার্ভা সংক্রমণের ফল :** লার্ভা অন্ত্রের প্রাকারে ক্ষতের সৃষ্টি করে। লার্ভা ফুসফুসীয় জালক ভেদ করে অ্যালভিওলাইতে প্রবেশের সময় রক্তক্ষরণ হয়। এর ফলে জ্বর, কাশি, লোফ্লার্স নিউমোনিয়া, ডিসপ্নিয়া প্রভৃতি রোগের সৃষ্টি হয়। অধিকাংশ লার্ভা প্লীহা, যকৃৎ, লসিকা গ্রন্থি, মস্তিষ্ক প্রভৃতি স্থানে অবস্থান কালে ব্যাথার সৃষ্টি হয়। এইসব অঙ্গের যথেষ্ট ক্ষতি হয়।

4.2.5.7 নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি (Control measures)

রোগপ্রতিরোধী ব্যবস্থা (Preventive measures) :

(১) শাকসব্জি, ফলমূল ভালোভাবে না ধুয়ে অথবা সুসিদ্ধ না করে খাওয়া উচিত নয়।

(২) বর্ষাকালে সংক্রমণ বেশি হয় বলে সেইসময় পানীয় জল ফুটিয়ে পান করা উচিত।

(৩) খাদ্যগ্রহণের আগে ভালোভাবে হাত ধোওয়া এবং নিয়মিত নখ পরিষ্কার রাখা প্রয়োজন।

(৪) শিশুদের স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন।

চিকিৎসাব্যবস্থা (Treatment) :

(১) অ্যাসকারিসকে নির্মূল করার জন্য পিপারাজিন সল্ট (হাইড্রেট, ফসফেট) ব্যবহার করা হয়।

(২) চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী টেট্রাক্লোরো ইথিলিন ও চিনোপোডিয়াম অয়েলের মিশ্রণ, হেট্রাজান, পাইরানটেল, মেবেনডাজোল, অ্যালবেনডাজোল, বিফেনিয়াম প্রভৃতি ওষুধ প্রয়োগে অ্যাসকারিসের নিয়ন্ত্রণ সম্ভব।

4.2.6 অ্যাঙ্কাইলোস্টোমা ডুওডিনেল *(Ancylostoma duodenale)*

অ্যাঙ্কাইলোস্টোমা ডুওডিনেল একটি নিমাটোড পরজীবী। এটি স্থানীয়ভাবে হুক্ওয়ার্ম নামে পরিচিত এবং মানুষের দেহে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রচলিত একটি রোগ সৃষ্টি করে। এই কৃমির সংক্রমণে মানুষের খুব তাড়াতাড়ি অ্যানিমিয়া সৃষ্টি হয় এবং কর্মদক্ষতা কমিয়ে দেয়। অ্যাঙ্কাইলোস্টোমা কথাটির অর্থ হুকযুক্ত মুখ (Greek : Ancylos=hooked; stoma=mouth)। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় অ্যাঙ্কাইলোস্টোমা সংক্রমণ দেখা যায়। এই পরজীবীর সংক্রমণে অ্যাঙ্কাইলোস্টোমিওসিস, গ্রাউন্ড ইচ্, লোফ্লারস্ সিন্ড্রোম, অ্যানিমিয়া প্রভৃতি রোগের উপসর্গ দেখা দেয়।

4.2.6.1 প্রাণী জগতে অবস্থান (Systematic position)

পর্ব — নিমাটোডা

শ্রেণি — নিমাটোডা

বর্গ — স্ট্রংগাইলিডা

গণ — অ্যাঙ্কাইলোস্টোমা (Ancylostoma)

প্রজাতি — ডুওডিনেল (duodenale)

4.2.6.2 ভৌগোলিক বিস্তার (Geographical distribution)

অ্যাঙ্কাইলোস্টোমিয়াসিসের প্রকোপ গ্রীষ্মমণ্ডলে সবচেয়ে বেশি। ইউরোপ, উত্তর আফ্রিকা, পশ্চিম এশিয়া, দক্ষিণ চীন, জাপান এবং শ্রীলঙ্কায় এই রোগের আধিপত্য সর্বাধিক। ভারতে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাবে এই রোগের প্রকোপ দেখা যায়।

4.2.6.3 বাসস্থান (Habitat)

পূর্ণাঙ্গ অ্যাঙ্কাইলোস্টোমা মানুষের ক্ষুদ্রান্ত্রের বিশেষত জেজুনামে অবস্থান করে। তবে মাঝে মাঝে ডুওডেনামেও এদের দেখা যায়।

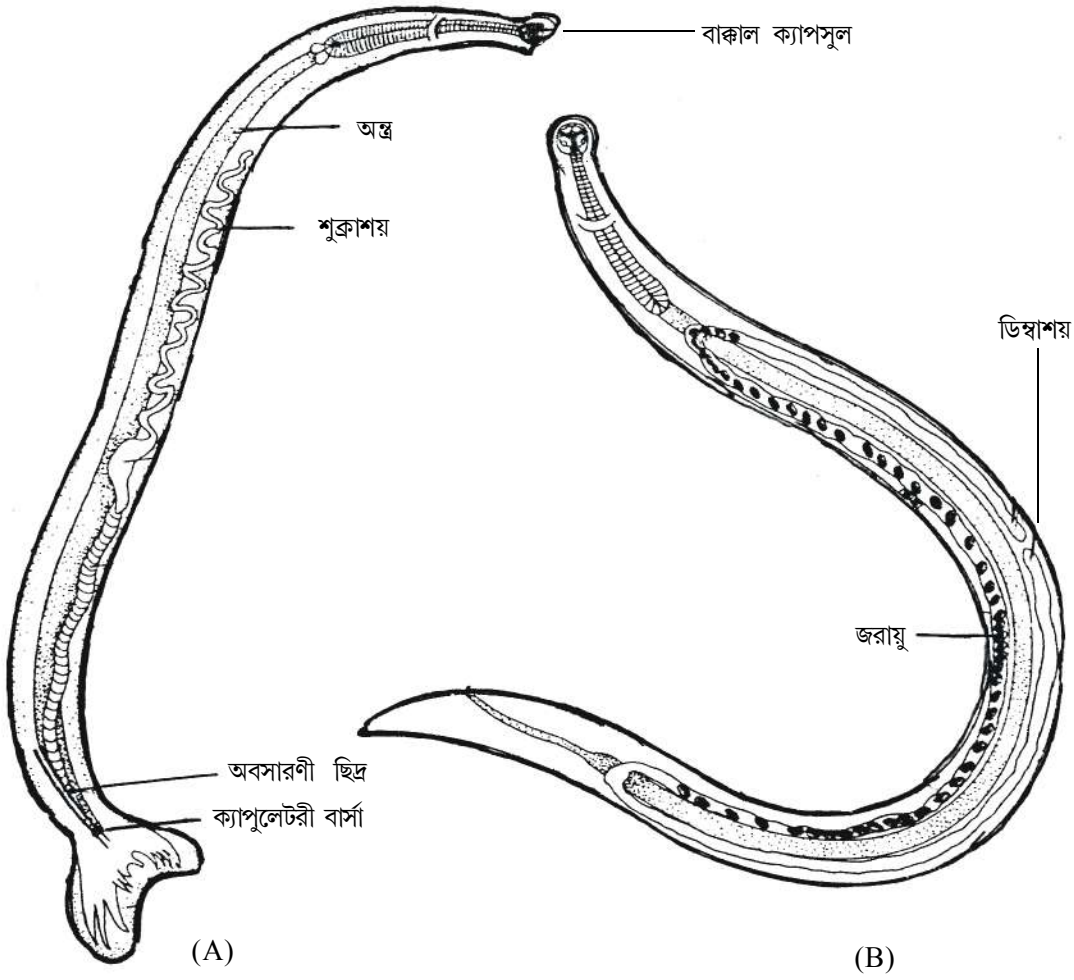

চিত্র 4.31 পূর্ণাঙ্গ অ্যাঙ্কাইলোস্টোমা ডুওডিনেল ; A-পুরুষ, B-স্ত্রী

4.2.6.4 অঙ্গসংস্থান (Morphology)

পূর্ণাঙ্গ পরজীবী— পূর্ণাঙ্গ অ্যাঙ্কাইলোস্টোমা হাল্‌কা গোলাপি অথবা ধূসর সাদা রঙের হয়। যখন পোষক দেহ থেকে রক্ত শোষণ করে তখন গাঢ় বাদামি রঙের হয়।

স্ত্রী অ্যাঙ্কাইলোস্টোমা দৈর্ঘ্যে প্রায় 15 মি-মি এবং পুরুষ অ্যাঙ্কাইলোস্টোমা দৈর্ঘ্যে 10 মি-মি ; মুখগহ্বর খুব বড়ো এবং বাক্কাল ক্যাপসুলের অঙ্কীয় তলে চারটি ও পৃষ্ঠীয় তলে দুটি করে দাঁত থাকে। (চিত্র 4.31)। পুরুষ অ্যাঙ্কাইলোস্টোমার পশ্চাৎ অংশ প্রসারিত হয়ে আঙুলের মতো প্রবর্ধক বা রশ্মি পুষ্ট কপুলেটরি বার্সা গঠন করে। জনন ছিদ্র ও অবসারণী ছিদ্র এই কপুলেটরি বার্সার মধ্য দিয়ে মুক্ত হয় (চিত্র 4.31)। স্ত্রী অ্যাঙ্কাইলোস্টোমায় এই ধরনের কপুলেটরি বার্সা থাকে না এবং পশ্চাৎ অংশ লম্বা ও সূঁচোলো হয়। পুরুষ অ্যাঙ্কাইলোস্টোমায় বার্সার সঙ্গে দুটি কপুলেটরি স্পিকিউলস্ যুক্ত থাকে। স্ত্রী পরজীবীর পায়ু অঙ্কীয় তলে যুক্ত থাকে। এদের ভালভা দেহের নিম্নভাগের এক তৃতীয়াংশে মুক্ত হয়। পূর্ণাঙ্গ অ্যাঙ্কাইলোস্টোমা মানুষের ক্ষুদ্রান্ত্রে 2-7 বছর পর্যন্ত বাঁচে।

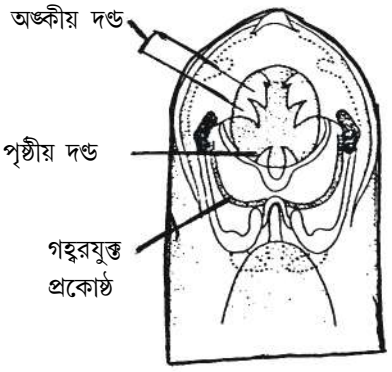

চিত্র 4.32 : অ্যাঙ্কাইলোস্টোমার বাক্কাল ক্যাপসুল

ডিম : স্ত্রী হুকওয়ার্ম দিনে 15,000 থেকে 20,000 ডিম পাড়ে এবং পোষকের মলের সঙ্গে পরিবেশে নির্গত হয়। ডিমগুলি যখন মলের সঙ্গে বাইরে নির্গত হয় তখন ডিমের মধ্যে কোষের বিভাজন শুরু হয় এবং ভ্রূণের বৃদ্ধি ঘটে। ডিম বাইরে নির্গত হওয়ার 12 ঘণ্টা পর লার্ভা নির্গত হয় যা স্যাঁতসেঁতে মাটি ও জলে ঘুরে বেড়ায়। প্রথম-স্তর লার্ভা ক্রমাগত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তর *ফিলারিফর্ম* লার্ভায় পরিণত হয় যা পায়ের ত্বক ভেদ করে শরীরে প্রবেশ করতে সক্ষম (চিত্র 4.34)।

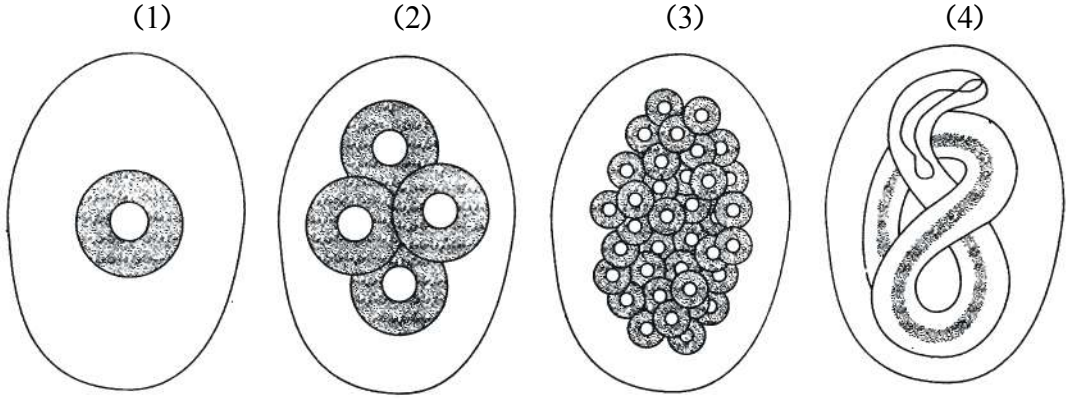

চিত্র 4.33 : ডিমের মধ্যে ফিলারিফর্ম লার্ভার পরিস্ফুরণ

4.2.6.5 জীবনচক্র (Life cycle)

অ্যাঙ্কাইলোস্টোমা ডুওডিনেলের কোনো অন্তর্বর্তী পোষক থাকে না। কেবলমাত্র মানবদেহে এদের জীবনচক্র সম্পূর্ণ হয়। মানুষ হল এদের একমাত্র পোষক। এদের জীবনচক্রের স্তরগুলি হল :

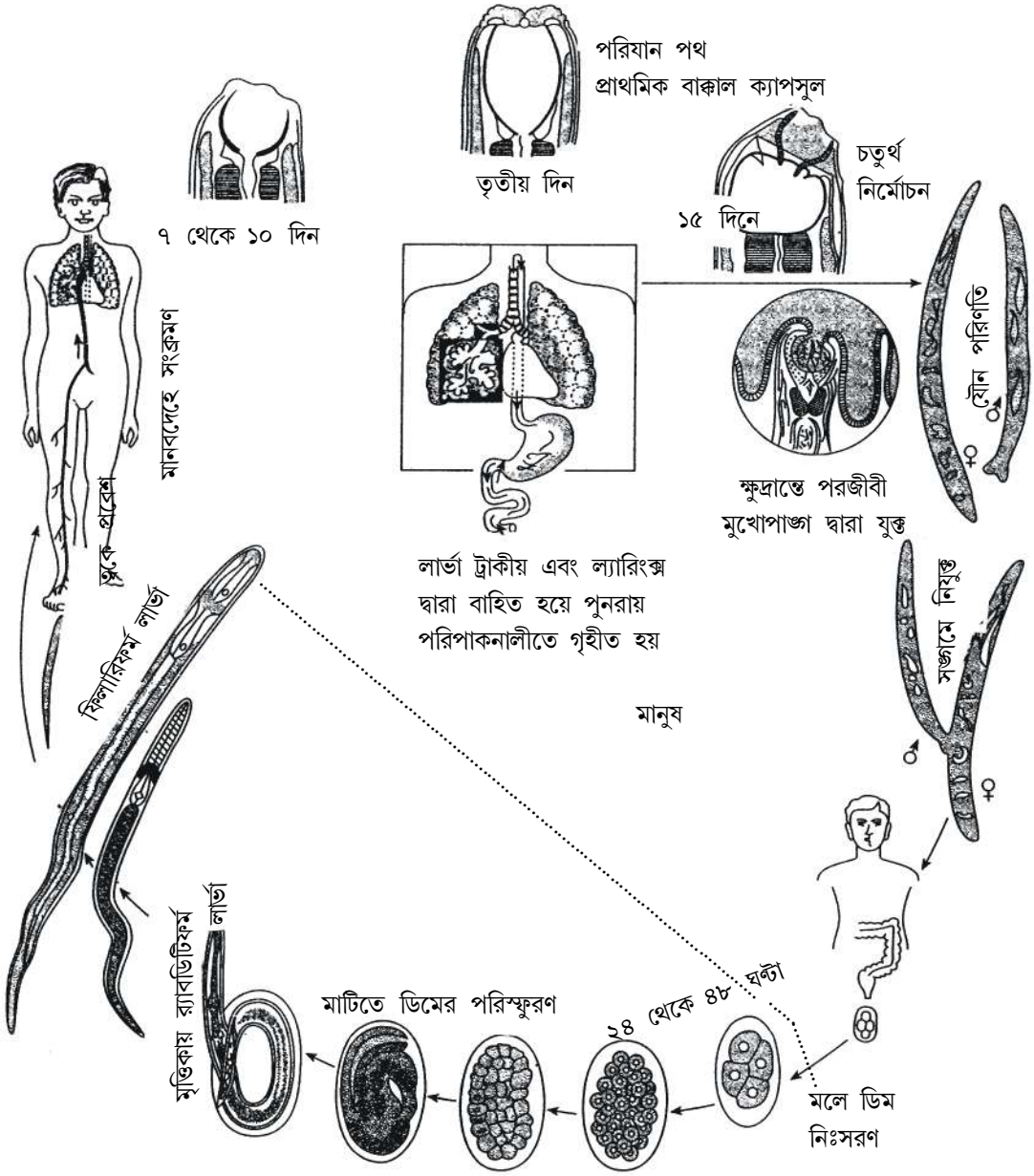

চিত্র : 4.34 অ্যাঙ্কাইলোস্টোমার জীবনচক্র

(১) মৃত্তিকায় ডিমের পরিস্ফুরণ :

পোষকের মলের মাধ্যমে ডিমগুলি মাটির সঙ্গে মেশে। ভিজে স্যাঁতসেঁতে ছায়াযুক্ত মাটিতে ডিমগুলির পরিস্ফুরণ ঘটে এবং র‍্যাবডিটিফর্ম লার্ভা তৈরি হয়। এই লার্ভাগুলি দু থেকে তিনদিন পর্যন্ত মাটির জৈব পদার্থ খেয়ে বেঁচে থাকে। এই *র‍্যাবডিটিফর্ম* লার্ভা দুবার নির্মোচনের মাধ্যমে *ফিলারিফর্ম* লার্ভায় পরিণত হয়। এই লার্ভাদশা প্রায় পাঁচ সপ্তাহ পর্যন্ত ভিজে মাটিতে বেঁচে থাকতে পারে। (চিত্র : 4.33)

(২) ফিলারিফর্ম লার্ভার নতুন পোষক দেহে প্রবেশ :

সংক্রামিত মাটিতে ফিলারিফর্ম লার্ভা দেহত্বক নির্মোচনের পর মানুষের উন্মুক্ত ত্বক, বিশেষত খালি পা, হাতের ত্বক ভেদ করে প্রবেশ করে (চিত্র : 4.34)

(৩) লার্ভার পরিযান এবং গন্তব্যস্থলে অবস্থান :

লার্ভাগুলি ত্বকের মধ্য দিয়ে যান্ত্রিকভাবে, কখনও বা সাবকিউটেনিয়াস কলাকে বিনষ্ট করে লসিকাতন্ত্রে বা উপশিরায় প্রবেশ করে। এই লার্ভাগুলি লসিকাতন্ত্র থেকে শিরা সংবহনের মাধ্যমে হৃৎপিন্ডের ডান অলিন্দ-নিলয় হয়ে ফুসফুসীয় জালকে প্রবেশ করে। এই ফুসফুসীয় জালক ভেদ করে লার্ভাগুলি বায়ুথলিতে প্রবেশ করে। সেখান থেকে ব্রঙ্কিওল হয়ে ট্রাকীয়া, ল্যারিংক্স এবং সবশেষে এপিগ্লটিস হয়ে পুনরায় ফ্যারিংক্স দিয়ে পরিপাক নালীর মধ্যে প্রবেশ করে। এই পরিযানকালে অর্থাৎ গ্রাসনালীতে প্রবেশকালে, তৃতীয়বার নির্মোচন ঘটে ফলে লার্ভাগুলি চতুর্থ দশার লার্ভায় পরিণত হয়। এই লার্ভাগুলি ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিলিতে বাক্কাল ক্যাপসুল দিয়ে আটকে থাকে। এইসময় চতুর্থবার নির্মোচন হয় এবং পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে পরিণত হয়। এই পূর্ণাঙ্গ পরজীবী ক্ষুদ্রান্ত্রের মিউকোসাতে মুখোপাঙ্গ দ্বারা আটকে থাকে এবং রক্তজালক থেকে ক্রমাগত রক্ত পান করতে থাকে।

সংক্রমণের পাঁচ সপ্তাহ পরে, পরজীবীর যৌন পরিণতি ঘটে এবং নিষেক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্ত্রী অ্যাঙ্কাইলোস্টোমা ডিম নিঃসরণ করে যা পোষকের মলের সঙ্গে পরিবেশে নির্গত হয়। এইভাবে জীবনচক্রের পুনরাবৃত্তি ঘটে (চিত্র : 4.34)

4.2.6.6 রোগজনিত লক্ষণ (Pathogenecity)

(১) গ্রাউন্ড ইচ্ (Ground itch) :

উন্মুক্ত ত্বকের যেসব স্থান দিয়ে লার্ভা প্রবেশ করে সেইসব স্থানে চুলকানি হয়ে থাকে ফলে ত্বকের ওপর রক্তাভ আবজাতীয় র‍্যাশ তৈরি হয়। এই র‍্যাশগুলি অতিরিক্ত চুলকানির ফলে ক্ষতের সৃষ্টি হয়, ফলে ব্যাক্টেরিয়া সংক্রমণের সুযোগ থেকে যায়। এই পরিস্থিতিকে 'গ্রাউন্ড ইচ্' বা 'অ্যাঙ্কাইলোস্টোমা ডার্মাটাইটিস' বলে।

(২) লোফ্‌লারস্‌ সিন্ড্রোম (Loeffler's Syndrome) :

লার্ভা যখন ফুসফুসীয় জালক ভেদ করে বায়ুথলিতে প্রবেশ করে তখন অল্প রক্তক্ষরণ হয়। তবে ব্যাপক সংক্রমণে এই অবস্থা থেকে নিউমোনাইটিসের সৃষ্টি হয়। একে *লোফ্‌লারস্‌* সিন্ড্রোম বলে।

(৩) ব্যাপক সংক্রমণে :

পূর্ণাঙ্গ কৃমির উপস্থিতিতে পেট ব্যাথা, বমি বমি ভাব, রক্ত আমাশয়, রক্তাল্পতা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

(৪) অ্যাঙ্কাইলোস্টোমা পরজীবীর দ্বারা দীর্ঘদিন সংক্রমণের ফলে অ্যানিমিয়া, দুর্বলতা দেখা দেয় এবং দৈহিক বৃদ্ধি বিলম্বিত হয়।

4.2.6.7 নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি (Control measures)

নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা (Preventive measures)

(১) উপযুক্ত নিকাশি ব্যবস্থা এবং ময়লা আবর্জনা যাতে মাটির সঙ্গে না মেশে তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।
(২) অ্যাঙ্কাইলোস্টোমা উপদ্রুত এলাকায় সবসময় জুতো ব্যবহার করা উচিত।
(৩) নিজস্ব পরিচ্ছন্নতার জ্ঞান থাকা জরুরি।

চিকিৎসামূলক ব্যবস্থা (Treatment)

অ্যাঙ্কাইলোস্টোমিওসিস রোগে ডাক্তার বাবুর পরামর্শ মতো অ্যালবেনডাজোল, মেবেন্ডাজোল, পাইরানটেল প্রভৃতি কৃমি প্রতিরোধী ওষুধ ব্যবহারে উপকার হয়।

4.2.7 ফ্যাসিওলা হেপাটিকা *(Fasciola hepatica)* বা যকৃৎ কৃমি বা লিভার ফ্লুক

চ্যাপ্টা, বৃহৎ, পেশিবহুল দেহবিশিষ্ট, চোষক সংবলিত প্রধানত ভেড়ার পিত্তনালীতে অন্তঃপরজীবীরূপে ফ্যাসিওলা হেপাটিকা বসবাস করে। ভেড়া ব্যতীত গোরু, ছাগল, ঘোড়া, গাধা, হরিণ, মহিষ ইত্যাদি গবাদি পশুর যকৃৎ ও পিত্তনালীতে যকৃৎ কৃমি থাকে। মানুষ ফ্যাসিওলা হেপাটিকা দ্বারা সাধারণত আক্রান্ত হয় না। তবে যে সকল মানুষ ভেড়ার মাংস খায় তাদের যকৃতে এদের উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যায়। এই কৃমির আক্রমণে যকৃৎ পচে গিয়ে লিভার রট রোগের সৃষ্টি হয়।

4.2.7.1 প্রাণীজগতে অবস্থান (Systematic position)

পর্ব — প্লাটিহেল্‌মিন্থিস
শ্রেণি — ট্রিমাটোডা

বর্গ — ডাইজিনিয়া
গণ — ফ্যাসিওলা (Fasciola)
প্রজাতি — হেপাটিকা (hepatica)

4.2.7.2 ভৌগোলিক বিস্তার (Geographical distribution)

পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই এই পরজীবীটির সন্ধান পাওয়া যায়। উত্তর আমেরিকায় এই পরজীবীর প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত বেশি। বিশেষত ভেড়া ও গবাদি পশুরষ বিশেষত ভেড়া চারণক্ষেত্রষ যেসব দেশে আছে সেখানে এদের বেশি পাওয়া যায়। এছাড়া দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা, কিউবা, ইউরোপ ইত্যাদি দেশে মানুষের মধ্যে এই পরজীবীর উপস্থিতি লক্ষ্ন করা যায়।

4.2.7.3 বাসস্থান (Habitat)

ফ্যাসিওলা হেপাটিকা একটি ডাইজেনেটিক পরজীবী অর্থাৎ দুটি পোষকের মাধ্যমে এদের যৌন ও অযৌন জীবনচক্র সম্পূর্ণ হয়। যকৃতের মধ্যেও পিত্তথলিতে এদের বাসস্থান। এদের মধ্যবর্তী পোষক প্রাণী হল Lymnaea নামক শামুক। লিমনিয়া শামুকের দেহাভ্যন্তরে এই পরজীবীর লার্ভাদশা বৃদ্ধি পায়।

4.2.7.4 অঙ্গসংস্থান (Morphology)

পূর্ণাঙ্গ ফ্যাসিওলা হেপাটিকা কোমল, পত্রফলকের মতো, পৃষ্ঠীয় অঙ্কীয় তল চ্যাপ্টা। অগ্রভাগ গোলাকার এবং পশ্চাদ্ ভাগ সরু ও সূঁচালো হয়। দেহটি টেগুমেন্ট দিয়ে আবৃত। দেহ সাধারণত গোলাপি বর্ণের, দেহের অগ্রভাগ ছোটো ত্রিকোণাকৃতির হয়। একে সেফালিক কোণ বা মস্তক লোব বলা হয়। মস্তক লোবের পরবর্তী অংশ হঠাৎ চওড়া হয়ে শেষ অংশ ক্রমশ সরু হয়ে গেছে। দেহের শীর্ষাংশে ও মুখছিদ্রটিকে বেষ্টন করে পেয়ালাকার খাঁজটিকে ওরাল চোষক (oral sucker) বলে। এই চোষকের চার মিলিমিটার দূরত্বে আরও একটি বড়ো আকারের অঙ্কীয় চোষক বা অ্যাসিটাবিউলাম (acetabulum) থাকে। চোষকগুলি পোষক প্রাণীর দেহের সঙ্গে আটকে থাকতে সহায়তা করে। দেহের শেষপ্রান্তে একটিমাত্র রেচনছিদ্র থাকে। প্রজনন ঋতুতে অপর একটি ছিদ্র দেহের মধ্য পৃষ্ঠ অঞ্চলে বা লরার নালীর ছিদ্র দেখা যায় (চিত্র 4.35)।

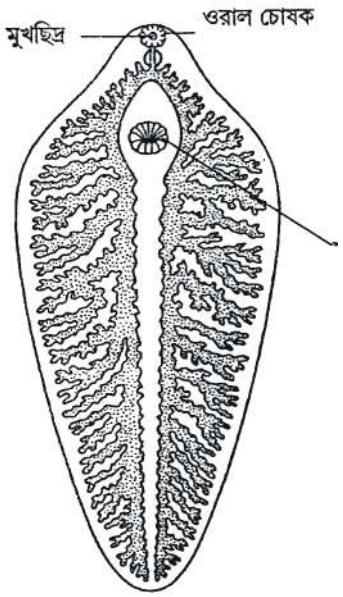

চিত্র 4.35 ফ্যাসিওলা হেপাটিকার বহির্গঠন

4.2.7.5 জীবনচক্র (Life cycle)

যকৃৎ কৃমির জীবনচক্রে প্রাথমিক বা মুখ্য পোষক হল ভেড়া, গোরু, ছাগল, হরিণ, ঘোড়া এবং গৌণ বা অন্তর্বর্তী পোষক হল জল শামুক (Lymnaea, Bulinus, Planorbis)। প্রাথমিক পোষক ভেড়ার দেহে পূর্ণাঙ্গ যকৃৎ কৃমি বাস করে এবং যৌন জনন প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়। গৌণ পোষক শামুকের মধ্যে যকৃৎ কৃমির বিভিন্ন লার্ভা দশার বৃদ্ধি ঘটে।

ফ্যাসিওলা হেপাটিকার জীবনচক্রের পর্যায়গুলি নিম্নরূপ :

মিরাসিডিয়াম→মাতৃস্পোরোসিস্ট→দুহিতা স্পোরোসিস্ট→রেডিয়া

↓

পরিপূর্ণ F. hepatica←মেটাসারকেরিয়া←সারকেরিয়া

(মেরুদণ্ডী পোষকে) (শামুকের দেহের বাইরে সংক্রমণশীল পর্যায়)

একটি যকৃৎ কৃমি এক একবারে 35,000 নিষিক্ত ডিম উৎপাদন করতে পারে।

সংগম ও নিষেক (Fertilization):

সংগম ও নিষেকের পর নিষিক্ত ডিমগুলি অপরিণত অবস্থায় পোষক প্রাণীর দেহ থেকে মলের সঙ্গে বাইরে পরিত্যক্ত হয়। সংগমকালে একটি পরজীবীর সিরাস জনন ছিদ্রের মধ্য দিয়ে দেহ থেকে বের হয়ে অপর কৃমির লরার নালীর মধ্যে প্রবেশ করে। এইভাবে শুক্রাণু একটি কৃমির দেহ থেকে অপর কৃমির ডিম্বনালীতে প্রবেশ করে এবং ডিম্বাণুগুলিকে নিষিক্ত করে। নিষিক্ত এবং খোলক দ্বারা পরিবৃত ডিম্বাণু জরায়ুতে সাময়িকভাবে সঞ্চিত থাকে এবং পরিশেষে জনন ছিদ্রের মাধ্যমে নির্গত হয়ে ভেড়ার পিত্তনালীতে আসে। পিত্তনালী থেকে ডিমগুলি ক্ষুদ্রান্ত্রে আসে এবং পোষকের মলের সঙ্গে দেহের বাইরে নির্গত হয়। পরজীবীর জরায়ুতে থাকার সময় খোলক দ্বারা আবৃত ডিমের মধ্যেই জাইগোটের পরিস্ফুরণ শুরু হয়ে যায়। পোষকের দেহের বাইরে আর্দ্র পরিবেশে ডিমগুলির দ্রুত পরিবর্তন হয় এবং দুই তিন সপ্তাহের মধ্যে খোলক ভেদ করে সিলিয়া আবৃত মিরাসিডিয়াম লার্ভা নির্গত হয়। এই লার্ভা ভিজে, জলজ জায়গায় অনেকদিন থাকতে পারে (চিত্র 4.63)।

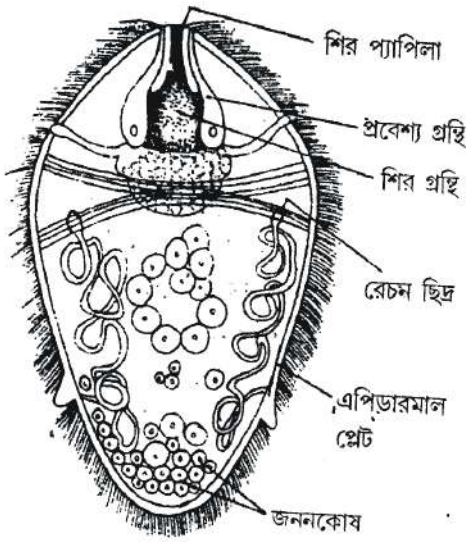

চিত্র : 4.36 ফ্যাসিওলা হেপাটিকার মিরাসিডিয়াম লার্ভা

মিরাসিডিয়াম লার্ভা (Mikracidium Larva) :

শাঙ্কবাকৃতি মিরাসিডিয়াম লার্ভার দেহ সিলিয়া দ্বারা আবৃত থাকে। দেহের অগ্রপ্রান্তে সিলিয়াবিহীন একটি উঁচু অংশ থাকে যাকে শির বা এপিক্যাল প্যাপিলা বলে। দেহের অগ্রভাগে একজোড়া শির গ্রন্থি (Cephalic gland) এবং পেনিট্রেশন গ্রন্থি থাকে যা একটি ছিদ্রের মাধ্যমে এপিক্যাল প্যাপিলায় মুক্ত হয়। এই গ্রন্থি নিঃসৃত লাইটিক উৎসেচক মিরাসিডিয়াম লার্ভাকে গৌণ পোষক শামুকের দেহে প্রবেশ করতে সাহায্য করে। নির্দিষ্ট পোষক প্রাণীর অভাবে এরা বাঁচে না। নতুন পোষক প্রাণীর কোমল কলায়, যেমন পাচক গ্রন্থিতে, মিরাসিডিয়ামের সিলিয়া পরিত্যক্ত হয় এবং আকারে বৃদ্ধি পেয়ে থলি আকৃতির স্পোরোসিস্টে রূপান্তরিত হয়। (চিত্র 4.37)।

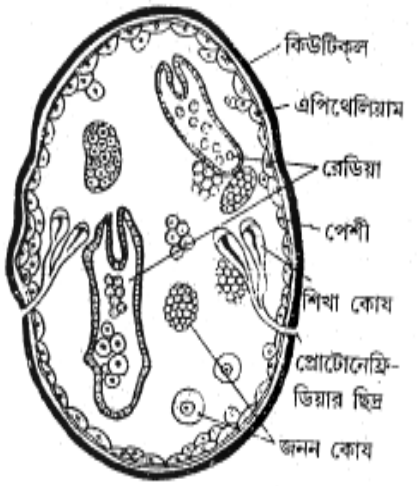

চিত্র : 4.37 স্পোরোসিস্ট লার্ভা

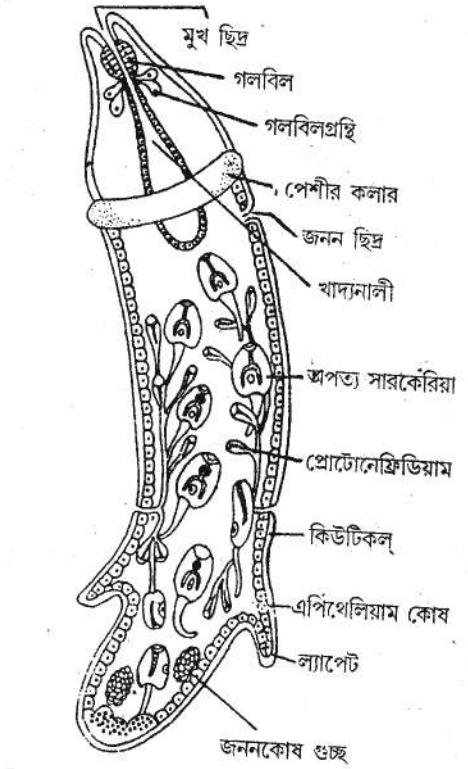

চিত্র 4.38 রেডিয়া লার্ভা

স্পোরোসিস্ট (sporocyst larva):

সিলিয়াযুক্ত আবরণ পরিত্যক্ত হয়ে লিমনিয়া শামুকে নরম কলার মধ্যে স্পোরোসিস্ট সৃষ্টি হয়। পোষকের কলা থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে স্পোরোসিস্ট বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। স্পোরোসিস্টের দেহের অভ্যন্তরে জননকোষ থাকে যার প্রত্যেকটি কোষ পার্থেনোজেনেসিস বা অপুংজনি প্রক্রিয়ায় পরবর্তী লার্ভা দশা—রেডিয়া সৃষ্টি করে। একটি স্পোরোসিস্ট চার থেকে আটটি রেডিয়া লার্ভা উৎপন্ন করে। রেডিয়া স্পোরোসিস্ট থেকে মুক্ত হয়ে পোষক প্রাণী শামুকের যকৃতে এসে পৌঁছায় (চিত্র 4.37)।

রেডিয়া (Redia larva) :

দেহ লম্বাটে ও বেলনাকার। দেহের অগ্রভাগে একটি পেশিময় কলার থাকে। এটি গমনে সাহায্য করে। দেহের পশ্চাৎ অংশে একজোড়া ক্ষুদ্র পেশিময় প্রবর্দ্ধিক থাকে। তাকে ল্যাপেট বলে (চিত্র 4.38)। গমনের সময় পোষক প্রাণীর দেহকলায় আটকে থাকতে এটি সাহায্য করে। রেডিয়ার মধ্যে জনন কোষ থাকে। গ্রীষ্মকালে

এই জননকোষগুলি থেকে দ্বিতীয় জনু রেডিয়ার সৃষ্টি হয়। শামুকের দেহাভ্যন্তরে এই লার্ভা পর্যায়গুলির পরিস্ফুরণ সম্ভবত ও প্রধানত তাপমান দ্বারা প্রভাবিত। শীতকালে রেডিয়ার জননকোষ বিভক্ত হয়ে পরবর্তী লার্ভা দশা সারকেরিয়ার সৃষ্টি করে (চিত্র 4.38)।

চিত্র 4.39 সারকেরিয়া লার্ভা

সারকেরিয়া (Cercaria larva):

প্রত্যেকটি রেডিয়া ১৪-২০টি সারকেরিয়া উৎপন্ন করে। সারকেরিয়ার দেহ চ্যাপ্টা হৃৎপিণ্ডের মতো। দেহের পশ্চাৎ অংশে সরু লম্বা লেজ থাকে। দেহের অগ্রভাগে অগ্রচোষক ও অঙ্কীয়ভাগে অঙ্কীয় চোষক বা অ্যাসিটেবুলাম থাকে। দেহপেশিস্তরের নীচে সিস্টোজেনাস গ্রন্থি থাকে যা সিস্ট গঠনে সহায়তা করে। লেজযুক্ত সারকেরিয়া লার্ভা রেডিয়ার জননছিদ্র পথে উন্মুক্ত হয়ে দুই-তিনদিন সাঁতার কেটে জলের কিনারায় কোনো জলজ উদ্ভিদের ওপর আশ্রয় নেয় (চিত্র 4.29)। এই অবস্থায় সারকেরিয়ার লেজ খসে পড়ে এবং দেহের চারপাশে সিস্ট গঠিত হয়। এই সিস্টের মধ্যে সারকেরিয়া মেটাসারকেরিয়ায় পরিণত হয়। (চিত্র 4.40)।

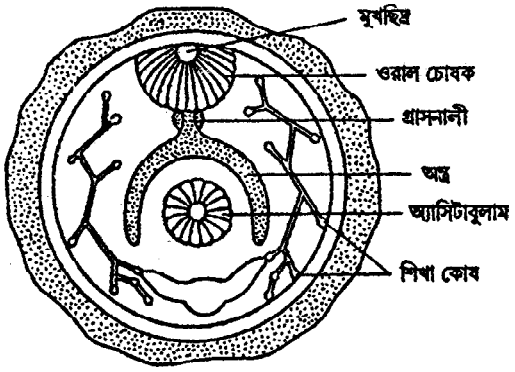

চিত্র : 4.40 ফ্যাসিওলা হিপাটিকার মেটাসারকেরিয়া লার্ভা দশা

মেটাসারকেরিয়া (Metacercaria larva) :

জলজ উদ্ভিদের বা ঘাসের পাতায় নীচের তলে অসংখ্য মেটাসারকেরিয়া লেগে থাকে। আর্দ্র স্থানে মেটাসারকেরিয়া কয়েকমাস পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে। মেটাসারকেরিয়া গোলাকার সিস্টে আবৃত থাকে (চিত্র 4.40)।

ভেড়া ও অন্যান্য গবাদি পশু যখন এই মেটাসারকেরিয়া সংক্রামিত জলজ উদ্ভিদ ও ঘাস খায় তখন অসংখ্য পরিমাণে মেটাসারকেরিয়া পৌষ্টিক নালীতে প্রবেশ করে। পৌষ্টিকনালীর পাচক রসে মেটাসারকেরিয়ার সিস্টের আবরণী জারিত হয়ে যায় এবং অসংখ্য শিশু যকৃত কৃমি মুক্ত হয়। শিশু যকৃৎকৃমি পৌষ্টিক নালীর প্রাকারভেদ করে যকৃতে পৌঁছায় এবং সেখান থেকে পিত্তনালীতে প্রবেশ করে এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। পিত্তনালীতে 11-13 সপ্তাহের মধ্যে যৌন পরিণতি লাভ করে। পোষক প্রাণী আক্রান্ত হওয়ার 3-4 মাস পর পিত্তের মাধ্যমে পোষক প্রাণীর খাদ্যনালীর বর্জ্যপদার্থের সঙ্গে পরজীবীর ডিম বাইরে আসে।

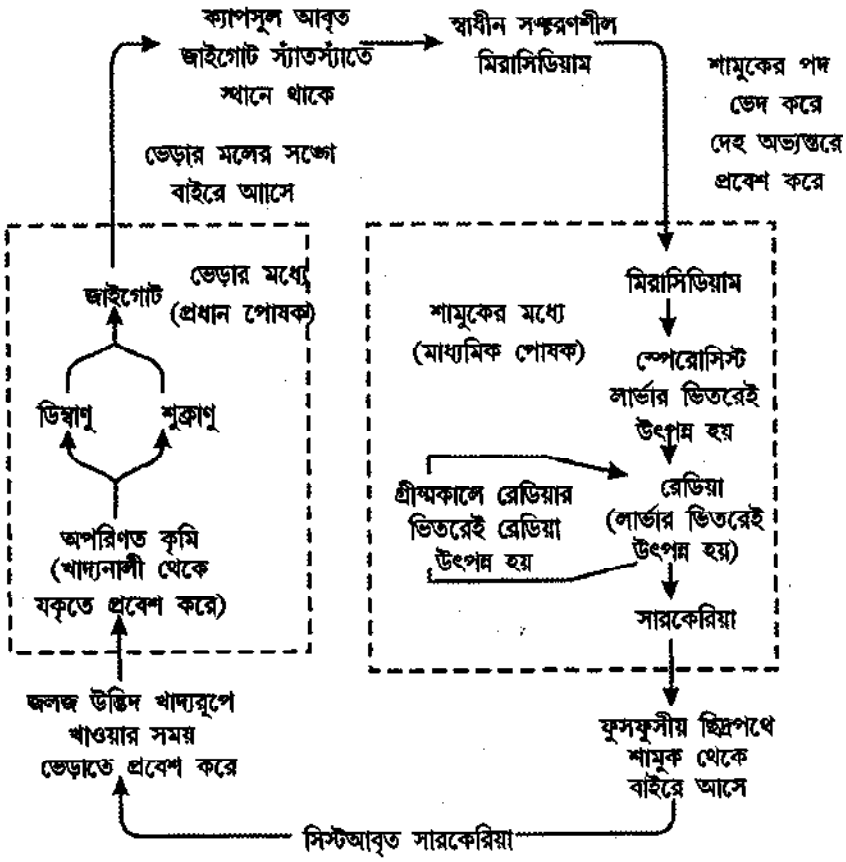

ফ্যাসিওলা হেপাটিকার জীবনচক্রের লেখরূপ

4.2.7.6 রোগজনিত লক্ষণ (Pathogenecity)

পরিণত ফ্যাসিওলা প্যারেনকাইমা কোষ ভেদ করে যকৃতের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। এই সময় ফ্যাসিওলা পোষক প্রাণীর যকৃৎ কোষ ও রক্ত ভক্ষণ করে। ক্রমে যকৃৎ কলার পচন বা Liver rot শুরু হয়। একে *যকৃৎ পচন* রোগ বলে। এই পরজীবী পিত্তনালীতে থাকাকালীন নালীতে প্রদাহ সৃষ্টি হয় ফলে পিত্তনালী বন্ধ হয়ে অবস্ট্রাক্টিভ জন্ডিস রোগের সৃষ্টি হয়। পরজীবীর লার্ভা দশা পরিযানকালে চক্ষু, মস্তিষ্ক, চর্ম এবং ফুসফুসে ক্ষতের সৃষ্টি করে। এর ফলে সংক্রামিত ভেড়া, ছাগল দুর্বল ও শীর্ণ হয়ে যায়। দেহের লোম ও ওজন কমে যায়। খাবার খেতে চায় না এবং অবশেষে মারা যায়। এই রোগে বমি ও ক্রমাগত তরল মল নিঃসরণ হয়। এছাড়া হেপাটোমেগালি, হেপাটাইটিস, অ্যানিমিয়া, ইয়োসিনোফিলিয়া প্রভৃতি রোগ দেখা দেয়।

4.2.7.7 নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি (Control measures)

(১) নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা (Preventive measures) :

(i) গৌণ পোষক শামুক ধ্বংস করে রোগ বিস্তার অনেকাংশে কমানো যায়।
(ii) মানুষের ক্ষেত্রে জলজ উদ্ভিদ, শাকসব্জি ভালো করে ধুয়ে ও সুসিদ্ধ করে খাওয়া উচিত।
(iii) সংক্রামিত ভেড়া ও মানুষের মল তাড়াতাড়ি অপসারণ করা উচিত ও যত শীঘ্র সম্ভব চিকিৎসা করাতে হবে।

(২) চিকিৎসা ব্যবস্থা (Treatment) :

ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নিয়ে এমেটিন, টেট্রাক্লোরিথিলিন, টেট্রামিসল, মেবেনডাজোল ইত্যাদি কৃমি প্রতিরোধক ওষুধ ব্যবহার করে ফ্যাসিওলিয়োসিস সারানো যায়।

4.2.8 একাইনোকক্কাস গ্রানুলোসাস *(Echinococcus granulosus)*

একাইনোকক্কাস পরজীবীটিকে পৃথিবীর সর্বত্রই দেখতে পাওয়া যায়। এটি সবচেয়ে ছোটো একটি ফিতাকৃমি। এই পরজীবীর লার্ভাদশা মানুষের দেহে হাইডটিড রোগ সৃষ্টি করে। কুকুর, নেকড়ে, শেয়াল ইত্যাদি প্রাণীর ক্ষুদ্রান্ত্রে পরিণত একাইনোকক্কাস অবস্থান করে এবং একাইনোকক্কাস এদের চূড়ান্ত পোষকরূপে ব্যবহার করে। ভেড়া, শূকর, গবাদিপশু, মানুষ এই পরজীবীর অন্তর্বর্তী পোষক (intermediate host) হিসাবে কাজ করে। এদের দেহে একাইনোকক্কাসের লার্ভা দশা বৃদ্ধি পায়। এই পরজীবীর বিভিন্ন প্রজাতি আছে যারা বিভিন্ন প্রকার রোগের সৃষ্টি করে।

নীচের সারণিতে একাইনোকক্কাসের বিভিন্ন প্রজাতি, তাদের পোষক প্রাণী এবং তাদের দ্বারা সৃষ্ট রোগের বিবরণ দেওয়া হল—

সারণী : একাইনোকক্কাসের প্রজাতি ও সৃষ্ট রোগ :

বৈশিষ্ট্য	একাইনোকক্কাস গ্রানুলোসাস	একাইনোকক্কাস মাল্টিলোকুলারিস	একাইনোকক্কাস ভোগেলি	একাইনোকক্কাস ওলিগার্থাস
রোগ	হাইডাটিড রোগ	অ্যালভিওলার বা মাল্টিলোকিউলার হাইডাটিড রোগ	পলিসিস্টিক হাইডাটিড রোগ	পলিসিস্টিক হাইডাটিড রোগ
মুখ্যপোষক	কুকুর	শিয়াল, বেড়াল	কুকুর	বেড়াল, কুকুর
অন্তর্বর্তী পোষক	ভেড়া, গবাদি পশু, ঘোড়া	ইঁদুর, ছুঁচো	ইঁদুর ভেড়া, ছাগল	লোগোমর্ফ,
অন্তবর্তী পোষকের দেহাভ্যন্তরে পোষকের অবস্থান	যকৃৎ, ফুসফুস, প্লীহা, বৃক্ক, পেশি হৃৎপিণ্ড	যকৃৎ, প্লীহা, ফুসফুস, বৃক্ক, পেশি, হৃৎপিণ্ড	যকৃৎ, ফুসফুস	চোখ, হৃৎপিণ্ড

4.2.8.1 প্রাণীজগতে অবস্থান (Systematic position)

পর্ব — প্লাটিহেল্‌মিন্থিস

শ্রেণি — সিস্টয়ডিয়া (Cestoidea)

বর্গ — সাইক্লোফাইলিডিয়া

গণ — একাইনোকক্কাস (Echinococcus)

প্রজাতি — গ্রানুলোসাস (granulosus)

4.2.8.2 ভৌগোলিক বিস্তার (Geographical distribution)

ল্যাটিন আমেরিকায় হাইডাটিড রোগের প্রাদুর্ভাব খুব বেশি। এছাড়া আরব, উত্তর আফ্রিকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশেও এই রোগের প্রকোপ দেখা যায়। সাধারণত এইসব দেশে ভেড়া ও গবাদিপশুর চাষ করা হয়। ফলে মানুষের সঙ্গে কুকুর, ভেড়া ও অন্যান্য গবাদি পশুর মধ্যে একপ্রকারের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ তৈরি হবার সুযোগ থাকে। সরকারি নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থায় অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড এবং তাসমানিয়া থেকে এই রোগের প্রকোপ ব্যাপকহারে কমে গেছে। মধ্যপ্রাচ্যে হাইডাটিড রোগের উৎপত্তি হয়েছিল কিন্তু সেখান থেকে ক্রমশ দ্রুত ইউরোপ, বিশেষত ফ্রান্স ও জার্মানিতে ছড়িয়ে পড়ে।

4.2.8.3 বাসস্থান (Habitat)

পূর্ণাঙ্গ একাইনোকক্কাস গ্রানুলোসাস মাংসাশী প্রাণী কুকুর, শিয়াল, নেকড়ের ক্ষুদ্রান্ত্রে অবস্থান করে। কুকুরের ক্ষুদ্রান্ত্রের মিউকোসা স্তরে একশোরও বেশি একাইনোকক্কাস সংলগ্ন থাকতে দেখা যায়। এই পরজীবীর লার্ভা দশা অন্তর্বর্তী পোষক ভেড়া, শূকর, গবাদিপশু, ঘোড়া, ছাগল, মানুষের দেহে অবস্থান করে এবং হাইডাটিড সিস্ট গঠন করে। অনেকদিন পর্যন্ত সুপ্ত অবস্থায় থাকে। ফলে সেস্টোডটির মৃত্যু হয়েছে বলে মনে হয়।

4.2.8.4 অঙ্গসংস্থান (Morphology)

পূর্ণাঙ্গ দশা : পূর্ণাঙ্গ একাইনোকক্কাস কুকুর ও অন্যান্য মাংসাশী প্রাণীদের ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাকারে স্কোলেক্সের মাধ্যমে আটকে থাকে। এরা আকারে ছোটো ফিতাকৃমি। এদের দৈর্ঘ্য মাত্র 3-6 মি-মি। দেহ প্রধানত তিনটি অংশে বিভক্ত—স্কোলেক্স বা মস্তিষ্ক, গ্রীবা এবং স্ট্রোবিলা বা দেহখণ্ডক।

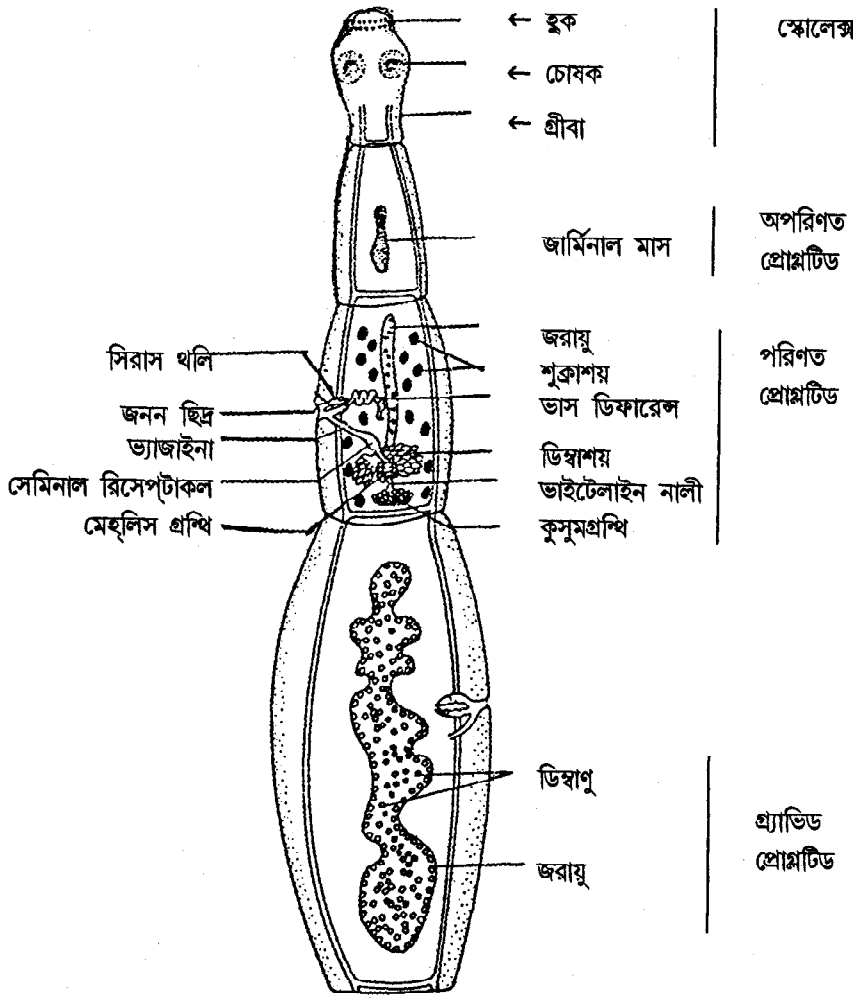

চিত্র 4.41 পূর্ণাঙ্গ একাইনোকক্কাস গ্রানুলোসাস

১. স্কোলেক্স বা মস্তিষ্ক : স্কোলেক্সটি গোলাকার এবং চারটি চোষক (oral sucker) ও রোস্টেলাম যুক্ত। রোস্টেলামে 28-40 টি হুক দুই সারিতে সজ্জিত থাকে।

২. গ্রীবা : গ্রীবা ছোটো ও চওড়া।

৩. স্ট্রোবিলা : স্ট্রোবিলা সাধারণত তিনটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডটি অপরিণত, দ্বিতীয় খণ্ডটি পরিণত এবং সর্বশেষ খণ্ডককে গ্র্যাভিড্ বা পরিপক্ক খণ্ড বলা হয়। গ্র্যাভিড খণ্ডকটি আকারে সবচেয়ে বড়ো, দৈর্ঘ্যে 3-8 মি-মি এবং প্রস্থে 0.6 মি-মি পর্যন্ত হয়।

ডিম্বক : ডিমের দৈর্ঘ্য 32-36 μ.m. এবং এর দুটি স্তর থাকে। বহিঃস্তর মধ্যবর্তী ভ্রূণকে (Inner embryophore) আবৃত করে রাখে। পূর্ণগঠিত ডিমের মধ্যে মধ্যবর্তী ভ্রূণে তিনজোড়া হুক্‌লেট গঠিত হয়। সেজন্য একে *হেক্সাকান্থ ভ্রূণও* বলে। এই পূর্ণগঠিত ডিম, কুকুর, শেয়াল, নেকড়ের মলের মাধ্যমে বাইরে নির্গত হয়। মানুষ, গবাদিপশু ও ভেড়াজাতীয় নিরামিশাষী প্রাণীরা এই ডিম্বক দ্বারা আক্রান্ত হয়।

লার্ভাদশা : অন্তর্বর্তী পোষক মানুষ, ভেড়া, গবাদিপশুর দেহে একাইনোকক্কাসের লার্ভাদশা **হাইডাটিড সিস্ট** নামক থলি গঠন করে অবস্থান করে এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এই সিস্টের মধ্যে অপরিণত লার্ভা অনেকগুলি ছোটো প্রোটোস্কোলেক্স সমন্বিত শাবক আধার (brood capsule) গঠন করে। লার্ভাদশার প্রোটোস্কোলেক্স পরিণত কৃমির স্কোলেক্স বা মস্তিষ্কের ভবিষ্যৎ অবস্থাকে নির্দেশ করে। চূড়ান্ত পোষকের দেহে প্রবেশের পর স্কোলেক্স ডিম্বখোলস ভেদ করে বেরিয়ে আসে এবং পোষকের ক্ষুদ্রান্ত্রের মিউকোসাতে রোস্টেলার হুক দ্বারা আটকে থাকে (চিত্র 4.41)।

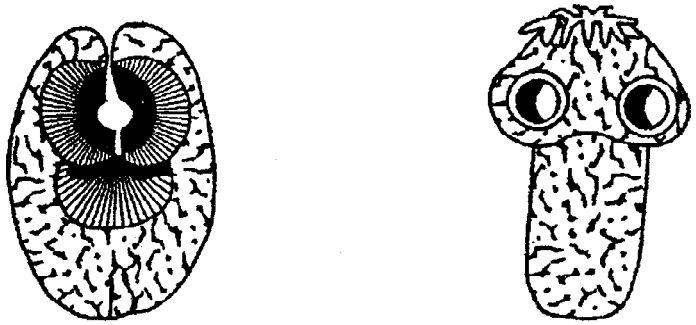

[A] [B]

চিত্র 4.42 একাইনোকক্কাসের প্রোটোস্কোলেক্স ; A- ইন্‌ভ্যাজিনেশন, B-ইভ্যাজিনেশান

4.2.8.5 জীবনচক্র (Life cycle) : একাইনোকক্কাসের জীবনচক্র দুটি পোষকের দেহে সম্পূর্ণ হয়।

(১) চূড়ান্ত বা মুখ্য পোষক (Definitive host) : কুকুর, নেকড়ে, শেয়ালের অন্ত্রে পরিণত কৃমি অবস্থান করে।

(২) অন্তর্বর্তী বা গৌণ পোষক (Intermediate host) : ভেড়া, শূকর, গবাদিপশু, ছাগল, ঘোড়া এবং মানুষ হল এই পরজীবীর অন্তর্বর্তী বা গৌণ পোষক। এদের দেহে পরজীবীর লার্ভাদশা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। চূড়ান্ত পোষকের ক্ষুদ্রান্ত্রে পরিপক্ক দেহখণ্ডক বা গ্র্যাভিড প্রোগ্লটিড থেকে পরিণত ডিম্বক ক্রমাগত নির্গত হয়ে পোষকের মলের সঙ্গে পরিবেশে পরিত্যক্ত হয়। এই ডিম অন্তর্বর্তী পোষকের দেহে তাদের খাদ্যের সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় সংক্রামিত হয়। মানুষের ক্ষেত্রে, প্রধানত শিশুরাই এর দ্বারা দ্রুত

সংক্রামিত হয়। আক্রান্ত কুকুরের সঙ্গে সংস্পর্শে এই ধরনের ঘটনা ঘটে। পশুচারণক্ষেত্রের ঘাস যদি এই পরজীবীর ডিম দ্বারা সংক্রামিত হয় তাহলে ঘাস খাবার সময় ভেড়ার শরীরে ওই পরজীবীর সংক্রমণের যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। পরজীবীর ডিম অন্তর্বর্তী পোষকে প্রবেশের আট ঘণ্টা পর, হেক্সাকান্থ ভ্রূণ ডিমের খোলস ত্যাগ করে ক্ষুদ্রান্ত্রের ডুওডেনামের প্রাকারভেদ করে প্রবেশ করে এবং পোর্টাল শিরা ও উপশিরার মাধ্যমে যকৃতে প্রবেশ করে (চিত্র 4.44)। এই সময় এদের অঙ্কোস্ফিয়ার বলে। এরপর ভ্রূণটি যকৃতে প্রবেশ করে সাইনুসয়ডাল জালিকাবাহে আটকে যায়। এর মধ্যে কিছু ভ্রূণ ওই জালিকাবাহের ছাঁকনির মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে যকৃৎ বাহিকার মাধ্যমে ফুসফুসীয় সংবহনে প্রবেশ করে। কিছু ভ্রূণ আবার ফুসফুসীয় জালিকাবাহে আটকে যায়। এখানে ফুসফুস দ্বিতীয় ছাঁকনির কাজ করে। আবার কিছুসংখ্যক ভ্রূণ ফুসফুসীয় জালিকাবাহ ভেদ করে সাধারণ সংবহনে প্রবেশ করে এবং বিভিন্ন অঙ্গে পৌঁছায়। এভাবে যে কোনো অঙ্গে যেমন বৃক্ক, প্লীহা, চোখ, মস্তিষ্ক ইত্যাদিতে পৌঁছে যায় এবং সেখানে হাইডাটিড সিস্ট গঠন করে। যকৃৎ ও ফুসফুসে বেশি পরিমাণে হাইডাটিড সিস্ট গঠিত হয়। হাইডাটিড সিস্ট হল ফাঁপা থলিতে অবস্থিত অপরিণত লার্ভা। এই সিস্টের ভিতরের দেওয়ালে শাবক আধার (brood capsule) গঠিত হয়। একটি ক্যাপসুলের অভ্যন্তরে অনেকগুলি প্রোটোস্কোলিসেস থাকে (প্রায় এক হাজার সংখ্যক)। এইভাবে ক্যাপসুলের ভিতরে স্কোলেক্সের বৃদ্ধি সম্পূর্ণ হয় এবং হাইডাটিড সিস্টের ভিতরে এর উপস্থিতিকে বলা হয় 'একটি সম্পূর্ণ জৈবিক বৃদ্ধি'। এই হাইডাটিড সিস্ট সংক্রামিত মৃত মানুষ, ভেড়া, ছাগলের মাংস খাবার পর কুকুরের অন্ত্রে 6-7 সপ্তাহের মধ্যে পরিণত পরজীবীর সৃষ্টি হয়। যেহেতু কুকুর সবসময় মৃত সংক্রামিত অন্তর্বর্তী পোষক মানুষের মাংস খাবার সুযোগ পায় না, তাই অন্তর্বর্তী পোষক মানুষের মধ্যে এই পরজীবীর জীবনচক্রের লার্ভাদশাতেই পরিসমাপ্তি ঘটে। ফলে পরিবেশে কুকুর ও ভেড়ার মাধ্যমেই স্বাভাবিক জীবনচক্র পরিচালিত হয় (চিত্র 4.42, 43 ও 44)।

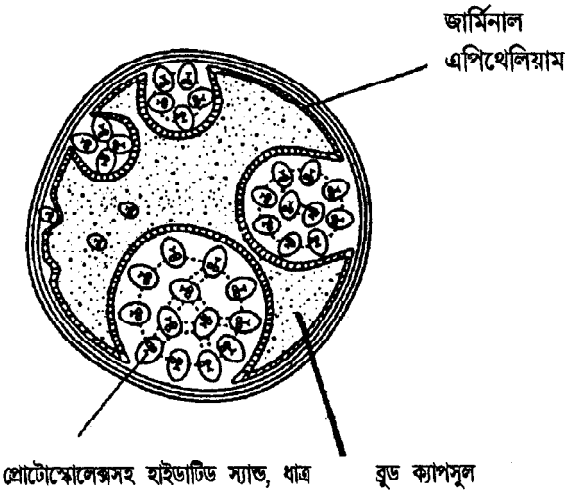

চিত্র 4.43 হাইডাটিডসিস্ট

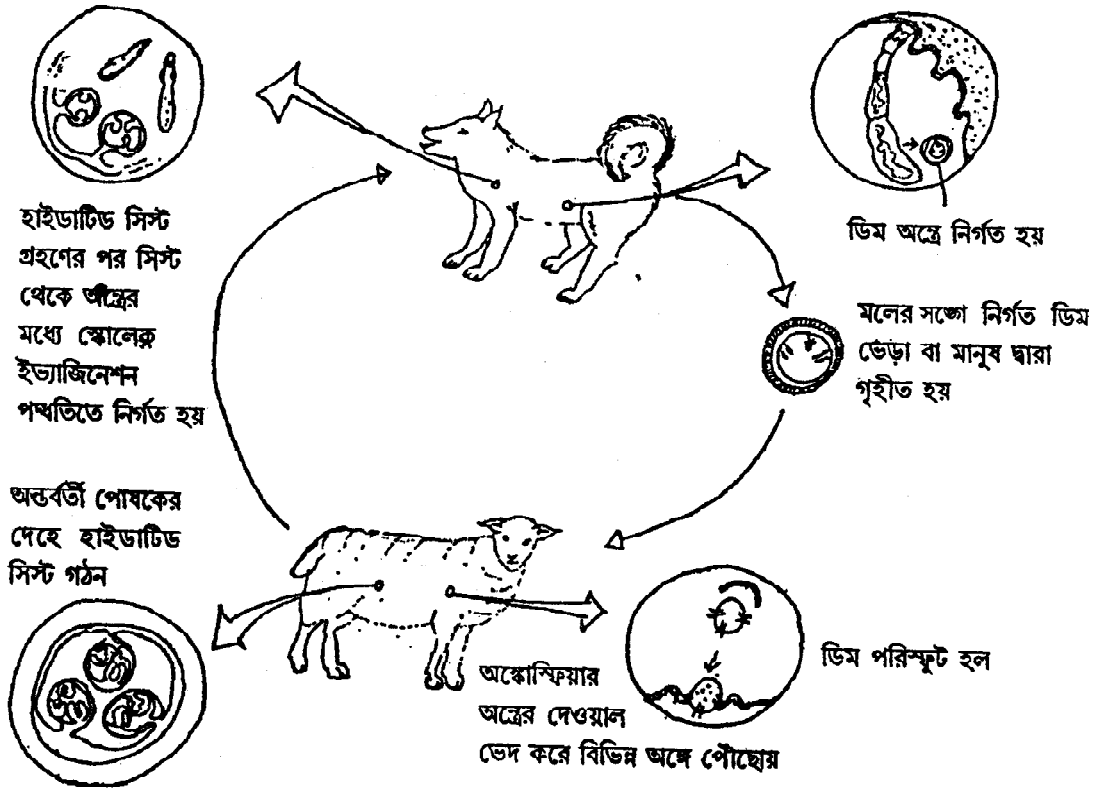

চিত্র 4.44 একাইনোকক্কাস গ্রানুলোসাসের জীবনচক্র

4.2.8.6 রোগজনিত লক্ষণ (Pathogenecity)

কুকুর : পূর্ণাঙ্গ একাইনোকক্কাস কুকুরের দেহে তেমন কোনো অসুবিধের সৃষ্টি করে না।

মানুষ : মানুষের ক্ষেত্রে হাইডাটিড রোগে সংক্রমণের বহু বছর পর্যন্ত রোগলক্ষণ প্রকাশিত হয় না। তবে রোগের প্রকার ও অবস্থা নির্ভর করে সিস্ট আক্রান্ত অঙ্গের ওপর। সিস্টের আকার বড়ো হবার সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্ববর্তী পোষক অঙ্গের ওপর চাপ সৃষ্টি করে ও স্বাভাবিক কার্যে বাধা দান করে। শতকরা দশ ভাগই এই রোগে মরণাপন্ন মানুষের মধ্যে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। অস্থিমজ্জা আক্রান্ত হলে ক্রমশ অস্থির ক্ষয় লক্ষ্য করা যায়। ফলে হাত-পা দেহের ওজনের ভারে বেঁকে যায়। অনেক সময় সিস্ট বৃদ্ধি পেতে পেতে সিস্ট ফেটে যায় এবং একপ্রকার বিষাক্ত তরল হাইডাটিড রস নির্গত হয়। এটি এক প্রকারের প্রোটিন জাতীয় রস যা আক্রান্ত অংশে অ্যানাফাইল্যাক্‌টিক শক্ সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে রোগী মাঝে মাঝেই অজ্ঞান হয়ে যায়, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে (চিত্র 4.45, 4.46)।।

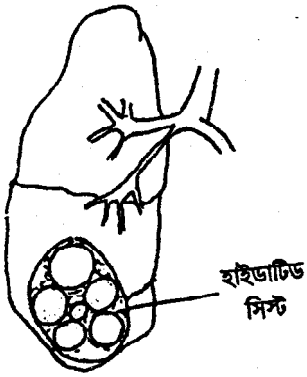

চিত্র 4.45 ফুসফুসে হাইডাটিড সিস্ট

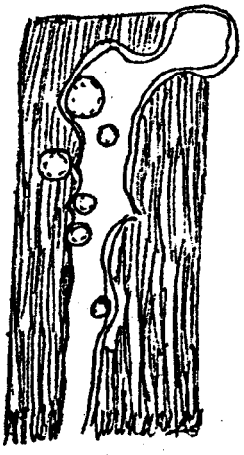

চিত্র 4.46 ফিমার অস্থিতে হাইডাটিড সিস্ট

4.2.8.7 নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি (Control Measures)

নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা (Preventive measures) :

(১) জনগণকে কুকুর, শিয়াল প্রভৃতি মাংসাশী প্রাণী দ্বারা একাইনোকক্কাস সংক্রমণ সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে হবে।

(২) বাড়িতে কুকুর থাকলে, ঠিকমতো হাত ধোওয়া, বাসন পরিষ্কার রাখা দরকার।

(৩) কুকুর যাতে ফেলে দেওয়া মৃতদেহের অংশবিশেষ না ভক্ষণ করে তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

চিকিৎসামূলক ব্যবস্থা (Treatment) :

(১) এই রোগে অস্ত্রোপচারই একমাত্র চিকিৎসা, এবং অস্ত্রোপচার সেই অঙ্গেই করা হয় যেখানে সিস্টকে সরিয়ে আনা সম্ভব।

(২) সাধারণত একাইনোকক্কাসে আক্রান্ত হলে মানুষের ক্ষেত্রে মেবেনডাজোল, অ্যালবেনডাজোল, প্রাজিকোয়ান্টেল ওষুধ প্রয়োগ করা হয়।

4.2.9 সারাংশ

এন্টামিবা হিস্টোলালাইটিকা মানুষের অন্ত্রে বসবাসকারী অ্যামিবিয়েসিস রোগ সৃষ্টিকারী একটি গুরুত্বপূর্ণ পরজীবী প্রোটোজোয়া। এই পরজীবীর সংক্রমণ পৃথিবীর সর্বত্রই দেখতে পাওয়া যায়। আক্রান্ত মানুষের মলের দ্বারা পানীয় জল সংক্রামিত হলে সেই জল পান বা অসিদ্ধ শাকসব্জি ভক্ষণের মাধ্যমে মানুষের এন্টামিবা হিস্টোলাইটিকার সংক্রমণ হয়।

এককোষী পরজীবী প্লাজমোডিয়াম মানবদেহে সবিরাম জ্বর বা ম্যালেরিয়া রোগ সৃষ্টি করে। এই পরজীবী স্ত্রী অ্যানোফিলিস মশার মাধ্যমে ম্যালেরিয়া রোগাক্রান্ত মানুষ থেকে সুস্থ মানুষের দেহে সংক্রামিত করে। প্লাজমোডিয়ামের স্পোরোজয়েট দশা মানুষের ক্ষেত্রে সংক্রামক দশা। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ক্লোরোকুইন, অ্যামাইডোকুইন, প্রাইমাকুইন, মেপাক্রিন প্রভৃতি ওষুধ ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য নিয়মমাফিক সেবন করা উচিত।

অ্যাসকারিস লুম্ব্রিকয়ডিস মানুষের অন্ত্রে বসবাসকারী বৃহৎ পরজীবী ফিতাকৃমি। অন্ত্রে এই পরজীবীর উপস্থিতিতে পেটব্যথা, হজমে গোলমাল, খিদের অভাব, বমি বমি ভাব, জ্বর, রক্তাল্পতা প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পায়। শাকসব্জি, ফলমূল ভালোভাবে না ধুয়ে বা সুসিদ্ধ করে না খেলে এই পরজীবীর সংক্রমণ ঘটে এবং অ্যাসকেরিয়েসিস রোগের সৃষ্টি হয়। এই রোগে হেট্রাজন, পাইরানটেল, মেবেনডাজোল, অ্যালবেনডাজোল প্রভৃতি ওষুধ ব্যবহার করা হয়।

হুকওয়ার্ম অ্যাঙ্কাইলোস্টোমা ডুওডিনেল মানুষের ক্ষুদ্রান্ত্রে বসবাসকারী পরজীবী। এদের কোনো অন্তর্বর্তী পোষক থাকে না। মানুষই একমাত্র পোষক। এদের জীবনচক্রে বিভিন্ন লার্ভাদশা র‍্যাবডিটিফর্ম ও ফিলারিফর্ম লার্ভার উপস্থিতি দেখা যায়। লার্ভাগুলি ত্বকের মধ্যে দিয়ে যান্ত্রিকভাবে, কখনও বা সাবকিউটেনিয়াস কলাকে বিনষ্ট করে লসিকাতন্ত্রে বা উপশিরায় প্রবেশ করে। ত্বকের সেসব স্থানে অসহ্য চুলকানি, রক্তাভ আবজাতীয় র‍্যাশ তৈরি হয়। একে 'গ্রাউন্ট ইচ্ বলে।

ফ্যাসিওলা হেপাটিকা প্লাটিহেল্মিন্থিস পর্বভুক্ত, বহুকোষী, চ্যাপ্টা, বৃহদ্, পেশিবহুল চোষক সম্বলিত প্রধানতঃ ভেড়ার পিত্তনালীতে অন্তঃপরজীবীরূপে বসবাসকারি যকৃত কৃমি। এই পরজীবীর জীবনচক্র মুখ্য পোষক ভেড়া, গোরু, ছাগল, হরিণ, ঘোড়া এবং গৌণ পোষক শামুকের (Lymnaea) দেহে সম্পূর্ণ হয়। ফ্যাসিওলার জীবনচক্রের বিভিন্ন লার্ভাদশাগুলি হল মিরাসিডিয়াম, স্পোরোসিস্ট, রেডিয়া, সারকেরিয়া এবং মেটাসারকেরিয়া। ফ্যাসিওলা পোষক প্রাণীর যকৃৎ কোষ ও রক্ত ভক্ষণ করে ফলে যকৃৎ পচন রোগ সৃষ্টি হয়। এমেটিন, টেট্রাক্লোরইথিলিন, টেট্রামিসল, মেবেনডাজোল প্রভৃতি কৃমি প্রতিরোধী ওষুধ ব্যবহার করে ফ্যাসিওলিয়াসিস সারানো যায়।

একাইনোকক্কাস গ্রানুলোসাস মানুষের দেহে হাইডাটিড রোগ সৃষ্টি করে এবং এর প্রাদুর্ভাব পৃথিবীর সর্বত্রই দেখতে পাওয়া যায়। কুকুর, নেকড়ে, শেয়াল ইত্যাদি প্রাণীর ক্ষুদ্রান্ত্রে পরিণত একাইনোকক্কাস অবস্থান করে এবং এরা এই পরজীবীর মুখ্য পোষক। ভেড়া, শূকর, গবাদিপশু, মানুষ হল অন্তর্বর্তী পোষক এবং এদের দেহে পরজীবীর লার্ভা দশা বৃদ্ধি পায়। অন্তর্বর্তী পোষকের প্লীহা, মস্তিষ্ক, বৃক্ক, যকৃৎ, ফুসফুসে একাইনোকক্কাসের লার্ভাদশা হাইডাটিড সিস্ট নামক থলি গঠন করে এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সিস্টের আকার বড়ো হবার সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্ববর্তী অঙ্গের ওপর চাপ সৃষ্টি করে ও স্বাভাবিক কাজে বাধা দেয়। মানুষের ক্ষেত্রে এই রোগে অস্ত্রোপচারই একমাত্র চিকিৎসা।

4.2.10 অনুশীলনী

(1) এন্টামিবার ট্রোফোজয়েট দশার বৈশিষ্ট্যগুলি লিখুন।

(2) এন্টামিবার জীবনচক্রে এক্সসিস্টেশন এবং এনসিস্টেশন বলতে কী বোঝেন ?

(3) অ্যামিবিয়েসিসের উপসর্গগুলি লিখুন।
(4) ম্যালেরিয়া শব্দটির অর্থ কী ?
(5) সিগনেট রিং দশা কী ? এটি কোন্ প্রাণীতে দেখা যায় ?
(6) প্লাজমোডিয়াম ভাইভ্যাক্স কীভাবে মানুষের শরীরে ম্যালেরিয়া রোগের পুনঃসংক্রমণ ঘটায় ?
(7) টীকা লিখুন :
(ক) ট্রোফোজয়েট দশা
(খ) গ্যামেটোসাইট দশা
(8) অ্যাসকারিসের জীবনচক্রে কয়টি লার্ভাদশা দেখা যায় ?
(9) মানুষের দেহে অ্যাসকারিসের র‍্যাবডিটিফর্ম লার্ভার পরিযান কীভাবে হয় ?
(10) অ্যাসকারিয়েসিস কী ? এই রোগের লক্ষণগুলি লিখুন।
(11) মানুষের ক্ষেত্রে সংক্রামক একটি হুকওয়ার্মের নাম করুন কীভাবে এর সংক্রমণ ঘটে ?
(12) মানুষের দেহে ফিলারিফর্ম লার্ভার পরিযান কীভাবে হয় ?
(13) ' গ্রাউন্ড ইচ্' রোগটি কী ? কীভাবে এর নিয়ন্ত্রণ করা যায় ?
(14) যকৃৎ কৃমি বা ফ্যাসিওলাকে ডাইজেনেটিক পরজীবী বলা হয় কেন ?
(15) ফ্যাসিওলার জীবনচক্রের বিভিন্ন লার্ভাদশাগুলির নাম লিখুন।
(16) 'লিভার রট' কী ?
(17) একাইনোকক্কাসের মুখ্য পোষকের নাম কী ?
(18) পরিণত একাইনোকক্কাসের গঠন চিত্রসহ বর্ণনা করুন।
(19) 'হাইডাটিড রোগ' বলতে কী বোঝেন ?
(20) **শূন্যস্থান পূরণ করুন :**
(i) এন্টামিবা হিস্টোলাইটিকা মানুষের.....বসবাসকারী পরজীবী.....।
(ii) উকাইনেট সিস্ট গঠন করে.....পরিবর্তিত হয়।
(iii) অ্যাসকারিসের দেহ গহ্বরটি.....দেহগহ্বর।
(iv) পুরুষ অ্যাঙ্কাইলোস্টোমার পশ্চাৎ অংশ প্রসারিত হয়ে আঙুলের মতো .....গঠন করে।
(v) শীতকালে রেডিয়া লার্ভার জননকোষ বিভক্ত হয়ে পরবর্তী লার্ভা দশা.....সৃষ্টি করে।
(vi) একাইনোকক্কাসের গৌণ পোষক হল.....।

4.2.11 উত্তরমালা

(1) 4.2.3.3 অংশ দ্রষ্টব্য
(2) 4.2.3.4 দ্রষ্টব্য
(3) 4.2.3.6 দ্রষ্টব্য
(4) 4.2.4 দ্রষ্টব্য

(5) 4.2.4.4 দ্রষ্টব্য
(6) 4.2.4.5 দ্রষ্টব্য
(7) 4.2.4.4 দ্রষ্টব্য
(8) 4.2.5.6 দ্রষ্টব্য
(9) 4.2.5.6 দ্রষ্টব্য
(10) 4.2.5.7 দ্রষ্টব্য
(11) 4.2.6.5 দ্রষ্টব্য
(12) 4.2.6.5 দ্রষ্টব্য
(13) 4.2.6.6 দ্রষ্টব্য এবং 4.2.6.7 দ্রষ্টব্য
(14) 4.2.7.3 দ্রষ্টব্য
(15) 4.2.7.5 দ্রষ্টব্য
(16) 4.2.7.6 দ্রষ্টব্য
(17) 4.2.8 দ্রষ্টব্য
(18) 4.2.8.4 দ্রষ্টব্য
(19) 4.2.8.6 দ্রষ্টব্য
(20) (i) অন্ত্রে, প্রোটোজোয়া
(ii) উসিস্ট
(iii) ভ্রান্ত
(iv) কপুলেটরি বার্সা
(v) সারকেরিয়া
(vi) মানুষ

———

একক 4.3 অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিবডি : সংক্ষিপ্ত ধারণা, অনাক্রম্যতন্ত্রে যুক্ত বিভিন্ন প্রকার কোষ ও কলা, অ্যান্টিজেন-অ্যান্টবডি বিক্রিয়া, টিকাকরণ ও টিকা প্রস্তুতিকরণের মূলনীতি [Antigen-antibody defination and concept, type of cells involved in the body, innune system, antigen antibody reaction-outline idea, basic principles of vaccination]

4.3.1 প্রস্তাবনা

পোষক প্রাণী পরজীবীর আক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্য নানাপ্রকার অভিযোজনের আশ্রয় নিয়ে থাকে। সামগ্রিকভাবে সকল রকম ব্যবস্থাপনাকে বলা হয় প্রতিরক্ষা (Defence)। পরজীবীর আক্রমণ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাগুলিকে সাধারণভাবে বলা হয় অনাক্রম্যতা। অনাক্রম্যতা হল মেরুদণ্ডী প্রাণীর বিবর্তনের পথে এক বিশেষ ক্ষমতা যা দেহের কিছু বিশেষ কোষ দ্বারা জীবানু ও পরজীবীর বহিরাক্রমণের পথে বাধা সৃষ্টি করে। এই অনাক্রম্যতা সৃষ্টিতে অ্যান্টিজেন এবং অ্যান্টিবডির সুস্পষ্ট ধারণা অত্যাবশ্যক।

4.3.2 উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি—

- অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিবডি সম্বন্ধে জানতে পারবেন।
- যে সমস্ত কোষ-কলা অনাক্রম্যতা সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে তাদের সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- বিভিন্ন পদ্ধতিতে অ্যান্টিজেনের সঙ্গে অ্যান্টিবডির বিক্রিয়া সম্বন্ধে জানতে পারবেন।
- দেহ থেকে অ্যান্টিজেনের বহিরাক্রমণে অ্যান্টিবডির ভূমিকা জানতে পারবেন।
- সর্বোপরি এর থেকে টিকা (vaccine) প্রস্তুতকরণ সম্পর্কেও স্পষ্ট ধারণা জন্মাবে।

4.3.3 অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিবডি : গঠন, বিশেষত্ব, শ্রেণীবিভাগ

4.3.3.1 অ্যান্টিজেন (antigen)

দেহের ভিতর যে সব পদার্থ বহিরাগত বলে চিহ্নিত হয় ও যাদের অনুপ্রবেশের ফলে দেহে অনাক্রম্যতাজনিত সংবেদনের সৃষ্টি হয় তাদের অ্যান্টজেন (antigen) বলে। অ্যান্টিজেন সাধারণতঃ প্রোটিন, পলিস্যাকারাইড, গ্লাইকোপ্রোটিন বা নিউক্লিওপ্রোটিন হতে পারে। অ্যান্টিজেনের যে অংশ অ্যান্টিবডির সাথে আবদ্ধ হয় তাকে এপিটোপ (epitope) বলে। কোন কোন অ্যান্টিজেনের একাধিক এপিটোপ থাকতে পারে। কখনও কখনও বিশেষ ক্ষুদ্র রাসায়নিক অনু নিজে অ্যান্টিজেন না হলেও বৃহৎ প্রোটিনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অ্যান্টিজেন ধর্মী হয়ে পড়ে এবং অ্যান্টিবডির সাথে আবদ্ধ হয়। এমন পদার্থকে হ্যাপ্টেন (hapten) বলা হয়।

4.3.3.2 অ্যান্টিবডি

রক্তের প্লাজমা ও কলারসে গ্লাইকোপ্রোটিন জাতীয় পদার্থ যাদের উপস্থিতিতে পরজীবী বা বিজাতীয় বস্তু দেহের মধ্যে প্রবেশ করলে লক্ষ্য করা বা বুঝা যায় তাদের **অ্যান্টিবডি** (antibody) বা ইমিউনোগ্লোবিউলিন (immunoglobulin) বলে। এরা B কোষের গায়ে গ্রাহক রূপে উপস্থিত থাকে এবং বহিঃস্থ অ্যান্টিজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাদের বিনষ্ট করে।

অ্যান্টিবডি/ইমিউনোগ্লোবিউলিনের গঠন

অ্যান্টিবডি অনুগুলি চারটি পলিপেপটাইড শৃঙ্খলযুক্ত Y-আকৃতির গঠন বিশেষ। এদের মধ্যে দুটি হল ভারী শৃঙ্খল (heavy chain) এবং অন্য দুটি হাল্কা শৃঙ্খল (light chain)। ভারী শৃঙ্খল দুটি (H-chains) ড্রাইসালফাইড (-S-S-) বন্ধনী দ্বারা যুক্ত থাকে। হাল্কা শৃঙ্খল দুটিও ভারী শৃঙ্খল দুটির সঙ্গে একই প্রকার বন্ধনী দ্বারা যুক্ত থাকে। এছাড়া ভারী ও হাল্কা উভয় শৃঙ্খলেই অন্তঃশৃঙ্খল ডাইসালফাইড

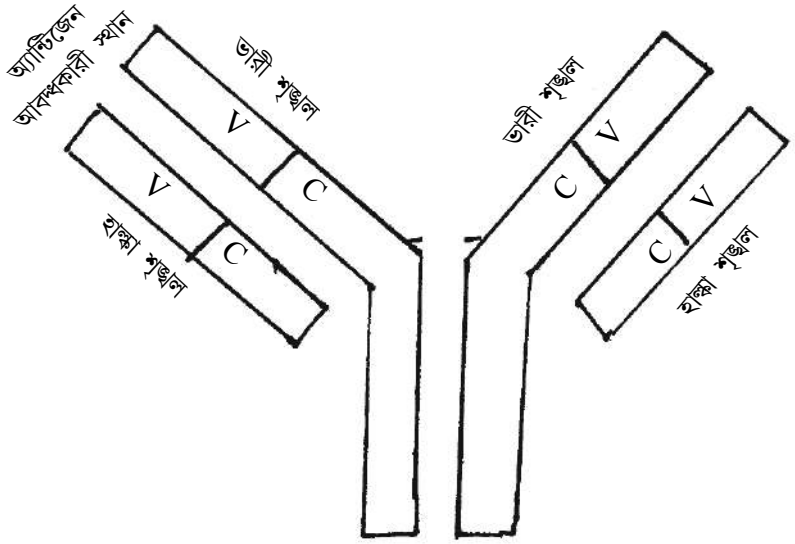

চিত্র 4.47 : অ্যান্টিবডি অণুর আনুমানিক আকৃতি ও গঠন

বন্ধনী আছে. IgG ইনিউনোগ্লোবিউলিনের দুটি H-শৃঙ্খলে প্রায় 440টি অ্যামাইনো অ্যাসিড আছে। L-শৃঙ্খল দুটিতে H-শৃঙ্খলের তুলনায় অর্দ্ধেক সংখ্যক অ্যামাইনো অ্যাসিড পাওয়া যায়। অ্যান্টিবডি অনুর প্রান্তীয় NH_2 মূলকের কাছাকাছি H-শৃঙ্খলের প্রায় এক চতুর্থাংশ ও L-শৃঙ্খলের প্রায় অর্দ্ধাংশ বৈচিত্র্যযুক্ত বা পার্থক্যযুক্ত (Variable or V) হয়। এই পার্থক্যযুক্ত অঞ্চলটিই বিভিন্ন প্রকার আন্টিজেনের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। এছাড়া H ও L শৃঙ্খলের COOH মূলকের কাছে বিভিন্ন ইমিউনোগ্লোবিউলিন অনুগুলির অ্যামাইনো অ্যাসিডের অনুক্রমে প্রার্থক্য দেখা যায় না। এই অঞ্চলকে স্থির অঞ্চল (constant region) বলে এবং যথাক্রমে C_H ও C_L সংকেত দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। NH_2 প্রান্তযুক্ত L ও H শৃঙ্খলদ্বয়ের V-

অঞ্চল অ্যান্টিজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়। এই অংশদ্বয়কে Fab খণ্ডাংশও বলা হয়। COOH প্রান্তযুক্ত H-শৃঙ্খলদ্বয়কে F_c খণ্ডাংশ বলে। এই অংশে অ্যান্টিজেনের বন্ধন ঘটে না।

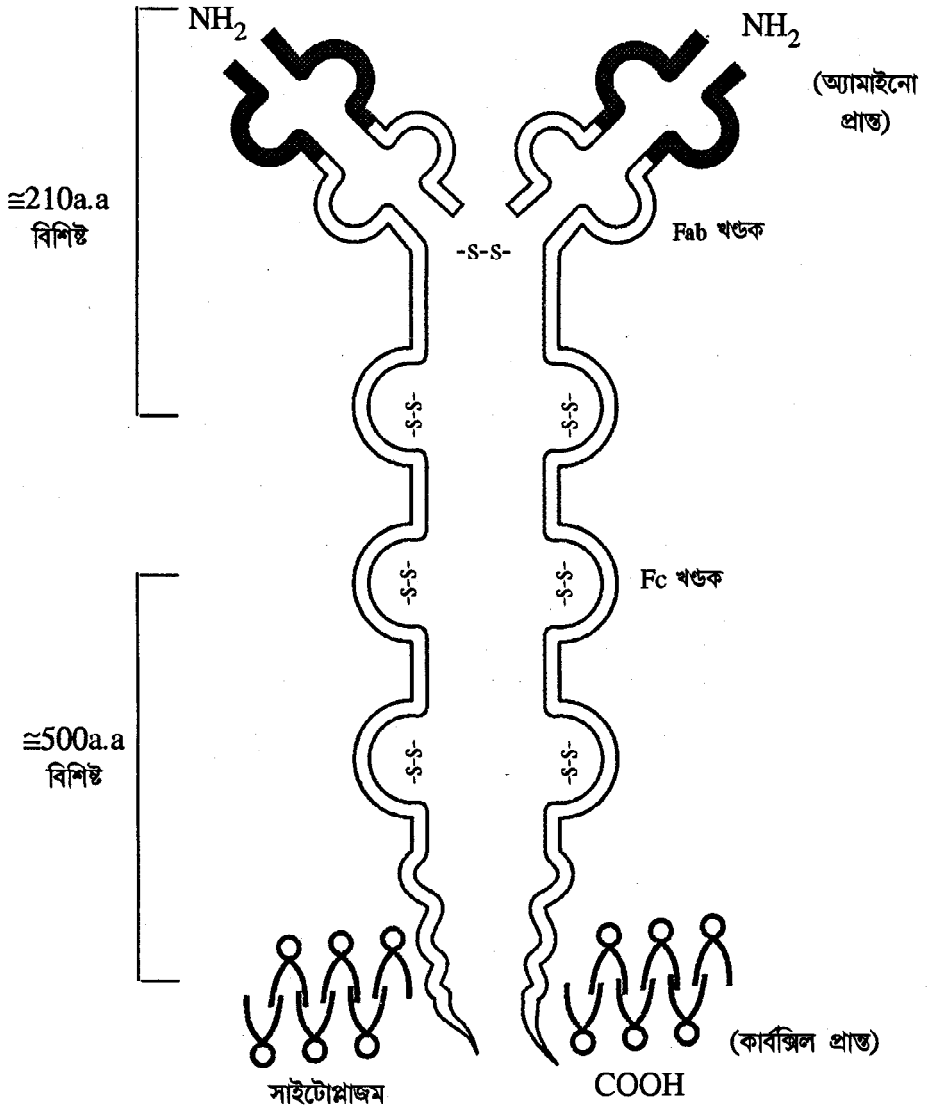

চিত্র 4.48 : অ্যান্টিবডির সাধারণ গঠন

অ্যান্টিবডি/ইমিউনোগ্লোবিউলিনের শ্রেণীবিভাগ

ইমিউনোগ্লোবিউলিন অনুর 'ভারী শৃঙ্খল' (H chain) পাঁচ প্রকারের হয়। এই প্রকার ভেদের ওপর নির্ভর করে ইমিউনোগ্লোবিউলিন অনুকে পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—IgG, IgA, IgM, IgD, IgE।

এর প্রকারগুলিতে ইমিউনোগ্লোবিউলিন Ig এবং শেষোক্ত অক্ষরটি সেই ইমিউনোগ্লোবিউলিনটির কোন বিশেষ প্রকৃতি বোঝায়। এই শ্রেণীগুলিকে আইসোটাইপ বলা হয়।

বৈশিষ্ট্য	**IgG**	**IgM**	**IgA**	**IgE**	**IgD**
রক্তে পরিমাণ	75.85%	5-10%	10%	0.005%	0.2%
একক	1	5	1বা 2	1	1
L-chain বা হাল্কা শৃঙ্খল	K বা λ	K বা λ	K বা λ	K বা λ	K বা λ
H-chain বা ভারী শৃঙ্খল	γ	μ	α	ε	δ
কম্‌প্লিমেন্ট সক্রিয়তার ক্ষমতা	আছে	আছে	আছে	নাই	নাই
ফ্যাগোসাইটের সঙ্গে আবদ্ধ হওয়ার ক্ষমতা	আছে	আছে	আছে	নাই	নাই
লিম্ফোসাইটের সাথে আবদ্ধ হবার ক্ষমতা	আছে	আছে	আছে	আছে	নাই
মাস্ট কোষ ও বেসোফিলের সাথে আবদ্ধ হবার ক্ষমতা	আছে	আছে	আছে	নাই	নাই
প্রাপ্তিস্থান	নাই	নাই	নাই	আছে	নাই
অমরা অতিক্রমণের ক্ষমতা	রক্তরস রক্তরসের বাইরে, অমরা অতিক্রান্ত স্থান আছে	রক্তরস ও B কোষ পর্দায় নাই	আবরণী কলার বাইরে নাই	রক্তরস ও রক্তবহির্ভূত স্থানে নাই	B কোষের পর্দায় নাই
অর্ধ-জীবনকাল (দিন)	21	5-10	6	2	3

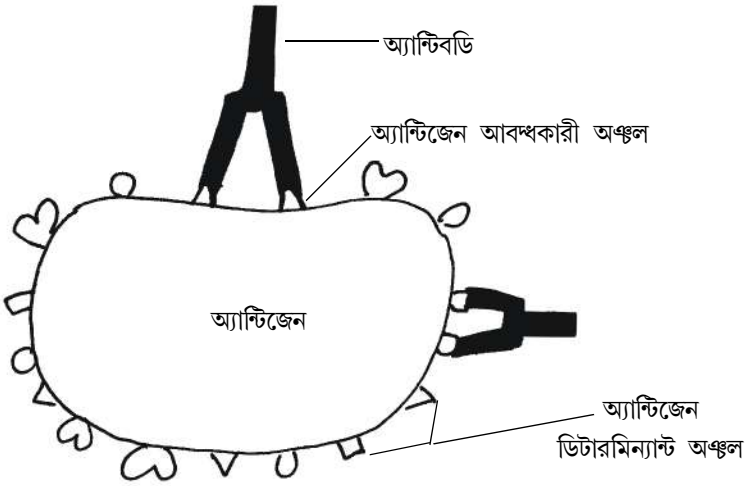

চিত্র 4.49 : অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি সম্পর্কের চিত্ররূপ

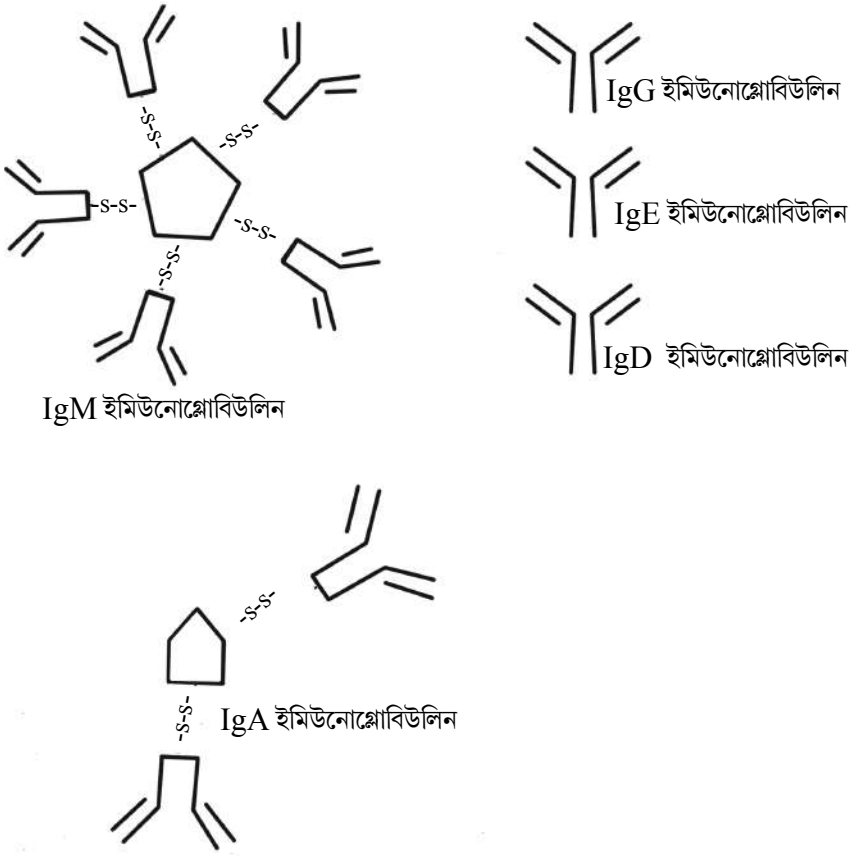

চিত্র 4.50 : অ্যান্টিবডি বা ইমিউনোগ্লোবিউলিনের শ্রেণীগুলির আকৃতিগত প্রকারভেদ

অনাক্রম্যতায় অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন কোষ এবং কলা

বৈচিত্র্যময় এই জীবজগতে আমরা সকলে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন প্রকার ক্ষতিকারক আনুবীক্ষণিক জীবাণুর সম্মুখীন হই। এই জীবাণুগুলি শরীরে প্রবেশ করলে প্রাণীদেহের লিম্ফয়েড (lymphoid) ও মায়েলয়েড্ (myeloid) কোষগুলি তাদের কার্যকলাপ প্রতিহত করে প্রাণীদের সুরক্ষায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রক্ত সংবহন তন্ত্র, লসিকা তন্ত্র, লিম্ফয়েড ও মায়েলেড্ কোষের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে অনাক্রম্যতার একটি কার্যকরী একক হিসেবে কাজ করে। এই সকল কোষ, কলা এবং লিউকোসাইট বা শ্বেতরক্তকণিকা অস্থিমজ্জার সবার্থ সাধক মাতৃকোষ (pluripolent stemcell) থেকে উৎপত্তি লাভ করে।

লিম্ফোসাইট কোষ অর্জিত অনাক্রম্যতায় মুখ্য ভূমিকা পালন করে এবং অনাক্রম্যতা সম্বন্ধীয়

বিভিন্নতা বিশেষত্ব, স্মৃতি সংবেদন এবং নিজস্বতা স্বীকৃতি প্রাপ্তিতে কেন্দ্রীয় স্থান অধিকার করে।

লিম্ফোসাইট কোষের উৎপত্তি দুটি পথে হয়—

(i) **লিম্ফয়েড পথে**—T-lymphocyte এবং B-lymphocyte এবং (ii) **মায়েলয়েড পথে**—এক নিউক্লিয় ও বহুনিউক্লিয় লিউকোসাইট, অনুচক্রিকা এবং মাস্টকোষের উৎপত্তি হয়। তৃতীয় আর একপ্রকার লিম্ফোসাইট কোষ আছে যার নাম নাল কোষ (Null cell)।

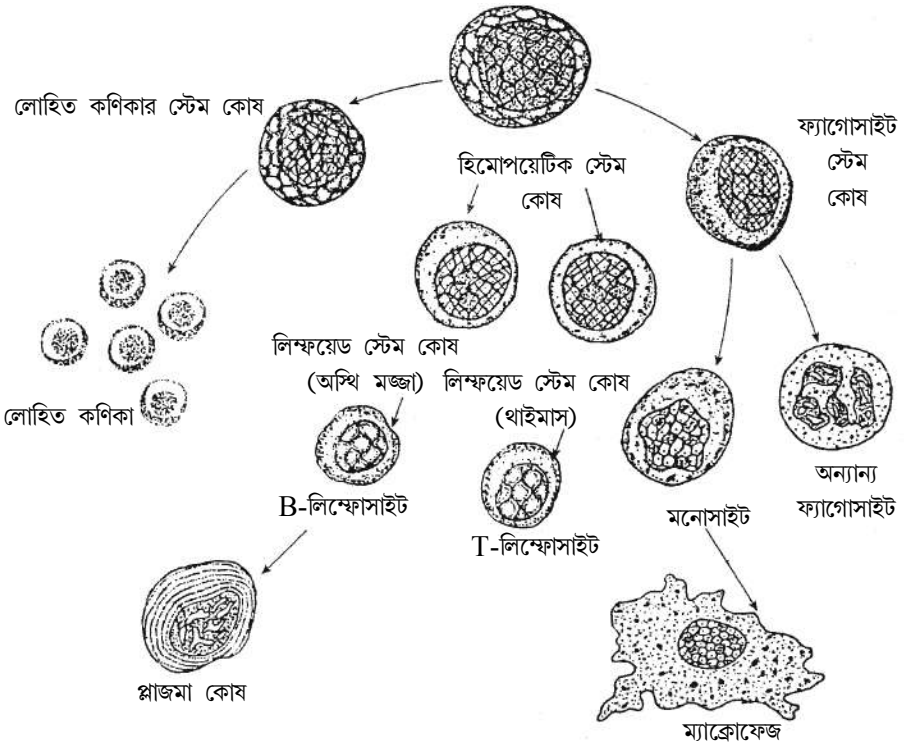

চিত্র 4.51 : অস্থিমজ্জায় হিমোপোয়েটিক কোষ থেকে লিম্ফোসাইট ও ফ্যাগোসাইট সৃষ্টি।

1. লিম্ফয়েড কোষ (Lymphoid cell) :

দেহের শ্বেতরক্তকণিকার শতকরা 20-40 ভাগ এবং লসিকার 99 ভাগ কোষই লিম্ফোসাইট। কার্যকারিতা এবং কোষপর্দার উপাদানের ভিত্তিে ত লিম্ফোসাইট কোষকে তিনভাগে ভাগ করা যায়— B,T লিম্ফোসাইট এবং নাল কোষ, এই তিনপ্রকার কোষই ক্ষুদ্র, চলমান এবং অনাগ্রাসী কোষ, এদের গঠনগতভাবে পৃথক করা যায় না।

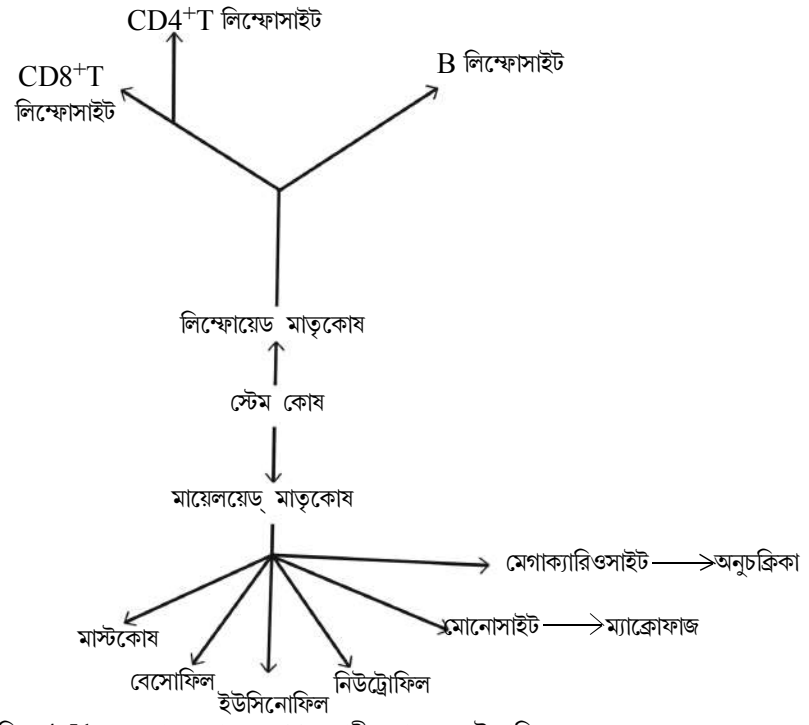

চিত্র 4.51 : অমাক্রম্যতায় অংশগ্রহণকারী কোষ-এর উৎপত্তি

(ক) 'বি'-লিম্ফোসাইট (B-lymphocyte)

পাখির বাসা ফ্যাব্রিসিয়াস (bursa fabricius) গ্রন্থিতে প্রথম আবিষ্কৃত হয় বলে B-লিম্ফোসাইটে এরূপ নামকরণ হয়েছে। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের অস্থিমজ্জায় এটি সর্বাপেক্ষা বেশী পাওয়া যায়। পরিণত 'B-

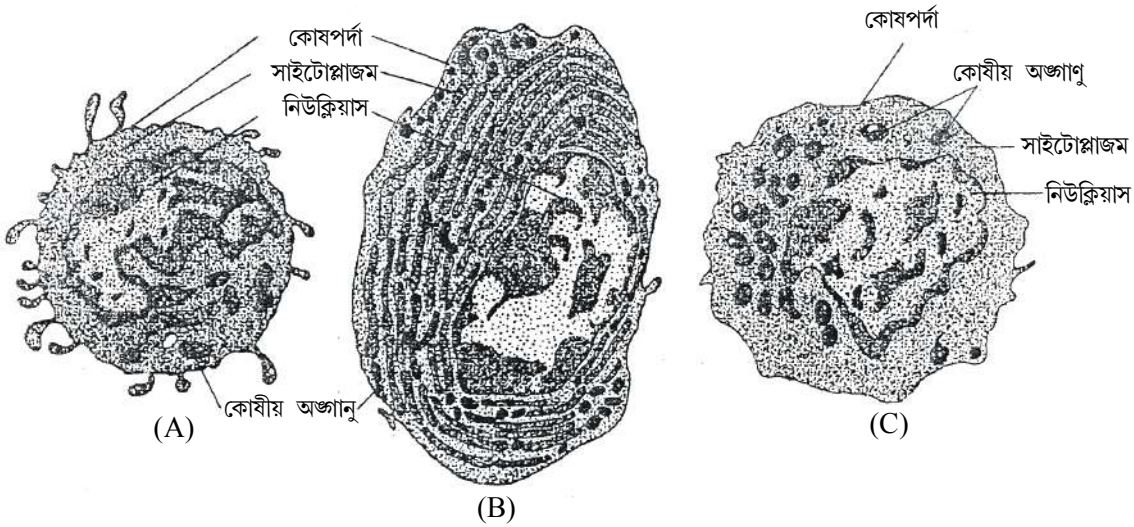

চিত্র 4.52 : B-লিম্ফোসাইটের ইলেকট্রন আণুবীক্ষণিক চিত্র

কোষের' পর্দায় গ্রাহক থাকে যা অ্যান্টিজেনের গ্রাহক হিসেবে কাজ করে। এই B-কোষে আবদ্ধ গ্রাহকগুলি হল অ্যান্টিবডি বা ইমিউনোগ্লোবিউলিন। T-কোষ ও ম্যাক্রোফাজ কোষের সম্মেলনে B-কোষের পর্দা সংলগ্ন অ্যান্টিবডি এবং অ্যান্টিজেনের ক্রিয়ায় B-কোষের ক্লোনাল নির্বাচন (clonal selection) হয়। এর ফলে B কোষের বারংবার বিভাজন হয়ে প্লাজমা ও মেমারি বা স্মরণ (memory) কোষে পৃথকীকৃত হয়। প্লাজমা কোষ সক্রিয়ভাবে অ্যান্টিবডি নিঃসরণ করে।

(খ) 'টি'-লিম্ফোসাইট (T-lymphocyte)

থাইমাস গ্রন্থিতে এই লিম্ফোসাইটগুলি পরিণত হয় বলে একে T-লিম্ফোসাইট বলে। এই লিম্পোসাইটে অ্যান্টিজেনের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার জন্য পর্দাসংলগ্ন গ্রাহক থাকে। যখন মেজর হিস্টোকমপ্যাটিবিলিটি কমপ্লেস (MHC) দ্বারা অ্যান্টিজেন এনকোড্ বা রিকগ্নিশান হয় তখনই একমাত্র T-কোষ গাহক অ্যান্টিজেনকে চিহ্নিত করতে পারে। T-লিম্ফোসাইটের পর্দা সংলগ্ন দু-প্রকার বিশেষ অনু CD4 এবং CD8 থাকে। যে T-কোষ CD4 অনুকে প্রকাশ করে সেই T-কোষ class II MNC সংযুক্ত অ্যান্টিজেনকে চিহ্নিত করে। অনুরূপভাবে যে T-কোষ CD8 অনুকে প্রকাশ করে সেই T-কোষ class-I MHC সংযুক্ত অ্যান্টিজেনকে চিহ্নিত করে। CD4+T কোষ হল T helper (T_H) কোষ এবং class II MHC নির্ধারিত। CD8+T কোষ হল T-cytotoxic (Tc) কোষ এবং এটি class-I MHC নির্ধারিত।

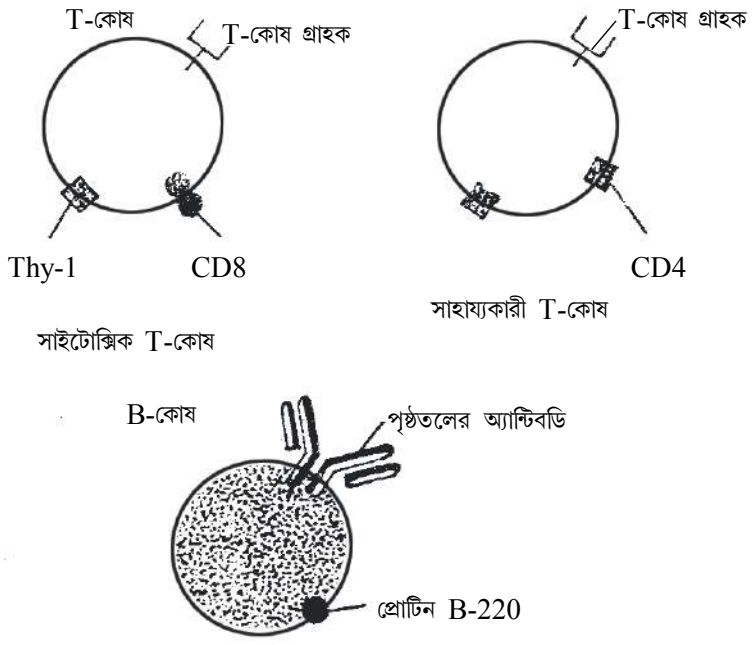

চিত্র 4.53 : সাহায্যকারী T-লিম্ফোসাইট ও B-লিম্ফোসাইট

(গ) **নাল কোষ (Null cell)**

কিছু সংখ্যক প্রান্তীয় লিম্ফোসাইট হল নাল কোষ। T-কোষ এবং B-কোষের মত নাল কোষের পর্দায় কোন বিশেষ অনু নেই। নাল কোষে অ্যান্টিজেন বন্ধনকারী গ্রাহক পাওয়া যায় না। নাল-কোষের অনাক্রম্য বিশেষত্ব এবং স্মরণ ক্ষমতা নেই। কিছু সংখ্যক বৃহৎ, দানাদার নাল কোষকে স্বাভাবিক মারক কোষ (natural killer) বলা হয়। এই natural killer কোষ টিউমার কোষকে ধ্বংস করে।

2. মায়েলয়েড কোষ (Myeloid cell)

(ক) মনোনিউক্লিয়ার ফ্যাগোসাইট্স (Mononuclear phagocytes) : অস্থিমজ্জায় সাধারণ জনিত্ মায়েলয়েড কোষ থেকে মনোসাইট তৈরী হয়ে রক্তপ্রবাহে প্রবাহিত হয় এবং বিভিন্ন অঙ্গ ও কলাতে পরিবাহিত হয়ে ম্যাক্রোফাজে পরিণত হয়। মানুষের মনোসাইট, লিম্ফোসাইট থেকে অনেক বড়

চিত্র 4.54: মানুষের শরীরে ম্যাক্রোফেজের বিচরণক্ষেত্র।

এবং নিউক্লিয়াসটি বৃক্কের মত দেখতে হয়। এই সক্রিয় আগ্রাসনকারী কোষগুলির কোষাবরণ খুব কুঞ্চিত হয় এবং বহু সংখ্যক দানাদার কোষীয় অঙ্গানু থাকে যা লাইসোজোম নামে পরিচিত। লাইসোজোমে অনেক উৎসেচক থাকে যা ক্ষুদ্র জীবাণুকে ধ্বংস করে। এই এক নিউক্লিয় ফ্যাগোসাইটের কোষাবরণে বিভিন্ন প্রকার গ্রাহক থাকে যারা অচেনা বস্তুর গ্রহণ এবং তাদের বিনষ্টিকরণে সাহায্য করে। ম্যাক্রোফাজের এইরূপ কার্যকলাপে T- লিম্ফোসাইট নিঃসৃত লিম্ফোকাইন (lymphochine) সাহায্য করে। দেহের

বিভিন্ন অঙ্গ এবং কলাকোষে ম্যাক্রোফাজের অবস্থান অনুযায়ী তাদের নিম্নলিখিতভাবে নামকরণ করা হয়—

A. ফুসফুসে—ফুসফুসীয় ম্যাক্রোফাজ (Pulmonary macrophage)
B. সংযোজক কলায়—হিস্টিওসাইট (Histiocyte)
C. যকৃতে—কুপ্ফার কোষ (Kupffer Cell)
D. বৃক্কে—মেসেনগ্লিয়াল কোষ (Mesenglial cell)
E. মস্তিষ্কে—মাইক্রোগ্লিয়াল কোষ (Microglial Cell)

(খ) **পলিমরফোনিউক্লিয়ার লিউকোসাইট (Polymorphonuclear Leukocytes) :** এই কোষগুলিকে গ্র্যানুলোসাইটও বলা হয় এবং এরা খুব অল্পদিন বাঁচে। পরিণত কোষটির নিউক্লিয়াস বহু প্রকোষ্ঠযুক্ত এবং বহুসংখ্যক দানাযুক্ত। এই কোষগুলি তিন রকমের হয় নিউট্রোফিল, ইওসিনোফিল এবং বেসোফিল।

(i) **নিউট্রোফিল (Neutrophil) :** রক্তপ্রবাহে প্রবাহিত বেশীরভাগ গ্র্যানুলোসাইট হল নিউট্রোফিল। এর গ্র্যানুউল বা দানাগুলি বহুসংখ্যক জীবানুধ্বংসী বীজঘ্ন (microbiocidal) অনু নিয়ে গঠিত এবং যখন জীবানুর আক্রমণ বা আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে কেমোট্যাক্টিক বা রসায়নসংবেদী উপাদান তৈরী হয়, তখন এই বীজঘ্ন দানাগুলি আক্রমণ স্থানের কোষ কলায় উন্মুক্ত হয়।

(ii) **ইওসিনোফিল (Eosinophil)**

এরা একপ্রকার আগ্রাসনকারী কোষ এবং এদের কর্মক্ষমতা নিউট্রোফিলের থেকে কম। সাধারণ সুস্থ দেহে এদের সংখ্যা কম, কিন্তু দেহে কতকগুলি নির্দিষ্ট অ্যালার্জির পরিস্থিতিতে এদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং এদের থেকে কিছু কোষবিষানু (cytotoxin) মুক্তি পায়।

(iii) **বেসোফিল (Basophil)**

রক্তবাহে এদের খুব কম সংখ্যায় পাওয়া যায়। এই কোষগুলির বহিঃপর্দায় IgE অ্যান্টিবডির Fc অংশের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য কিছু গ্রাহক থাকে। অ্যান্টিজেন, IgE অ্যান্টিবডির সঙ্গে যুক্ত হলেও কিছু ফার্মাকোলোজিক্যাল উপাদান, যেমন—হিস্টামিন, বেসোফিল থেক নিঃসৃত হয়। এই উপাদানগুলি প্রদাহের সৃষ্টি করে। বেসোফিল কোষ অস্থিমজ্জা থেকে উৎপত্তি লাভ করে।

মাস্ট কোষ (Mast cell)

মাস্ট কোষ অনাগ্রাসী কোষ। এরা কিছু পদার্থ নিঃসৃত করে যা হাইপারসেনসিটিভিটি (hypersensitivity) ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণে অপরিহার্য ভূমকা গ্রহণ করে। মাস্ট কোষ বিভিন্ন প্রকার কলায়

দেখা যায়, যেমন ত্বকে, সংযোজক কলায়, আবরণী কলায়, রেচনজনন অঙ্গে এবং পরিপাক তন্ত্রে। মাস্ট কোষে সাইটোপ্লাজমীয় কণা হিস্টামিন থাকে। এই হিস্টামিন এলার্জি সংবেদন সৃষ্টিতে অংশগ্রহণ করে।

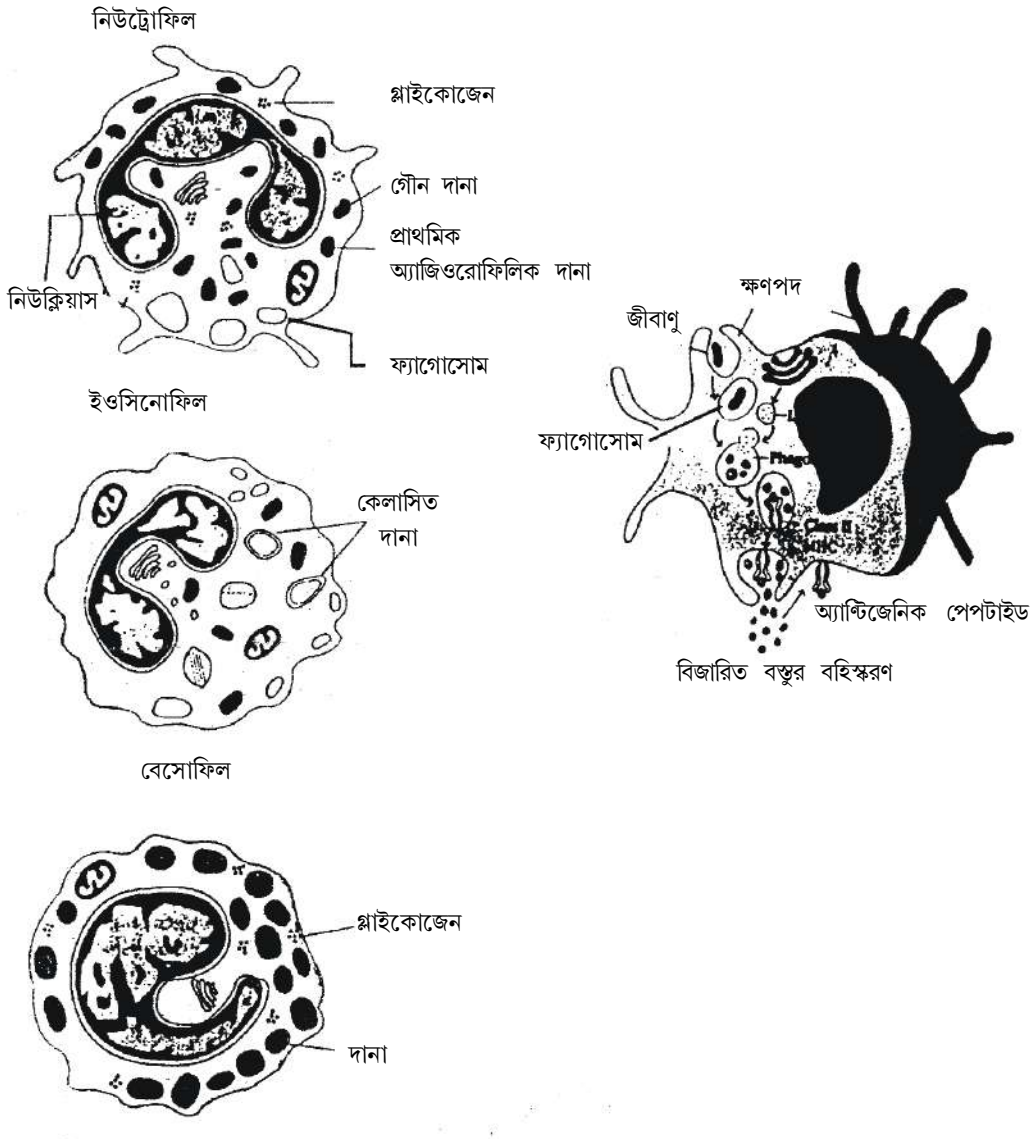

চিত্র 4.55 : গ্র্যানুলোসাইটের গঠন ; ম্যাক্রোফাজ দ্বারা আগ্রাসন পদ্ধতি এবং অ্যান্টিজেনের প্রস্তুতিকরণ

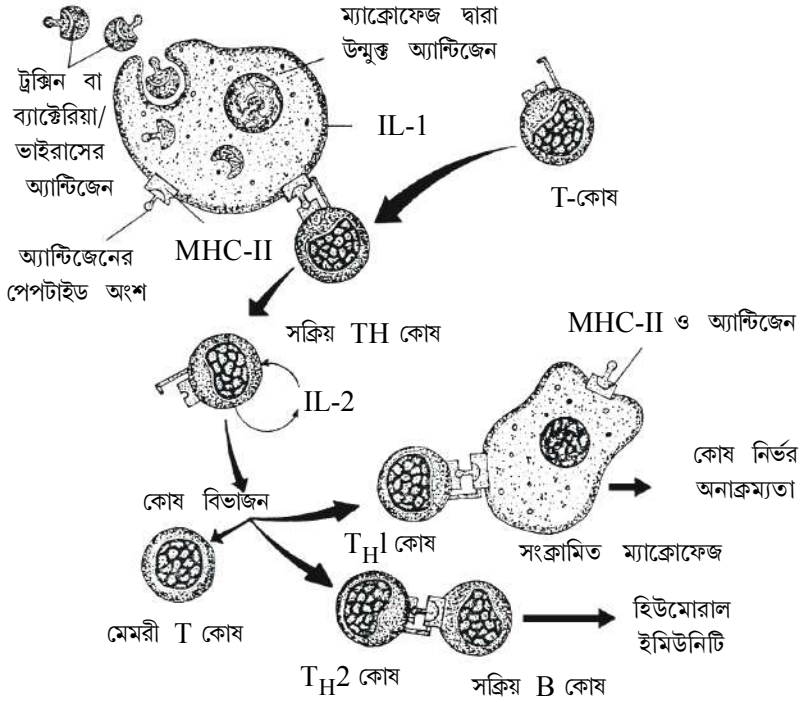

চিত্র 4.56 : সাহায্যকারী T-কোষ দ্বারা অনাক্রম্যতা সাধনের বিভিন্ন দিক

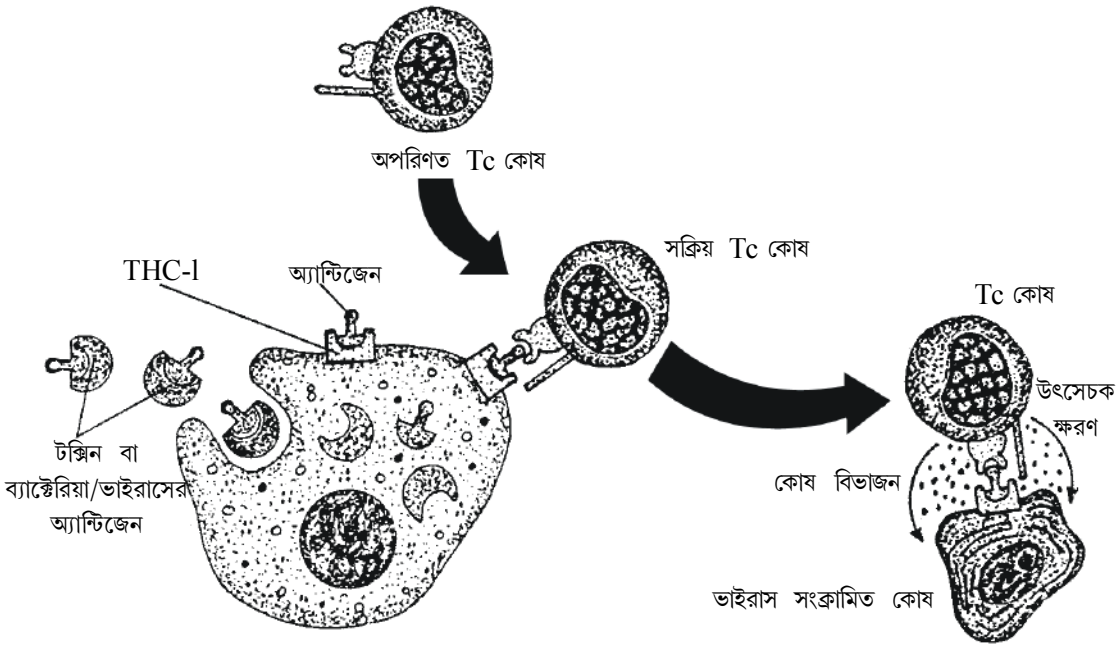

চিত্র 4.57 : ঘাতক-লিম্ফোসাইট (Tc কোষ) যেভাবে অনাক্রম্যতা প্রদান করে

আগ্রাসন পদ্ধতি (Phagocytosis)

সক্রিয় আগ্রাসনকারী কোষ ম্যাক্রোফাজ বহিঃস্থ অ্যান্টিজেনের অদ্রবীভূত কণা গ্রহণ, বিপাক ও তার আত্তীকরণ করে। আগ্রাসন পদ্ধতির প্রতম ধাপ, অনাক্রম্যতার বিশেষ উপাদানের উপস্থিতিতে ম্যাক্রোফাজ আকৃষ্ট হয়। এই ধাপটিকে কেমোট্যাক্সিস বলে। এর পরের ধাপে অ্যান্টিজেন, ম্যাক্রোফাজ কোষ পর্দায় সংযুক্ত হয়। সংযুক্তিকরণের (adherence) পর ম্যাক্রোফাজ কোষ পর্দা থেকে ক্ষণপদ তৈরী হয় যা সংযুক্ত অ্যান্টিজেনকে ঘিরে ফেলে। এই ক্ষণপদ দ্বারা পৃহীত অ্যান্টিজেন একটি একক পর্দাবেষ্টিত গঠনে আবদ্ধ হয়। একে ফ্যাগোজোম (Phagosome) বলা হয়। এই ফ্যাগোজোম কোষ অভ্যন্তরে গৃহীত হয় এবং লাইসোজোমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে *ফ্যাগোলাইসোজোম* গঠন করে। লাইসোজোম থেকে হাইড্রোজেন পারক্সাইড, লাইসোজাইম এবং মুক্ত অক্সিজেন মূলক নিঃসৃত হয় যা গৃহীত অ্যান্টিজেনকে বিনষ্ট করে। বিনষ্ট অ্যান্টিজেন ফ্যাগোলাইসোজোম থেকে এক্সোসাইটোসিস (exocytosis) পদ্ধতিতে বাইরে মুক্ত হয়।

সারণী : লিম্ফোসাইটের তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য

বৈশিষ্ট্য	B-লিম্ফোসাইট	T-লিম্ফোসাইট
উৎপাদন স্থান	বার্সার সমতুল্য কলা	থাইমাস গ্রন্থি
প্রদত্ত ইমিউনিটি	হিউমোরাল	কোষ নির্ভর
উপজাত কোষগোষ্ঠী	প্লাজমা কোষ ও স্মৃতি B-কোষ	ঘাতক লিম্ফোসাইট, সাহায্যকারী T-লিম্ফোসাইট, সাপ্রেসর, T-লিম্ফোসাইট, TDH-কোষ ও স্মৃতি T-কোষ
কোষ বহির্ভাগে অ্যান্টিবডি	থাকে	থাকে না
অ্যান্টিজেন গ্রাহক	থাকে	থাকে
ক্ষরিত বস্তু	অ্যান্টিবডি	লিম্ফোকাইন
রক্তে পরিমাণ	15-30%	55-75%
লিম্ফনোডে পরিমাণ	20%	75%
অস্থিমজ্জায় পরিমাণ	75%	10%
থাইমাসে পরিমাণ	10%	75%

4.3.4. অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি বিক্রিয়া (Antigen-Antibody reaction)

বাইরে থেকে দেহে প্রবিষ্ট অ্যান্টিজেনের সঙ্গে দেহে উৎপন্ন অ্যান্টিবডির বিক্রিয়া একটি অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং নিয়ন্ত্রিত ক্রিয়া। অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি ক্রিয়ায় অসমযোজী বন্ধন, যেমন হাইড্রোজেন

বন্ধন, হাইড্রোফোবিক, আয়নীয় এবং ভ্যানডার-ওয়ালস্ বন্ধন মূখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। অ্যান্টিজেনের সঙ্গে অ্যান্টিবডির বন্ধন কতটা দৃঢ় হবে তা উপরিউক্ত দুর্বল অসমযোজী বন্ধনের সংখ্যার ওপর নির্ভর করে। অ্যান্টিজেন এবং অ্যান্টিবডির মধ্যে দূরত্ব যত কম হবে Ag-Ab সংযোজনের ক্রিয়া তত দৃঢ় হবে। অ্যান্টিবডির Fab অংশে যা **প্যারাটোপ** নামে পরিচিত তার দ্বারা অভিন্ন অথবা প্রায় অভিন্ন অ্যান্টিজেনের এপিটোপের সঙ্গে অসমযোজী বন্ধনের মাধ্যমে যৌগ গঠিত হয়। দেহে অ্যান্টিজনের সঙ্গে অ্যান্টিবডির বিক্রিয়া বিভিন্ন ধরনের হয় এবং প্রশমিত যৌগ তৈরী করে দেহ থেকে নিষ্কাশিত হয়।

4.3.4.1 অ্যান্টিবডি আকর্ষন বা অ্যান্টিবডি অ্যাফিনিটি (Antibody affinity)

একটি অ্যান্টিবডির একটিমাত্র অ্যান্টিজেনের সংযোজনের জন্য দায়ী অসমযোজী বন্ধনের মোট শক্তিকে ঐ অ্যান্টিবডির অ্যান্টিজেনের জন্য অ্যাফিনিটি বা আকর্ষণ বলা হয়। কম আকর্ষনকারী অ্যান্টিবডি অ্যান্টিজেনের সঙ্গে দুর্বলভাবে সংযুক্ত হয় এবং খুব সহজে একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। তেমনি বেশী আকর্ষণকারী অ্যান্টিবডি অ্যান্টিজেনের সঙ্গে খুব দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত থাকে এবং এই সংযোজন দীর্ঘস্থায়ী হয়। অ্যান্টিবডির একটি বন্ধন স্থানের সাথে একযোজী অ্যান্টিজেনের সংযুক্তিকরণ একটি সমীকরণের সাহায্যে প্রকাশ করা যায়—

$$\text{Ag (অ্যান্টিজেন)} + \text{Ab (অ্যান্টিবডি)} \underset{k_{-1}}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} \text{Ag-Ab (প্রশমিত যৌগ)}$$

k_1 হল সম্মুখ বিক্রিয়ার ধ্রুবক এবং k_{-1} হল বিপরীত বিক্রিয়ার ধ্রুবক। k_1/k_{-1} হল আকর্ষণ ক্ষমতার পরিমাপক।

অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি যৌগের ঘনত্বের সঙ্গে মুক্ত অ্যান্টিজেন এবং অ্যান্টিবডির ঘনত্বের তুলনা করে k-এর মান নির্ণয় করা যায়।

$$k = \frac{k_1}{k_{-1}} = \frac{[Ag - Ab]}{[Ag]\,[Ab]}$$

k_1 কে প্রকাশ করা হয় লিটার/মোল/সেকেণ্ড হিসেবে এবং k_{-1} কে 1/ সেকেণ্ডে প্রকাশ করা হয়। সংযোজন ধ্রুবক k কে ইকুইলিব্রিয়াম ডায়ালিসিস করে পরিমাপ করা হয়। এই পদ্ধততে একটি অর্ধভেদ্য পর্দা দ্বারা পৃথকীকৃত দুটি ঘর সমন্বিত ডায়ালিসিস প্রকোষ্ঠের ব্যবহার করা হয়। এই ডায়ালিসিস প্রকোষ্ঠের একটি ঘরে অ্যান্টিবডি এবং অপর ঘরটিতে তেজস্ক্রিয় চিহ্নিত যোজক (হ্যাপ্টেন, অলিগোস্যাকারাইড, পলিস্যাকারাইড) রাখা হয়। প্রাথমিক অবস্থায়, ঘর A তে অ্যান্টিবডি রাখা হয় না এবং ঘর B তে তেজস্ক্রিয় চিহ্নিত যোজক রাখা হয়। ঘর A তে অ্যান্টিবডির উপস্থিতিতে, সাম্যাবস্থায় কিছু পরিমাণ চিহ্নিত যোজক অ্যান্টিবডির সঙ্গে যুক্ত হয় এবং যে সমস্ত যোজক যুক্ত হয়নি সেগুলি সমভাবে ডায়ালিসিস প্রকোষ্ঠে বিস্তৃত থাকে। এর ফলে ডায়ালিসিস প্রকোষ্ঠের যে ঘরে অ্যান্টিবডি রয়েছে সেখানে যোজকের

ঘনত্ব অনেক বেশী হয়। অ্যান্টিবডির অ্যাফিনিটি যত বেশী হবে, যোজকের অ্যান্টিবডির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সংখ্যা তত বাড়বে। যেহেতু, ইকুইলিব্রিয়াম ডায়ালিসি প্রকোষ্ঠে অ্যান্টিবডির ঘনত্ব জানা আছে, ইকুইলিব্রিয়াম সমীকরণ লেখা যেতে পারে—

$$k = \frac{[Ab - Ag]}{[Ab]\,[Ag]} = \frac{r}{(n - r)\,(c)}$$

$$r = \frac{\text{অ্যান্টিবডির সঙ্গে যুক্ত যোজকের ঘনত্ব}}{\text{মোট অ্যান্টিবডির ঘনত্ব}}$$

n=একটি অ্যান্টিবডির বন্ধন স্থানের সংখ্যা

c=মুক্ত যোজকের ঘনত্ব

সমীকরণটিকে পুনর্বিন্যস্ত করে স্ক্যাচার্ড সমীকরণ (Scatchard equation) দেওয়া হয় :—

$$\frac{r}{c} = kn - kr$$

ইকুইলিব্রিয়াম ডায়ালিসিসে একই ঘনত্বের অ্যান্টিবডি কিন্তু বিভিন্ন ঘনত্বের যোজক ব্যবহার করে পরীক্ষাটি পুনর্বার করে r এবং c-এর মান পাওয়া যায়। যদি ডায়ালিসিস প্রকোষ্ঠে সব অ্যান্টিবডির যোজকের প্রতি আকর্ষণ বা অ্যাফিনিটি একই রকম হয় এবং k-কে ধ্রুবক ধরলে r/c vs r-থেকে স্ক্যাচার্ড লেখ একটি সরলরেখা হয়। যত মুক্ত যোজকের ঘনত্ব c বাড়বে, r/c ততই শূন্যের দিকে এবং r হবে n যা অ্যান্টিবডির যোজ্যতা রূপে গণ্য হবে।

1. নিয়ন্ত্রিত (Control) পরীক্ষা : অ্যান্টিবডি অনুপস্থিত

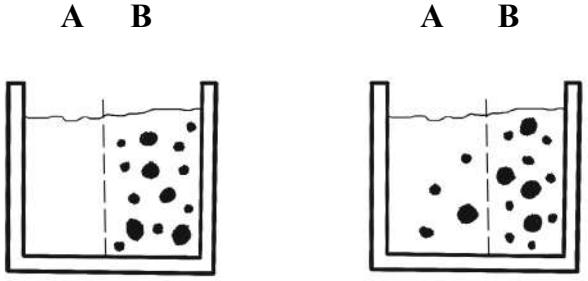

প্রাথমিক অবস্থায় সাম্যাবস্থায়

2. পরীক্ষা (Experimental) : A - এর দিকে অ্যান্টিবডি আছে

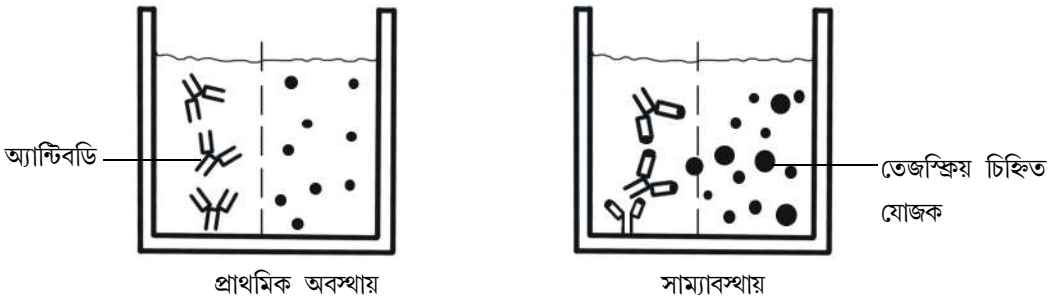

চিত্র 4.58 : ইকুউলিব্রিয়াম ডায়ালিসিস দ্বারা অ্যান্টিবডি অ্যাফিনিটির নির্ধারণ

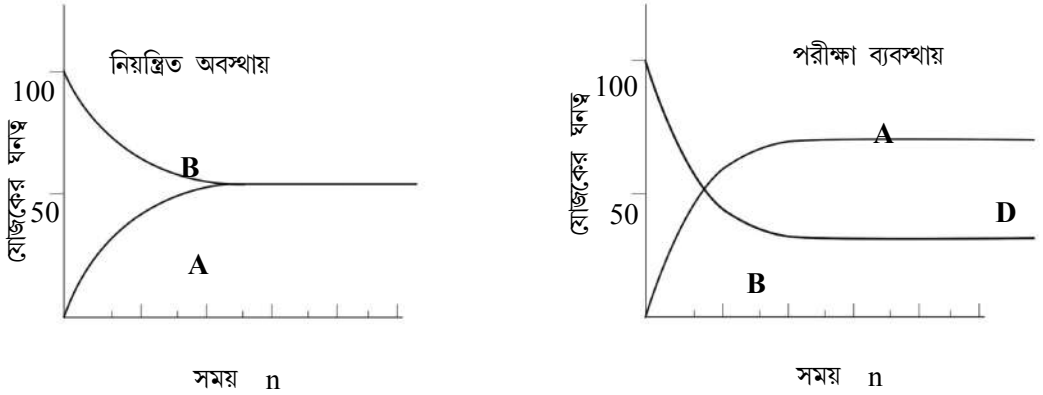

চিত্র 4.59 : রেখাচিত্রের সাহায্যে অ্যান্টিবডি অ্যাফিনিটির হার

4.3.4.2 অ্যান্টিবডি অ্যাভিডিটি (Antibody Avidity)

অ্যান্টিবডির একটি বন্ধন স্থানের আকর্ষণ সবসময় অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি ক্রিয়ার প্রকৃত শক্তিকে বোঝায় না। যখন একটি জটিল অ্যান্টিজেন, যার বহুসংখ্যক অ্যান্টিজেনিক ডিটারমিন্যান্ট আছে, সেই অ্যান্টিজেনকে বহুবন্ধনকারী অ্যান্টিবডির সঙ্গে মিশ্রিত করলে এক বন্ধনকারী স্থানে অ্যান্টিজেনের সংযুক্ত হওয়া অপর একটি স্থানে সংযুক্ত হওয়াকে ত্বরান্বিত করে। এইরূপে বহুযোজী অ্যান্টিবডির সঙ্গে অ্যান্টিজেনের ক্রিয়াকে **অ্যাভিডিটি** বলে। IgM-এর বহুযোজীতার জন্য এর অ্যাভিডিটি অনেক বেশি।

4.3.4.3. ক্রস-রিঅ্যাক্টিভিটি (Cross-Reactivity)

যদিও Ag-Ab ক্রিয়া অত্যন্ত স্বতন্ত্র, কখনও কখনও একটি অ্যান্টিজেন দ্বারা সক্রিয় অ্যান্টবডি অপর একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন অ্যান্টিজেনের সঙ্গে ক্রস-রিঅ্যাক্ট বা আন্তঃ বিক্রিয়া করে। যদি দুটি ভিন্ন অ্যান্টিজেনে একই প্রকার এপিটোপ থাকে এবং তাদের রাসায়নিক ধর্ম যদি একই হয় তবে ক্রস-

রিঅ্যাক্টিভিটি দেখা যায়। পলিস্যাকারাইড জাতীয় অ্যান্টিজেনের ক্ষেত্রে ক্রস-রিঅ্যাক্টভিটি বেশী দেখা যায়। যেমন ABO রক্তগ্রুপ (ABO-blood group) অ্যান্টিজেনের ক্ষেত্রে লোহিত রক্তকণিকার বহিঃপর্দায় গ্লাইকোপ্রোটিন অনু থাকে। এই গ্লাইকোপ্রোটিনস্থিত প্রান্তীয় শর্করা অনুর বিভিন্নতার জন্য A এবং B ব্লাড গ্রুপের অ্যান্টিজেনের মধ্যে পার্থক্য হয়। কোন ব্যক্তির উপরিউক্ত একটি অথবা দুটি অ্যান্টিজেন না থাকলে তাদের দেহের সিরামে ওই নিরুদ্দিষ্ট অ্যান্টিজেনের জন্য অ্যান্টিবডি তৈরী হয়। 'O' গ্রুপের ব্যক্তিদের Anti-A এবং Anti-B উভয় অ্যান্টিবডি আছে। ব্লাড গ্রুপের অ্যান্টিবডিগুলি অ্যান্টিজেনের সঙ্গে ক্রসরিঅ্যাক্টিভিটির জন্য উৎপন্ন হয়েছে। কিছু ভ্যাক্সিন ক্রস-রিঅ্যাক্টিভিটি প্রদর্শন করে। যেমন, ভ্যাক্সিনিয়া ভাইরাস কাউপক্স রোগ ঘটায় কিন্তু ভ্যারিওলা ভাইরাসের (যা স্মলপক্স ঘটায়) এপিটোপের সঙ্গে ক্রস-রিঅ্যাক্ট করে।

4.3.4.4 অধঃক্ষেপন ক্রিয়া (Preciptation Reaction)

জলীয় দ্রবণে একটি অ্যান্টিবডি এবং দ্রবণীয় অ্যান্টিজেনের ক্রিয়ায় একটি অধঃক্ষেপ সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়। এই অধঃক্ষেপকে **প্রেসিপিটিন** বলা হয়। যদিও Ag-Ab যৌগ কয়েক মিনিটের মধ্যে তৈরী হয়ে যায় কিন্তু সুস্পষ্ট অধঃক্ষেপ তৈরী হতে এক থেকে দুদিন সময় লাগে। এইরূপে অধঃক্ষিপ্ত অদ্রবীভূত Ag-Ab ল্যাটিস যৌগ গঠন অ্যান্টিবডি এবং অ্যান্টিজেন উভয়ের যোজ্যতার ওপর নির্ভর করে—

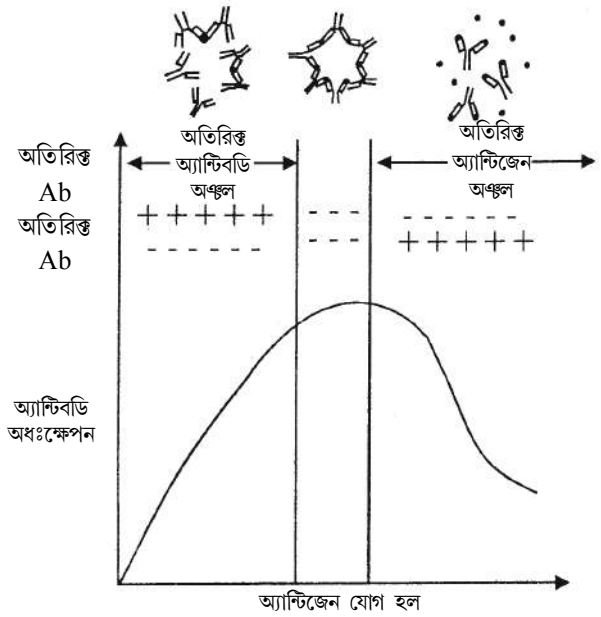

চিত্র 4.60 : অধঃক্ষেপনের লেখচিত্র

- অ্যান্টিবডি অবশ্যই দ্বিযোজী হবে ; একযোজী Fab দ্বারা অধঃক্ষেপ তৈরী হয় না।
- অ্যান্টিজেনেকে অবশ্যই দ্বিযোজী বা বহুযোজী হতে হবে।

অধঃক্ষেপন ক্রিয়ায় অধঃক্ষেপনের পরিমাণ নির্ণয় করা যায়। কতকগুলি টেস্ট টিউবে নির্দিষ্ট পরিমাণ অ্যান্টিবডি নিয়ে তাতে বর্ধিত হারে অ্যান্টিজেন দেওয়া হয়। অধঃক্ষেপ তৈরী হওয়ার পর প্রতিটি টিউবকে সেন্ট্রিফিউজ করা হয় এবং অধঃক্ষেপের পেলেট ফেলা হয়। প্রতিক্ষেত্রে বর্ধিত অ্যান্টিজেনের ঘনত্বের সঙ্গে অধঃক্ষেপের সম্পর্কের একটি লেখাচিত্র প্রেসিপিটিন লেখচিত্র অঙ্কন করা যায় (চিত্র 4.60)। ইমিউনোডিফিউসান ক্রিয়া, ইমিউনো ইলেক্ট্রোফোরেসিস প্রভৃতির ভিত্তি হল ঐ অধঃক্ষেপন ক্রিয়া। অতিরিক্ত অ্যান্টিবডি অঞ্চলে অধঃক্ষেপন ক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং দ্রবণে অ্যান্টিবডির উপস্থিতি নির্ণয় করা যায়; সাম্যাবস্থায় অ্যান্টিজেন এবং অ্যান্টিবডির ক্রিয়ায় সর্বাধিক অধঃক্ষেপন হয়। অতিরিক্ত অ্যান্টিজেন অঞ্চলে অধঃক্ষেপন বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং দ্রবণে অ্যান্টিজেনের উপস্থিতি নির্ণয় করা যায়।

4.3.4.5 অ্যাগ্লুটিনেশান বিক্রিয়া (Agglutionation Reaction)

অ্যান্টিবডির সঙ্গে অ্যান্টিজেন অনুর ক্রিয়ায় সুস্পষ্ট ঘনীভূত দলা বা ক্লাম্প দেখা গেলে তাকে সংযুক্তকরণ বা **অ্যাগ্লুটিনেশান** বিক্রিয়া বলা হয়। এইরূপ ক্রিয়ার জন্য অ্যান্টিবডিকে **অ্যাগ্লুটিনিন** বলে। অতিরিক্ত অ্যান্টিবডি অ্যাগ্লুটিনেশান ক্রিয়া রোধ করে, এইরূপ রোধকে **প্রোজোন এফেক্ট** বলা হয়। IgM একটি উপযুক্ত অ্যাগ্লুটিনিন।

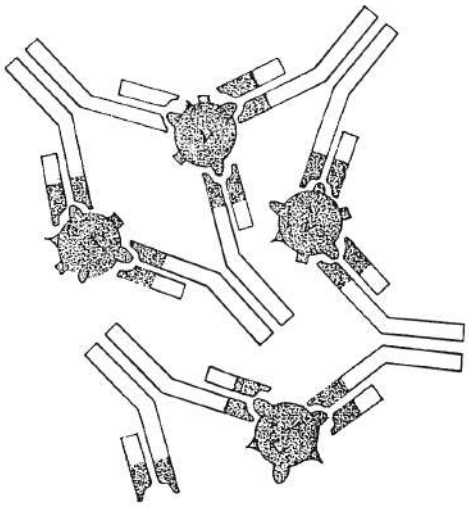

চিত্র 4.61 : অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি বিক্রিয়া (অ্যাগ্লুটিনেশন)

ABO-blood grouping -এর জন্য প্রতিনিয়ত অ্যাগ্লুটিনেশান ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়। একটি স্লাইডে রক্ত নিয়ে তাতে A এবং B blood group অ্যান্টিজেনের বিরুদ্ধে অ্যান্টিসেরা দেওয়া হয়। যদি লোহিত রক্ত কণিকায় অ্যান্টিজেন থাকে তখন অ্যাগ্লুটিনেশান হয় এবং স্লাইডে সুস্পষ্ট ঘনীভূত দলা দেখা যায়। একজনের ব্লাড গ্রুপ A থাকলে তার রক্ত অপরজনকে দানের সময় অ্যাগ্লুটিনেশান ক্রিয়ার দ্বারা দাতা এবং গ্রহীতার ব্লাড গ্রুপ নির্ণয় করে নেওয়া হয়। অনুরূপ পদ্ধতিতে রক্তের Rh ফ্যাক্টরও নির্ণয় করা হয়ে থাকে।

অ্যাগ্লুটিনেশান বিক্রিয়ায় IgM বিশেষ কার্যকরী, তবে IgG দ্বারা মৃদু বিক্রিয়া ঘটতে পারে

4.3.4.6 অপসোনাইজেশান (Opsonization)

অপসোনিন হল অ্যান্টিবডি অথবা কমপ্লিমেন্ট প্রোটিনের (C_{3b} উপাদান যা সহজেই অ্যান্টিজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিভিন্ন আগ্রাসী কোষের আগ্রাসন পদ্ধতিকে ত্বরান্বিত করে। কোন কোন অ্যান্টিবডি

অপসোনিনের কাজ করে। এদের প্রভাবে বিষাক্ত টক্সিন প্রশমিত হয়। এক্ষেত্রে জীবানু কোষকে অ্যান্টিবডিগুলি আচ্ছাদিত করে ফেলে যাতে সহজে ফ্যাগোসাইট কর্তৃক ভক্ষিত হয়।

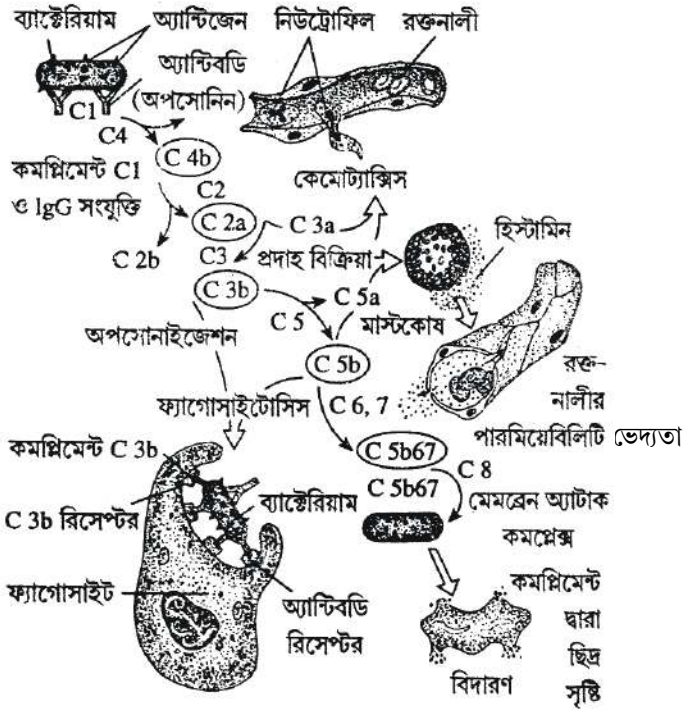

চিত্র 4.62 : অপসোনাইজেশন পদ্ধতিতে জীবাণু দমন

4.3.4.7 প্রশমন (Neutralization)

অনেক ক্ষেত্রে রোগ জীবানু বিষাক্ত টক্সিন ক্ষরণ করে পোষকের ক্ষতি করে। এই সকল বিষাক্ত পদার্থ অ্যান্টিজেনরূপে চিহ্নিত হয় এবং তা অ্যান্টিবডির সঙ্গে আবদ্ধ হয়ে অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি জোট গঠিত হয়। এতে টক্সিনের বিষক্রিয়া প্রশমিত হয়। IgG ব্যাক্টেরিয়াজাত টক্সিন প্রশমনে বিশেষ উপযোগী।

4.3.4.8 টিকাদান (Vaccination)

টিকাদান কর্মসূচীর প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল সংক্রামক রোগজীবাণুর বিরুদ্ধে দেহে নন্‌টক্সিক অ্যান্টিজেন প্রবিষ্ট করে স্মৃতি সংবেদন (memory response) প্রবৃত্তির উদ্‌ঘাটন করে রক্ষাপ্রদ অনাক্রম্যতার (protective immunity) সৃষ্টি করে। ইংল্যাণ্ডের চিকিৎসক, এডওয়ার্ড জেনার (1798) প্রথম স্মলপক্সের বিরুদ্ধে টিকা প্রস্তুত করেন।

বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে টিকাদানের উদ্দেশ্য হল তীব্র বা সংক্রামক নয় এমন অ্যান্টিজেন প্রস্তুত করে দেহে প্রবিষ্ট করিয়ে স্মৃতিশক্তির উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে T এবং B লিম্ফোসাইটের ক্ষরণ ঘটানো, অর্থাৎ

ইমিউনোলজিক্যাল মেমরি প্রতিক্রিয়ার ফলে বা কোনো দ্বিতীয়বার অ্যান্টিজেন প্রবেশ করলে দ্রুত অধিক উৎপাদন হয়। অ্যান্টিজেন একাকী প্রবেশ করলে তা কম দ্রুত ... এই টিকাকে অ্যান্টিজেন প্রয়োগ করে দ্বিতীয় বার প্রবেশ করানো হয়। পুনরায় অ্যান্টিজেন প্রয়োগ করে ইমিউন অ্যান্টিবডির প্রদর্শন (boosting) বা বৃদ্ধি ঘটানো হয়।

4.3.5 সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয় ইমিউনাইজেশন (Active and Passive Immunization)

4.3.5.1 নিষ্ক্রিয় ইমিউনাইজেশন (Passive Immunization)

নিষ্ক্রিয় ইমিউনাইজেশন হল মানুষ বা অন্যান্য প্রাণীর দেহে পূর্বে প্রস্তুত অ্যান্টিবডি, প্রধানতঃ IgG-এর প্রবেশ ঘটানো। ডিপথেরিয়া, টিটেনাস, বটুলিজম, হেপাটাইটিস, মিজেলস ইত্যাদি রোগের চিকিৎসায় এটি ব্যবহৃত হয়। নিষ্ক্রিয় ইমিউনাইজেশনে প্রধানতঃ IgG অ্যান্টিবডি ব্যবহার করা হয়।

নিষ্ক্রিয় ইমিউনাইজেশনে ব্যবহৃত অ্যান্টিবডি ... নিচের সারণিতে দেখানো হল—

সারণি : নিষ্ক্রিয় ইমিউনাইজেশনে ব্যবহৃত জৈবিক উপাদান

রোগ	উপাদান
বটুলিজম	ঘোড়ার অ্যান্টিটক্সিন
ডিপথেরিয়া	ঘোড়ার অ্যান্টিটক্সিন
হেপাটাইটিস A ও B	মানুষের সাধারণ গামা গ্লোবিউলিন
মিজেলস (হাম)	মানুষের সাধারণ গামা গ্লোবিউলিন
রেবিস	মানুষের সাধারণ গামা গ্লোবিউলিন
সাপের কামড়	ঘোড়ার অ্যান্টিভেনিন
টিটেনাস	মানুষের সাধারণ গামা গ্লোবিউলিন অথবা
	ঘোড়ার অ্যান্টিটক্সিন

4.3.5.2 সক্রিয় ইমিউনাইজেশন (Active immunization)

সক্রিয় ইমিউনাইজেশন হল দেহে দীর্ঘমেয়াদি প্রতিরক্ষা অ্যান্টিজেনের অংশ বিশেষ অণুজীব বা নিষ্ক্রিয় জীবাণু প্রবেশ করানো ...

প্রয়োগ স্থলের ওপর নির্ভর করে সক্রিয় ইমিউনাইজেশান দু প্রকার—সিস্টেমিক ইমিউনাইজেশান এবং মিউকোসাল ইমিউনাইজেশান।

- **সিস্টেমিক ইমিউনাইজেশান (Systemic immunization)**

এই প্রকার ইমিউনাইজেশানে, পূর্বে প্রস্তুত টিকা বা ভ্যাক্সিন ডেলটয়েড পেশীর আন্তঃত্বকীয় বা আন্তঃপেশীয় (Subcutaneously or intramuscularly) স্তরে সূচিপ্রয়োগের মাধ্যমে দেহে প্রবেশ করানো হয়। বেশীরভাগ টিকা জন্মের কিছুদিন পরেই প্রয়োগ করা হয়। সিস্টেমিক টিকাগুলি হল মিস্‌লস্‌, মাম্পস্‌, রুবেলা যা এক বৎসর বয়সের বাচ্চাদের দেওয়া হয়। এছাড়া নিউমোকক্কাস, মেনিঙ্গোকক্কাস, হিমোফিলাস রোগের জন্য প্রস্তুত ভ্যাক্সিন বা টিকাগুলিও সিস্টেমিক ইমিউনাইজেশানে ব্যবহৃত হয়।

- **মিউকোসাল ইমিউনাইজেশান (Mucosal immunization)**

বর্তমানে, টিকাগুলি মুখের অথবা নাসিকার মিউকাস স্তরের মাধ্যমে প্রয়োগ করা হয়। সংক্রামক জীবাণুগুলি মুখ বা নাসিকার মিউকাস স্তর দিয়েই দেহাভ্যন্তরের বিভিন্ন অঙ্গো ও তন্ত্রে প্রবেশ করে রোগ সৃষ্টি করে। আর এই মিউকাস স্তরই হল লিম্ফয়েড কলার প্রধান উৎস। মিউকাস স্তরে অনাক্রম্যতা সৃষ্টিতে অ্যাডজুভ্যান্ট টিকা বা ভ্যাক্সিন এবং জীবিত ভেক্টর (live vector) ব্যবহার করা হয়। হারপিস সিম্প্লেক্স ভাইরাস ও মানুষের প্যাপিলোমা ভাইরাসের বিরুদ্ধে মিউকাস স্তরীয় অনাক্রম্যতা সৃষ্টিতে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

এছাড়াও অ্যাডজুভ্যান্ট ভ্যাক্সিন যেমন কলেরা, পার্টুসিস রোগের ভ্যাক্সিন মিউকোসাল ইমিউনাইজেশান ঘটায়।

4.3.5.3 টিকার প্রকারভেদ (Types of v accine)

(i) **টক্সয়েড (Toxoid) :** কোন জীবানুর অধিবিষের রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটিয়ে টক্সয়েড প্রস্তুত করা হয়। এই টক্সয়েডকে দেহে প্রবেশ করিয়ে অ্যান্টিবডি সৃষ্টি করা হয়। ফর্ম্যালিহাইডের দ্বারা Tetanus ও Diphtheria ব্যাকটিরিয়ার অধিবিষ প্রশমীকরণ করা হয়। এতে তাদের বিষক্রিয়া বন্ধ হলেও অ্যান্টিজেনের চরিত্র থেকে যায়। এই টক্সয়েড দেহে প্রবেশ করালে **অ্যান্টিটক্সয়েড অ্যান্টিবডি** সৃষ্টি করে যা ঐ সমস্ত রোগের পুনঃ সংক্রমণ রোধ করে।

(ii) **শক্তিহ্রাসপ্রাপ্ত আনুবীক্ষণীক প্রাণী দ্বারা প্রস্তুত টিকা (Attenuated Vaccine) :** সম্পূর্ণ কার্যক্ষমতাহীন বা শক্তিহ্রাসপ্রাপ্ত ভাইরাস, ব্যাক্টিরিয়া, প্রোটোজোয়া এই টিকা নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। এই ভাইরাস বা ব্যাক্টিরিয়া দেহের অভ্যন্তরে ক্ষতিসাধন করে না, অথচ এদের উপস্থিতির ফলে দেহে নির্দিষ্ট অ্যান্টিবডি তৈরী হয়।

উদাহরণ—Bacillus Calmette-Guerin (BCG) শক্তিহ্রাস প্রাপ্ত মাইকোব্যাক্টিরিয়া বেভিস থেকে তৈরী। Sabin oral polio ভ্যাক্সিন শক্তিহ্রাসপ্রাপ্ত পোলিও ভাইরাস থেকে তৈরী যা বর্তমানে সফলতার সঙ্গো প্রয়োগ হচ্ছে।

(iii) নিষ্ক্রিয় বা মৃত ভাইরাস/ব্যাকটেরিয়া/প্রোটোজোয়া টিকা (Inactivated Vaccine) :
এই পদ্ধতিতে জীবাণুকে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় বা ফরমালিন পদার্থ সহযোগে নিষ্ক্রিয় বা নষ্ট করে ফেলা হয় যাতে পোষকের দেহে সংক্রমণ ঘটাতে না পারে। তবে এই প্রকার নিষ্ক্রিয়করণে অ্যান্টিজেনের এপিটোপের গঠন অক্ষুণ্ণ রাখা হয়। Salk polio এবং Pertussis ভ্যাকসিন এই প্রকার ভ্যাকসিনের উদাহরণ। শক্তিহ্রাসপ্রাপ্ত জীবাণু দ্বারা প্রস্তুত টিকা একবার প্রয়োগেই অনাক্রম্যতা দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলে কিন্তু নিষ্ক্রিয় বা মৃত জীবাণু দ্বারা প্রস্তুত টিকা একাধিকবার প্রয়োগ করে পোষকের অনাক্রম্য ক্ষমতাকে প্রবর্ধিত (boosting) করা হয়।

(iv) নতুন যুগের জিন প্রযুক্তি টিকা (Genetic engineering) : জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং প্রক্রিয়ার বর্তমানে টিকা প্রস্তুত করা হচ্ছে। অ্যান্টিজেন সৃষ্টিকারী জিনটি সংগ্রহ করে একটি ব্যাকটেরিয়ার শরীরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এরপর ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিজেন তৈরি করা হয়। এই অ্যান্টিজেনকে টিকা হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এই পদ্ধতিতে রিকম্বিনেন্ট ভেক্টর ভ্যাকসিন, DNA ভ্যাকসিন, সিন্থেটিক পেপটাইড ভ্যাকসিন, [illegible] ভ্যাকসিন তৈরি করা হয়। অ্যান্টিজেনের [illegible] অ্যান্টিজেন প্রস্তুত করে দেহে অ্যান্টিবডি সৃষ্টি করা হয়। বর্তমানে HIV-এর ভ্যাকসিন এইভাবে তৈরি করার চেষ্টা চলছে। এছাড়া Foot and mouth disease -এর ভ্যাকসিন, Cutaneous leishmaniasis-এর ভ্যাকসিন এইভাবে প্রস্তুত হয়।

চিত্র 4.63 : টিকাকরণের পরে ইমিউনোগ্লোবিউলিন নিঃসরণের [illegible]

সারণী : স্বীকৃত টিকাকরণ (শিশুদের) প্রদত্ত টিকার তালিকা

	বয়স	টিকা
1.	জন্মের 2 মাস পর	হেপাটাইটিস B
2.	2 মাস বয়স	ডিপথেরিয়া পার্টুসিস-টিটেনাস (DPT) পোলিওমায়েলিটিস (OPV) হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা টাইপ B
3.	4 মাস বয়স	ডিপথেরিয়া-পার্টুসিস টিটেনাস (DPT) পোলিওমায়েলেটিস (OPV) হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা type b
4.	6-18 মাস	হেপাটাইটিস B পোলিওমায়েলিটিস (OPV)
5.	12-15 মাস	DPT ভ্যারিসেলা জোস্টার (VZV) মিস্‌লস, মাম্পাস, রুবেলা
6.	4-6 বছর	DPT OPV মিস্‌লস, মাম্পাস্‌, রুবেলা
7.	11-12 বছর	Diphtheria-Tetanus Varicella Zoster (VZV), হেপাটাইটিস A ও B

4.3.6 সারাংশ

যখন পরজীবী বা বিজাতীয় বস্তু দেহের মধ্যে প্রবেশ করে তখন বস্তুটি অ্যাস্টিজেনরূপে পরিগণিত হয়। অ্যান্টিজেন দেহমধ্যস্থ সেরামে অ্যান্টিবডি ক্ষরণে উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। অ্যান্টিবডি অনুকে পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—IgG, IgA, IgM, IgD এবং IgE। বিভিন্ন প্রকার অসংখ্য কোষ এবং অঙ্গের সমন্বয়ে প্রাণীদেহের অনাক্রম্যতন্ত্র গঠিত হয়। অস্থিমজ্জার সর্বার্থসাধক স্টেম কোষ থেকে অনাক্রম্যতায় অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন প্রকার কলা কোষ, শ্বেতকণিকা এবং লোহিত রক্তকণিকার উৎপত্তি হয়।

প্রধানত দুটি ভিন্ন পথে শ্বেতকণিকার উৎপত্তি হয়—(i) লিম্ফয়েড কোষ থেকে T-লিম্ফোসাইট এবং

B-লিম্ফোসাইট গঠনের মাধ্যমে, (ii) মায়েলয়েড কোষ থেকে এক নিউক্লিয় শ্বেতকণিকা ও অনুচক্রিকা এবং মাস্ট কোষ গঠনের মাধ্যমে। অ্যান্টিবডি প্রস্তুতির মাধ্যমে জীবাণুর আক্রমণ প্রতিরোধের মূলে থাকে অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি বিক্রিয়া। অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি অসমযোজী বন্ধন, যেমন—হাইড্রোজেন, আয়নীয়, হাইড্রোফোবিক এবং ভ্যান্ডারওয়াল বন্ধন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। বিভিন্ন প্রকার অ্যান্টিডেন-অ্যান্টিবডি বিক্রিয়াগুলি হল—

(i) অ্যাগ্লুটিনেসান, (ii) অপ্সোনাইজেশান, (iii) অ্যান্টিবডি অ্যাভিডিটি, (iv) অ্যান্টিবডি ক্রস-রিঅ্যাক্টিভিটি। দেহের মধ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে সূচ প্রয়োগের মাধ্যমে বা খাইয়ে অ্যান্টিজেন প্রবেশ করিয়ে কৃত্রিম উপায়ে অনাক্রম্যতা অর্জন করানোকে টিকাকরণ বলে এবং টিকাতে অ্যান্টিজেন মাত্রা খুব অল্প থাকে। রোগ সৃষ্টিকারী জীবানুটির আংশিকভাবে পরিবর্তিত করে দেহে প্রবেশ করিয়ে নির্দিষ্ট অ্যান্টিবডির প্রবর্দ্ধন ঘটানো হয়। বর্তমানে তৈরী টিকাগুলি বেশীরভাগ সক্রিয় ইমিউনাইজেশান প্রক্রিয়ায় প্রয়োগ করা হয়। সক্রিয় ইমিউনাইজেশান প্রয়োগস্থলের ওপর নির্ভর করে সিস্টেমিক ও মিউকোসাল এই দুটি ভাগে বিভক্ত। টিকা বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে—টক্সয়েড, অ্যাটেনিউয়েটেড, নিষ্ক্রিয় বা মৃত ভাইরাল/ব্যাক্টিরিয়াল/প্রোটোজোয়াল টিকা, DNA টিকা, রিকম্বিন্যাস্ট টিকা ইত্যাদি।

4.3.7 প্রশ্নাবলী

1. সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন

(a) ইমিউনোগ্লোবিউলিন কাকে বলে ?

(b) আইসোটাইপ কাকে বলে ?

(c) অ্যাগ্লুটিনেশান কাকে বলে ?

(d) অপ্সোনাইজেশান কাকে বলে ?

(e) সক্রিয় ইমিউনাইজেশন কাকে বলে ?

(f) অ্যান্টিবডি অ্যাভিডিটি কাকে বলে ?

2. শূন্যস্থান পূরণ করুন

(a) অ্যান্টিবডি অনুগুলি —— পলিপেপটাইড শৃঙ্খলযুক্ত গঠন বিশেষ, যেগুলি —— গঠন রচনা করে।

(b) B কোষে আবদ্ধ গ্রাহকগুলি হল —— বা ——।

(c) মাস্ট কোষে সাইটোপ্লাজমীয় কণা থাকে এবং —— সংবেদন সৃষ্টিতে অংশগ্রহণ করে।

(d) অ্যান্টিবডির সঙ্গে অ্যান্টিজেন অনুর ক্রিয়ায় —— দেখা গেলে তাকে সংযুক্তকরণ বা —— বিক্রিয়া বলা হয়।

(e) নিষ্ক্রিয় ইমিউনাইজেশান হল আন্তঃশিরা বা আন্তঃপেশীস্তরে —— —— অ্যান্টিবডি প্রধানতঃ IgG-এর প্রবেশ ঘটানো হয়।